উসওয়াতুন হাসানাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

মুফতি তারেকুজ্জামান

প্রকাশকের কথা

রাসূলুল্লাহ সা. এর সীরাত সংক্রান্ত আমরা কতো বই-ই না পাঠ করেছি! কিন্তু তাঁর আদর্শ কি আমরা আদৌ গ্রহণ করেছি? বাস্তবজীবনে কি এর প্রতিফলন ঘটিয়েছি? সীরাত মূলত সাধারণ পাঠ্য বইয়ের মতো শুধু পড়ার জিনিস নয়; বরং অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতঃ বাস্তব জীবনে এর পূর্ণ বাস্তবায়নই এর মূল উদ্দেশ্য।

সীরাত পড়লেও এ থেকে কী শিক্ষা পাওয়া গেলো, বাস্তবজীবনে এর কতোটুকু প্রতিফলন ঘটলো- এ বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। "উসওয়াতুন হাসানাহ" বইয়ে এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূল সা. এর প্রতিটি ঘটনা তথ্যসমৃদ্ধ করার পাশাপাশি এতে উম্মাহর কী করণীয়, কী শিক্ষা রয়েছে- সংক্ষিপ্তাকারে তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা পাঠককে নতুন এক চেতনা, ভিন্ন এক দিগন্তের রাস্তা দেখাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বইটি পড়লে সীরাতের বাঁকে বাঁকে আমাদের জন্য লুকিয়ে থাকা অসংখ্য না-জানা মনিমুক্তার দেখা মিলবে বলে আমাদের আশা। তাই যারা সীরাত পড়েছেন আর যারা পড়েননি উভয় শ্রেণীর জন্য বক্ষ্যমাণ এ রচনাটি একবার হলেও পড়া উচিত বলে মনে করি। নবী সা. এর সীরাত পড়ে, বুঝে বাস্তবজীবনে তা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সীরাত পড়াটা সার্থক হবে। অন্যথায় সাধারণ পাঠের মতো কিছু শব্দের বুলি আওড়ানো ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন!

- রফিকুল ইসলাম

উসওয়াতুন হাসানাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

উসওয়াতুন হাসানাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

সংকলন ও সম্পাদনা
মুফতি তারেকুজ্জামান

রুহামা পাবলিকেশন

অভিমত

আল্লাহর রাসুলের জীবনীতে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তিনি উসওয়াতুন হাসানাহ। তিনি কুদওয়াতুন রাফিআহ। পদে পদে তার অনুসরণেই মাঝেই রয়েছে শান্তি এবং মুক্তি। তার জীবনী নিয়ে রচিত হয়েছে কত শত গ্রন্থ, যার সঠিক হিসেব উদঘাটন করা রীতিমতো সাধ্যাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কোনো দিন খুঁজে পাওয়া হয়তো দায় হবে, যেদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও থেকে তাকে নিয়ে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। এত এত সিরাতগ্রন্থের সুবিশাল ভাণ্ডারে তার জীবনকে শিক্ষণীয়রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে খুব কম গ্রন্থে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এতে শুধুই তার জীবনীকে বিশুদ্ধ রূপে উল্লেখ করেই ক্ষান্তি দেওয়া হয়নি; বরং প্রতিটি ঘটনা থেকে পরম যতনে বের করে আনা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব শিক্ষা; শুধু শিক্ষাই তো নয়, একজন সত্যসন্ধানী মুমিনের জীবন পথের পাথেয়। গ্রন্থের কলেবরকেও সব শ্রেণির পাঠকের কথা বিবেচনা করে ছোট রাখা হয়েছে। প্রিয় পাঠক, আসুন, সিরাতের এই সরোবরে অবগাহন করি, নববি দীপাধার থেকে আলো সংগ্রহ করে জীবনকে করে তুলি আলোকিত।

- আলী হাসান উসামা

সংকলকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

জন্ম ও পরিবার: ১৯৮৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার দিনের প্রথম প্রহরে পাবনা জেলার প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে তার জন্ম। চার ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয় এ সন্তান ছোটকাল থেকেই আকর্ষণীয় অবয়ব, শান্ত প্রকৃতি ও অসাধারণ মেধাবলে সবার মন জয় করে ফেলেন। বাবা ডাক্তার ও মা গৃহিণী, দু'জনেই অত্যন্ত দীনদার ও পরহেযগার। বড় ভাই লালমাটিয়া মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক ও মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন।

মেধা ও লেখাপড়া: জন্মগতভাবে অসামান্য মেধার অধিকারী তরুণ এ আলেম মাত্র চার বছর বয়সেই মায়ের কাছে দীনশিক্ষা ও লেখাপড়া শুরু করেন। ক্লাস ফোর পর্যন্ত প্রত্যেক পরিক্ষায় প্রতিটি বিভাগে ১ম স্থান অর্জন করে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। বিশেষত অঙ্কে তার মেধা ও দক্ষতা ছিলো ঈর্ষনীয় পর্যায়ের। দশ বছর বয়সে ক্লাস ফাইভ শেষ করে মাদরাসায় পদার্পন করেন। তানযীম বোর্ডে মক্তব বিভাগের কেন্দ্রীয় পরিক্ষায় বোর্ডে ২য় স্থান অর্জন করেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মাদরাসার প্রাথমিক শিক্ষা পাবনাতেই সম্পন্ন করে পাড়ি জমান সুদূর যশোরে। সেখানে পেয়ে যান অসামান্য প্রতিভাধর আলেমে দীন মুফতী আ. রাযযাক দা. বা. এর সংস্পর্শ। মহান আত্মোত্যাগী এ উস্তাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে লাগাতার চার বছর অবস্থান করে উর্দু, ফারসী, নাহু, সরফ ও মানতেকের উপর অসামান্য বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর মেখল ও হাটহাজারী মাদরাসাতেও কয়েক হাজার ছাত্রের মাঝে ১ম স্থান ধরে রেখে সর্বশেষ ঢাকার বসুন্ধরা মাদরাসা থেকে মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। বসুন্ধরা বোর্ডের আওতাধীন বোর্ড পরিক্ষায় উভয় জামাতে ১ম স্থান অর্জনসহ অত্যন্ত ভালো ফলাফলের সুবাদে বসুন্ধরা মাদরাসায় তাখাসসুসাত শেষ করে উস্তাদ হিসেবে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ না করে ফিকহে বুৎপত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে বরেণ্য ফকীহ ও মুফতী মিযানুর রহমান সাঈদ দা. বা. এর সাথে তিনি মারকাযুশ শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে চলে আসেন। এখানেও অত্যন্ত সুনামের সাথে ১ম স্থান ধরে রেখে তিন বছর ইফতা পড়ার পাশাপাশি উলূমুল হাদীসও সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন: পড়ালেখা শেষ করে মুফতী মিযান সাহেবের পরামর্শক্রমে মারকাযুশ শাইখ যাকারিয়াতেই উস্তাদ হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি মেশকাত ও দাওরাসহ ইফতা, উলূমুল হাদীস, তাফসীর ও আরবী আদব বিভাগে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সহিত শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

লিখনী ও অবদান: ছাত্র ও কর্মজীবনে সমভাবে তৎপর প্রতিভাবান এ আলেমে দীন পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখিতেও যথেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনূদিত "গোনাহময় জীবনে তাওবার পরশ" এবং মৌলিক রচনা "ইসলামী বিবাহের রূপরেখা", "একসাথে তিন তালাক ও তার বিধান", "শরয়ী মানদণ্ডে ছবি-ভিডিও'র রূপরেখা", "বাহরে শীর শরহে নাহবেমীর" এর পাশাপাশি দশটিরও অধিক তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও রচনা রয়েছে। দলীলভিত্তিক প্রামাণ্য নামাযের উপর তাঁর পাঁচশত পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ কলেবরের একটি বই প্রকাশের পথে। এছাড়া তিনি অনেকগুলো বইয়ের সম্পাদনাও করেছেন। তিনি islamandlife.org নামক একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটে প্রশ্নোত্তর বিভাগে কাজ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সবচে বৃহৎ কীর্তি হলো, বিখ্যাত "আল মাকতাবাতুল কামিলা" নামে সমৃদ্ধ একটি অফলাইন লাইব্রেরী প্রণয়ন। এতে প্রায় দশ কোটি টাকা সমমূল্যের পিডিএফ ফাইলের আরবী, উর্দু ও বাংলা কিতাব সন্নিবেশিত করেছেন। মাকতাবাতুল আযহারের মধ্যস্থতায় তা এখন বাংলাদেশের অসংখ্য আলেমের কিতাবের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা: জাগ্রত চিন্তা ও উন্নত চিন্তা-চেতনার অধিকারী এ তরুণ আলেমের ভাবনা সুদূরপ্রসারী। অনুসন্ধানী মানসিকতা, ব্যাপক অধ্যায়ন ও বিশ্ব পরিস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি থেকে তিনি মুসলিম উম্মাহের প্রতি অসামান্য দরদ অনুভব করেন। যে কোনো মূল্যে তিনি তাদের জাগিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। লেখনি, বক্তৃতা ও তা'লীম-তারবিয়াতের মাধ্যমে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার যে অদম্য আগ্রহ তাঁর, তা এককথায় প্রশংসনীয় ও যুগোপযোগী এক পদক্ষেপ। আমরা তাঁর সৎ লক্ষ্য পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি ও তাঁর জীবনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

সূচিপত্র

নবুওয়াতী জীবন

নবুওয়াতের আলোকধারা

দাওয়াতের প্রথম পর্যায়:

দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

দাওয়াত বন্ধের প্রথম পদক্ষেপ

শোকের বছর

দাওয়াতের তৃতীয় পর্যায়:

প্রথম পর্যায়:

দ্বিতীয় পর্যায়:

তৃতীয় পর্যায়:

মহান প্রভুর সান্নিধ্যে

পবিত্র জীবনের শেষ দিন

ভূমিকা

نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন, শৈশব-কৈশোর, যৌবন-বৃদ্ধকাল– জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধনী-গরীব সব শ্রেণীর মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনীর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾

"বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ– এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সর্বোত্তম চরিত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।"[২]

একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুমহান আদর্শের অনুসরণের মাঝেই রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা। কেবল তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে বান্দা লাভ করতে পারে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা।

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করে বলেছেন–

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

---

১. সূরা আহযাব: ২১

২. সূরা কলাম: ৪

"(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও; তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ তাআলা বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।"[৩]

যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তাঁদের আদর্শের অনুসরণে তাঁদের উম্মাতগণ নিজ নিজ জীবন পরিচালনা করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾

"আমি (প্রত্যেক) রাসূলকে শুধু এ জন্যই প্রেরণ করেছি; যাতে আল্লাহর হুকুমে (দুনিয়াবাসী) তাঁর অনুসরণ করে চলে।"[৪]

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কেউ নবী কিংবা রাসূল হিসেবে আগমন করবেন না। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের আগমন ঘটবে; প্রত্যেকের উপরই ফরয হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য করা। তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের জন্য, তাঁরই সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভের জন্য; সর্বোপরি জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। তাঁরই দেখানো পথে দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জীবনচরিত সম্পর্কেই না জানি; তাহলে কীভাবে তাঁর অনুসরণ করবো? কীভাবে তাঁর পথে চলবো? অতএব প্রত্যেক মুমিনের উপরই আবশ্যক হলো,

৩. সূরা আলে ইমরান: ৩১
৪. সূরা নিসা: ৬৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনচরিত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, তাঁর মহান আদর্শ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সীরাতের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা। তাহলে আমরা সহজেই জানতে পারবো– দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে কেমন ছিলো রাসূল ﷺ এর পবিত্র সুন্নাহ? দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেমন ছিলো তাঁর পথ ও পন্থা? সর্বোপরি আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো– দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন (আমীন)।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনীর প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের প্রত্যেকটি অধ্যায়কে হুবহু গ্রন্থের পাতায় চিত্রায়িত করতে গেলে কমপক্ষে ততটুকু সময় তো অবশ্যই লাগবে, যতটুকু সময় তিনি দুনিয়ার জীবনে অতিবাহিত করেছেন। এ কারণেই তাঁর পবিত্র জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিংবা সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবনী সম্পর্কে এ যাবৎ বহু সীরাতের গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। অদ্যাবদি নানান আঙ্গিকে সংকলিত হচ্ছে। আমরা শুধু এ অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করেছি; যাতে সর্বস্তরের মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান জীবনচরিত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। কারণ অনেক মানুষই এমন রয়েছে, যারা বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়নে সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে নিতান্তই কৃপণতা করে। সুতরাং এ বিষয়টি লক্ষ্য করে, মুখতাসারভাবে এই গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে; এছাড়া ইতঃপূর্বে তো সীরাত সম্পর্কে সালাফগণের বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

যেহেতু আমরা ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নই; সুতরাং বর্ণনায় কিংবা মুদ্রণে এর বহিঃপ্রকাশও দৃষ্টিগোচর হতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ থাকবে– বিস্তারিত জানার জন্য সীরাতের নির্ভরযোগ্য বড় গ্রন্থাদি দেখে নেওয়ার।

পরিশেষে, আমরা মহান আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন এ গ্রন্থখানা অধ্যয়নের দ্বারা আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। এবং আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুবারক মানহাজ বুঝার ও তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের তাওফীক দান করেন। আমীন!

- তারেকুজ্জামান

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী বলতে আল্লাহ প্রদত্ত সে ওহীর বাস্তবায়ন; যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবজাতিকে ভ্রষ্টতার ঘোর অমানিশা থেকে উদ্ধার করে শাশ্বত আলোকজ্জ্বল পথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে প্রবিষ্ট করেছেন।

তৎকালীন আরবের অবস্থান

আরবের ভৌগলিক অবস্থান

আরব ভূখণ্ড পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এ ভূখণ্ডের তিন দিকে সমুদ্র ও এক দিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত। তাই এ ভূখণ্ডকে জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ বলা হয়। এর পূর্ব দিকে আরব উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সিনাই উপদ্বীপ, উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি এবং দক্ষিণে আরব সাগর, যা ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ। দেশটি পুরাতন যুগের মহাদেশসমূহের একেবারে মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। জল ও স্থল উভয় পথেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। লক্ষণীয় যে, সমগ্র আরবভূমি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অপেক্ষাকৃত ঢালু। পাহাড় ও মালভূমি ছাড়া বাকি অংশ মরু অঞ্চল এবং অনুর্বর ভূমি। এর আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।

মরু অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত আরবের উর্বর তৃণ অঞ্চল হেজাজ, নাজদ, ইয়ামান, হাজরামাউত এবং ওমান এ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলো। এ উপদ্বীপের চতুর্দিকে মরুভূমি থাকায় এটি এমন এক সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়েছে যে, কোনো বিদেশী শক্তি বা বহিঃশত্রুর পক্ষে এর উপর আক্রমণ পরিচালনা, অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রভাব বিস্তার করা অত্যন্ত কঠিন। এ নৈসর্গিক কারণেই আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের অধিবাসীগণ সেই সুপ্রাচীন এবং স্মরণাতীত কাল থেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে। অথচ অবস্থানের দিক থেকে জাযিরাতুল আরব দু'টি পরাশক্তি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো।

আরবের আয়তন

আরব ভূখণ্ডের আয়তন প্রায় ৩০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে আরবের অধিবাসীগণ

ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আরবের অধিবাসীগণকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।

০১. শহরবাসী: এদের প্রধান জীবিকা ছিলো কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালন।

০২. বেদুইন: এরা মরু বাসিন্দা ছিলো। পশুচারণের জন্য চারণভূমির খোঁজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণরত থাকতো। এরা ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোকে আক্রমণ করে লুটতরাজ চালাতো।

আরবের সম্প্রদায়সমূহ

জন্মসূত্রে আরব জাতিকে ঐতিহাসিকগণ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাহলো–

০১. আরবে বায়িদাহ: এরা হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গোত্রসমূহ। যেমন: আদ, সামূদ, তাসম, জাদীস ইত্যাদি।

০২. আরবে আরিবা: এরা কাহতানের বংশধর। এ কারণে এদেরকে কাহতানী আরব বলা হয়।

০৩. আরবে মুস্তা'রিবা: এরা ইসমাঈল আ. এর বংশধারা থেকে আগত। এদের অপর নাম আদনানী আরব।

তৎকালীন আরবের অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিলো বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তখন দু'প্রকারের রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো।

০১. মুকুট পরিহিত শাসক: এরা মুক্ত ছিলো না। পারস্য বা রোমানদের অধীনে ছিলো। তাদের শাসনের স্থলসমূহ ছিলো ইয়ামান, আলে গাসসান শামে, হীরাহ'র বাদশাহী ইরাকে।

০২. গোত্রীয় শাসন: অবশিষ্ট বিশাল এলাকায় গোত্রপতিদের শাসন কার্যকর ছিলো।

মোটামুটিভাবে আরবের রাজনৈতিক অবস্থাকে এভাবে চিত্রায়িত করা যায়-

ক. গোত্রীয় দ্বন্দ্বঃ এক গোত্রের সাথে অপর গোত্রের শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক ছিলো। অতি সামান্য কারণে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হতো। কখনো কখনো তাদের যুদ্ধ দিনের পর দিন লেগেই থাকতো। যাকে আইয়্যামুল আরব বলা হয়। যেমন, বুআস ও ফিজারের যুদ্ধ।

খ. দুর্বলের উপর অত্যাচারঃ সেখানে 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতির প্রাবল্য ছিলো। দুর্বলদের উপর শক্তি-ক্ষমতার দাপটে জালিমরা জুলুম-অত্যাচার চালাতো।

গ. গোত্রপ্রীতিঃ গোত্রের লোকেরা যত অন্যায় করুক না কেন; তবুও তারা নিজ গোত্রের লোকদের সঙ্গ দিতো। যেমন, বলা হতো–

انصر اخاك ظالما او مظلوما 'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে অত্যাচারিত হোক বা অত্যাচারী।'

তবে এতদসত্ত্বেও মাঝে মাঝে গোত্রীয় চুক্তি তথা আল-আহনাফ সংঘটিত হতো।

সামাজিক অবস্থা

নারীর অবস্থান

তারা কেবল অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সম্মান রক্ষা করার ব্যাপারে সজাগ থাকতো। এছাড়া জাহেলী যুগে আরব সমাজে অন্যান্য নারীদের অবস্থান ছিলো অতি নিচু পর্যায়ে। সেখানে পুরুষপ্রধান সমাজ কাঠামো প্রচলিত ছিলো। পারিবারিক জীবনের বন্ধন হতো বিবাহের মাধ্যমে; তবে জাহেলী যুগে চার প্রকারের বিবাহের অস্তিত্ব ছিলো।

প্রথম প্রকার বিবাহ, যা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। এতে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতিতে বর কনেকে মোহর দিয়ে বিবাহ করতো।

বিবাহের দ্বিতীয় প্রকার প্রথা ছিলো নিকাহে ইসতিবযা। উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে জ্ঞানী, গুণী বা শক্তিধর কোনো পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করতে প্রস্তাব পাঠাতে বলতো। স্ত্রীর প্রস্তাব গৃহীত হলে গর্ভধারণের সুস্পষ্ট

আলামত পাওয়া পর্যন্ত ঐ লোক সঙ্গম চালিয়ে যেতো। এর আগে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত হতো না। ভারতীয় পরিভাষায় একে 'নিয়োগ বিবাহ' বলা হয়।

বিবাহের তৃতীয় জঘন্য প্রকার হলো, দশ থেকে কম সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হয়ে সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সাথে সঙ্গমে মিলিত হতো। সন্তান প্রসবের পর সকলকে ডেকে আনা হতো। কেউ আসতে বারণ করতে পারতো না। সকলে আসলে মহিলা যে কোনো একজনকে তার বাচ্চার পিতা নির্বাচন করে নিতো।

চতুর্থ প্রকার হলো পতিতাগিরি। এদের ঘরের বাহিরে এ নিকৃষ্ট কর্মের নিশান লাগানো থাকতো; যেন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় তাদের কাছে গমন করতে পারে। সন্তান প্রসবের পর তার সাথে অপকর্মকারী সকল ব্যক্তিকে ডাকা হতো। মানুষের অবয়ব দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন একজন লোক তাদের যে কোনো একজনের সাথে সন্তানের যোগসূত্র স্থাপন করে দিতো।

বিঃ দ্রঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের সকল নোংরা বিবাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। অথচ আজ গণতন্ত্রের মানসপুত্ররা আবার এসব জাহেলী নোংরামি প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ।

কন্যা সন্তানদের অবস্থা

কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে তারা পৈশাচিক দুষ্কর্ম করতে একটুও দ্বিধাবোধ করতো না। তারা লোকলজ্জা, যুদ্ধের পর বাঁদি হওয়া, অভাব অনটনের ভয়ে কন্যাদের জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলতো।

নৈতিকতা বিবর্জিত অবস্থা

নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ে তারা একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলো। যিনা-ব্যভিচার, অনাচার, লুটতরাজ, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ, নারীহরণ ইত্যাদি অপকর্ম তাদের সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো। সুদ অনাদায়ে ঋণ গ্রহীতার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদেরকে দাস-দাসীরূপে ব্যবহার করা হতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জাহেলী যুগের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সামাজিক অবস্থার চাইতে উন্নত বলা যায় না। জীবিকার ভিত্তিতে তাদেরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, সুদি কারবারী, মূর্তি তৈরিকারী কারিগর, মরুবাসী বেদুইন।

ধর্মীয় অবস্থা

জাহেলী যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের ধর্মীয় অবস্থাকে নিম্নোক্ত প্রকারসমূহে চিত্রায়িত করা যায়।

০১. পৌত্তলিকঃ তারা মূর্তিপূজা থেকে শুরু করে চন্দ্র, সূর্য, তারা, গাছ, পাথর, কূপ, গুহা ইত্যাদির পূজা করতো। আর বলতো, এগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। মূর্তিগুলোর মাঝে তায়েফে লাত, কুদাইদে মানাত, নাখলায়ে ওয্যা তাদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিলো। এমনকি পবিত্র কা'বা ঘরেও তারা মূর্তি স্থাপন করেছিলো।

০২. ইয়াহুদী-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ঃ তারা নিজেদেরকে আসমানী গ্রন্থের ধারক ও একেশ্বরবাদী বলে দাবি করতো। অথচ তারা তাদের আসমানী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নিজেদের ধর্মগুরুর কথামতো চলতো। ইয়াহুদীরা উযায়ের আ. কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতো আর খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদের মতো জঘন্য আকীদা পোষণ করতো।

০৩. হানীফ সম্প্রদায়ঃ এতদসত্ত্বেও আরও এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন; যারা ইবরাহীম আ. এর প্রচারিত একত্ববাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন, ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল, যায়েদ ইবনে আমর, আবু আনাস, লাবিদ ইবনে রবীআহ আমেরী প্রমুখ।

জাহেলী যুগের উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তখনকার অধিবাসীরা সকল দিক দিয়ে অত্যন্ত নিচু পর্যায়ে ছিলো। তবে সবাই যে এরকম ছিলো তা নয়; কারণ তাদের কারো কারো মাঝে ভালো কিছু গুণেরও বহিঃপ্রকাশ ছিলো। আল্লামা আল-জুজী রহ. উল্লেখ করেছেন, আতিথেয়তা, উদারতা,

ওয়াদাপূরণ, লজ্জাশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, দৃঢ় সংকল্প, প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, শুদ্ধ ও সাধারণ জীবনযাপনের মতো কিছু বৈশিষ্ট্যও তাদের মাঝে পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকে এমন উত্তম গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশ পরিচিতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র বংশধারা পৃথিবীর সমস্ত বংশধারা হতে অধিক সম্ভ্রান্ত ও উত্তম। এমনকি মক্কার কাফেররা যখন তাঁর ঘোর শত্রুতায় লিপ্ত ছিলো, তখনো তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি। আবু সুফইয়ান রাযি. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাফের থাকা অবস্থায় রোমসম্রাটের সম্মুখে তা স্বীকার করেছিলেন।

পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (শায়বাহ) ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র ইবনে মালিক ইবনে নাযর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নাযার ইবনে মাআদ ইবনে আদনান।

এ পর্যন্ত বংশতালিকায় কোনো মতভেদ নেই। এখান থেকে পরবর্তী বংশতালিকার বর্ণনার মাঝে কিছুটা মতের অমিল থাকায় এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। আগ্রহী পাঠকবৃন্দ সীরাতের বড় বড় গ্রন্থ থেকে তা দেখে নিতে পারেন।

মাতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা

মুহাম্মাদ ইবনে আমিনা বিনতে ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব। দেখা যাচ্ছে, কিলাব পর্যন্ত গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিতৃ ও মাতৃ বংশ পরম্পরা একত্রে মিলে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শুভ জন্ম ও দুগ্ধপান

অধিকাংশ আলেমের মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শুভ জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিন[৫] হয়েছিলো। যে বছর আসহাবে ফীল কা'বা অভিমুখে অভিযান করেছিলো। শিশু নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে প্রথমে তাঁর শ্রদ্ধেয়া জননী আমিনা এবং কিছুদিন পর আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবাহ দুধ পান করান। অতঃপর হালীমা সা'দিয়া এ সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রগুলোর মাঝে সাধারণত এরূপ প্রথার প্রচলন ছিলো যে, তাঁরা নিজ শিশুদেরকে দুধ পান করানোর জন্য আশপাশের গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দিতো। ফলশ্রুতিতে শিশুদের শারীরিক সুস্থতার বিকাশ ঘটতো এবং তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে পারতো। এজন্য বেদুইন পরিবারের মহিলারা শিশু সংগ্রহের জন্য প্রায়ই শহরে আসতো। একবার বনু সা'দ গোত্রের একদল মহিলার সঙ্গে বিবি হালীমা অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কায় আসেন। সাথে ছিলেন তার স্বামী ও একটি দুধের শিশু।

বিবি হালীমা বলেন, বছরটি ছিলো দুর্ভিক্ষের বছর। দুর্ভিক্ষের কারণে আমাদের প্রায় সবকিছুই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমি আমার সাদা মাদি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে চলছিলাম। আমার সঙ্গে উটও ছিলো। উটের ওলান থেকে এক ফোঁটা দুধও বের হচ্ছিলো না। আমার শিশুটির জন্য আমার বুকেও এক বিন্দু দুধ ছিলো না। ক্ষুধার তাড়নায় সে ছটফট করছিলো। তার কান্নাকাটির কারণে সারাটি রাত আমরা ঘুমাতে পারিনি।

আমার মাদি গাধাটি ছিলো খুবই দুর্বল। দুর্বলতার কারণে সে এতই ধীরে ধীরে পথ চলছিলো যে, কাফেলার অপর সাথীরা বিরক্ত হচ্ছিলো। যাই হোক, অবশেষে আমরা মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর আমাদের দলের এমন কোনো মহিলা ছিলো না; যার কাছে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে দুধ পান করানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। কিন্তু পিতৃহীন এ ইয়াতীমকে সঙ্গে নিতে তারা সকলে অস্বীকৃতি জানালো। কেননা পিতৃহীন শিশুটির মা আর দাদার কাছ থেকে

৫. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মতে, সেই দিনটি ১২ই রবিউল আউয়াল। তিনি এর উপর ইজমার দাবি করেন। আল-কামিল গ্রন্থে ইবনে আসীর রহ. এই তারিখটিই গ্রহণ করেছেন। ইবনে জাওযী রহ. এর মতে, দিনটি ছিলো ৮ই রবিউল আউয়াল (যুরকানী: ১/৯৩০)।

বেশি কিছু আশা করা যাচ্ছিলো না।

এদিকে দলের সকল মহিলাই একটি করে শিশু পেলো। বাকি রইলাম শুধু আমি। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বললাম, শূন্য হাতে ফেরার চেয়ে বরং আমি সেই ইয়াতীম শিশুটিকেই নিয়ে যাই। আল্লাহ যা করেন।

স্বামী বললেন, ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নেই। তুমি গিয়ে তাঁকেই নিয়ে এসো। এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ এর মাঝে আমাদের জন্য কোনো বরকত রেখেছেন।

তারপর হালীমা বলেন, যখন আমি শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নিয়ে কাফেলার কাছে ফিরে এলাম এবং তাঁকে আমার কোলে রাখলাম; তখন তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে আমার স্তন থেকে দুধ পান করলেন। আমার গর্ভজাত সন্তানটিও তৃপ্তির সাথে দুধ পান করলো। এরপর উভয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। এর পূর্বে আমরা তাকে এভাবে ঘুমাতে দেখিনি। আমার স্বামী দুধ দোহন করতে উটের কাছে গিয়ে দেখেন, উটের ওলান দুধে পরিপূর্ণ। তিনি এত অধিক পরিমাণ দুধ দোহন করেন যে, আমরা উভয়ে তা পরিতৃপ্তির সাথে পান করলাম। তারপর বড় আরামের সাথে রাত যাপন করলাম। সকালে আমার স্বামী বললেন, হালীমা! আল্লাহর শপথ! তুমি একজন মহাসৌভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছো। উত্তরে আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমারও তাই মনে হচ্ছে।

এরপর আমরা ফেরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। এবার আমার সেই দুর্বল গাধাটি এত দ্রুত পথ চলতে লাগলো যে, সবাইকে পেছনে ফেলে সামনে চলে গেলো। অন্য কোনো গাধাই তার সাথে সমান তালে চলতে পারলো না। ফলে অন্যান্য সঙ্গিনীরা বলতে লাগলো, হে আবু যুওয়াইবের কন্যা! হায়! এটা কি সেই গাধা নয়, যার উপর সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে?

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! এটা সেই গাধা। তারা বললো, নিশ্চয়ই কোনো রহস্যজনক ব্যাপার ঘটেছে।

অবশেষে আমরা নিজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। ইতঃপূর্বে আমার জানা ছিলো না যে, আমাদের অঞ্চলের চাইতে আর কোনো অঞ্চল এত অনুর্বর ও নিষ্ফল ছিলো কিনা? কিন্তু মক্কা হতে ফেরার পর আমাদের বকরীগুলো

চারণভূমি থেকে পেটপুরে ওলান ভরে বাড়িতে ফিরে আসতো। আমরা পূর্ণতৃপ্তির সাথে দুধ পান করতাম। অথচ অন্যরা এক ফোঁটা দুধও পেতো না। এমন অবস্থায় পশুপালের মালিকগণ তাদের রাখালদের বলতো, হতভাগারা! যেখানে আবু যুওয়াইবের কন্যার রাখাল পশুপাল নিয়ে যায়, তোমরা কি তোমাদের পশুপাল নিয়ে সেই চারণভূমিতে যেতে পারো না? রাখালরা সে ভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেতো; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসতো। সেই সব পশুর ওলানে দুধও থাকতো না।

এভাবে আমাদের নিকট তাঁর দু'বছর পূর্ণ হলো। আমি তাঁকে স্তন্যদান বন্ধ করে দিলাম। এ সময়ে তাঁর দেহ অন্য শিশুদের তুলনায় খুব হৃষ্টপুষ্ট, শক্ত ও সুঠাম হয়ে গড়ে উঠলো। আমরা তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে গেলাম; কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর আমরা আমাদের সংসারে যে বরকত ও সচ্ছলতা ভোগ করে আসছিলাম, সে প্রেক্ষিতে আশা জাগছিলো- যদি সে আরও কিছু সময় আমাদের নিকট থাকতো! তাঁর মাকে আমাদের মনের গোপন ইচ্ছে ব্যক্ত করলাম। বললাম, তাঁকে আরও কিছু সময় আমাদের সাথে থাকতে দিলে সে আরও সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে উঠবে; অধিকন্তু মক্কায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কেও আমরা কিছুটা ভয় করছি। আমাদের বারবার অনুরোধে ও আন্তরিকতায় তিনি আশ্বস্ত হলেন। ফলে পুনরায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন।[৬]

পিতৃছায়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তাঁর সম্মানিত পিতা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনায় যান। ঘটনাক্রমে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন। এভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাঁর উপর থেকে পিতৃছায়া অপসারিত হয়ে যায়।[৭]

রাসূল ﷺ এর পেশা

রাসূল ﷺ এর জীবনের প্রথম পেশা ছিলো গবাদি পশুচারণ। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবীকে প্রেরণ করেননি, যাকে মেষপালক

---

৬. ইবনে হিশাম: ১/১৬২-১৬৮ পৃ.

৭. মোঘল তাঈ : ৭ পৃ.

হতে হয়নি।” সাহাবীগণ তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, “হ্যাঁ! আমি মক্কার লোকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে মেষ চরাতাম। এটা আশ্চর্যজনক যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল আম্বিয়াকে এভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।”

রাখাল হওয়ার মাধ্যমে আম্বিয়া আ. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তা হলো, দায়িত্বশীলতা। রাসূল ﷺ বলেন–

﴿ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ﴾

“জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” [৮]

শিক্ষা:

০১. একজন নেতাকে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে। দায়িত্বশীল হতে হবে অধীনস্থ সকল সদস্যকে। কেননা প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কারো এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমি কাজটা ভালোভাবে আদায় করতে পারিনি।

০২. কোনো দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক।

০৩. একজন দাঈকে দাওয়াতের ময়দানে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সাথে উঠাবসা করতে হয়। আর একেকজনের প্রকৃতি একেক রকম হয়ে থাকে। এ অবস্থায় একজন দাঈকে ধৈর্য এবং স্থিরতার পরিচয় দিতে হবে।

০৪. একজন আদর্শ নেতা বা যোগ্য দাঈ অতি সাধারণ জীবনযাপন করে থাকেন। কারণ দাওয়াতের কাজে তাকে বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যেতে হয়।

---

৮. সহীহ মুসলিম: ১৮২৯

তাই তিনি যদি ধনীও হোন; তবুও বিলাসসামগ্রী সাথে নিয়ে সফর করেন না। এতে করে তিনি নিজেকে প্রচণ্ড গরম-ঠাণ্ডা, ঝড়-বৃষ্টির মতো নানা বৈরী পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারেন। তাছাড়া একজন নেতা এমন কঠিন মুহূর্তগুলোতে নিজের আগে জাতির আশ্রয়ের কথা চিন্তা করেন।

বক্ষ বিদারণ

রাসূল ﷺ এর জন্মের চতুর্থ বা পঞ্চম বছর তাঁর পবিত্র বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। একদিন রাসূল ﷺ ও তাঁর দুধভাই আব্দুল্লাহ পশু চরাতে গেলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ফিরে এলেন। এবং তার বাবাকে বললেন, আমার কুরাইশী ভাইকে দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক শুইয়ে তাঁর বুক চিরে ফেলেছে। আমি তাঁদেরকে এ অবস্থায় রেখে এসেছি। আমরা ঘাবড়ে গিয়ে মাঠের দিকে দৌড়ে গেলাম। দেখতে পেলাম, তিনি বসে আছেন; কিন্তু তাঁর চেহারার রঙ বিবর্ণ হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক এসে আমাকে ধরে শুইয়ে দিলো। আমার পেট ফেঁড়ে কী যেন খুঁজে বের করলো; আমি জানি না, তা কী ছিলো? অতঃপর আমরা তাঁকে ঘরে নিয়ে আসলাম।[৯]

মক্কায় এসে তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট সমর্পণ করলাম। তখন তাঁর মা বললেন, আগ্রহের সাথে নিয়ে গিয়ে এত শীঘ্রই ফিরিয়ে আনার কারণ কী? অনেক জিজ্ঞেস করার পর সমুদয় ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করতে হলো। তিনি তা শুনে বললেন, অবশ্যই আমার সন্তানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।[১০]

চলে গেলেন মমতাময়ী মা

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ হালীমা সা'দিয়ার ঘরে বড় হোন।[১১] সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর মা আমিনা তাঁকে নিয়ে ইয়াসরিব গিয়ে স্বামীর

---

৯. ইবনে হিশাম, যাদুল মাআদ: ৮০ পৃ.

১০. ইবনে হিশাম: ৯ পৃ.

১১. ইবনে হিশাম: ১/১৬৮ পৃ.; তালকীহুল ফুহুম: ৭ পৃ.

কবর যেয়ারত করার মনস্থ করেন। আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশু মুহাম্মাদ ﷺ ও দাসী উম্মে আয়মানকে নিয়ে তিনি পাঁচশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছেন। সেখানে এক মাস অবস্থান করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন; কিন্তু মদীনার সন্নিকটেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অসুস্থতা বাড়তেই থাকলো। এমনকি আবওয়া নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১২]

দাদার স্নেহের ছায়াতলে

জন্মের পূর্বে পিতাকে হারিয়ে কাছে পেলেন মমতাময়ী মাকে। এবার সেই মা-কেও হারালেন। বেঁচে রইলেন দাদা। দাদা আব্দুল মুত্তালিব রাসূল ﷺ কে তার ঔরসজাত সন্তানদের থেকেও অধিক আদর করতেন। কা'বা ঘরের ছায়ায় নিজের জন্য নির্ধারিত স্থানে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ কে বসালে চাচারা তাঁকে নামাতে চাইতেন; কিন্তু দাদা তাঁকে নামাতে নিষেধ করতেন। বলতেন, আল্লাহর শপথ! এ শিশু কোনো সাধারণ শিশু নয়। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর কার্যাবলী দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।[১৩]

কিন্তু আল্লাহ তাআলা'র অভিপ্রায় ছিলো এ সত্যটুকু তুলে ধরা যে, এ বালক শুধু রহমতের কোলেই প্রতিপালিত হবেন। যিনি সকল কার্যকরণের আসল নিয়ামক; সেই মহান রব্বুল আলামীন স্বয়ং তাঁর দায়িত্ব নিচ্ছেন। রাসূল ﷺ এর বয়স যখন আট বছর দুই মাস দশ দিন, তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল মুত্তালিব মুহাম্মাদ ﷺ কে লালন-পালনের জন্য আবু তালিবকে ওসিয়ত করে যান।[১৪]

চাচার তত্ত্বাবধানে

ওসিয়ত মোতাবেক চাচা আবু তালিব তাঁকে লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ কে আপন সন্তানের চেয়েও বেশি স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। তার পিতার মতোই আবু তালিব তাঁকে নানাভাবে

১২. ইবনে হিশাম: ১/১৬৮; তালকীহুল ফুহুম: ৭ পৃ.; তারীখে খুযরী: ১/৬৩; ফিকহুস সীরাহ, গাযালী: ৫০ পৃ.

১৩. ইবনে হিশাম: ১/১৬৬

১৪. ইবনে হিশাম: ১/১৪৯; তালকীহুল ফুহুম: ৭ পৃ.

সম্মান প্রদর্শন করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিচক্ষণ চাচার অধীনে লালিত-পালিত হতে থাকেন। এমনকি চাচা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারী লোকদের সাথে বাক-বিতণ্ডাও করতেন।

শামের পথে, সান্নিধ্যে আসলেন বাহীরা রাহিব

বারো বছর বয়সে ব্যবসায়িক সফরে চাচা আবু তালিবের সাথে তিনি একবার শামের (সিরিয়া) বসরায় উপস্থিত হোন।[১৫] এ শহরে ছিলেন জারজীস নামক এক খ্রিস্টান ধর্মজাযক; যিনি বাহীরা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। মক্কার ব্যবসায়ীরা বসরায় শিবির স্থাপন করলে বাহীরা রাহিব তাদের নিকট আসলেন; অথচ অন্য কোনো বাণিজ্য কাফেলার কাছে এভাবে কখনো তিনি আগমন করেননি। তিনি কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ কে দেখে বুঝতে পারলেন, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারি শেষ নবী (ﷺ)। তারপর তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন, ইনি হচ্ছেন বিশ্বজাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ মনোনীত করবেন।

আবু তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীভাবে বুঝলেন, তিনি আখেরী নবী হবেন? তিনি বললেন, গিরিপথের প্রান্ত থেকে কাফেলার আগমন তিনি দেখছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, এমন কোনো বৃক্ষ বা পাথর ছিলো না; যা তাঁকে সিজদা করেনি। তাঁর কাঁধের কড়ি হাঁড়ের পাশে আপেল আকৃতির একটি দাগ আছে, সেটাই হচ্ছে মোহরে নবুওয়াত। আমাদের কিতাব ইনজীল থেকে আমরা এসব কিছু অবগত হয়েছি।

তারপর পাদ্রি বললেন, তাঁকে নিয়ে শামে ভ্রমণ করবেন না। কারণ তাঁর পরিচয় ইয়াহুদী ও রোমীয়রা জানতে পারলে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ কথা জানার পর আবু তালিব তাঁকে কয়েকজন গোলামের সঙ্গে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।[১৬]

---

১৫. বসরা তখন শামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।
১৬. ইবনে হিশাম: ১/১৮০-১৮৩ পৃ., মুখতাসারুস সীরাহ: ১৬ পৃ.; যাদুল মাআদ: ১/১৭ পৃ.

ফিজার যুদ্ধ ও হিলফুল ফুযূল

রাসূল ﷺ এর বয়স যখন বিশ বছর তখন ওকায বাজারে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ফিজার যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীদেরকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটেছে, কত শিশু যে ইয়াতীম হয়েছে, বিধবা হয়েছে কত নারী আর নষ্ট হয়েছে কত ধন-সম্পদ, তার কোনো হিসেব নেই। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত না হতে হয়। এমন ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার না হতে হয়। সেজন্য কুরাইশের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন তাইমীর ঘরে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করেন।

রাসূল ﷺ বলেন, আমিও এ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। এ চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পরিবর্তে আমাকে যদি লাল উটও দেওয়া হতো; তবুও আমি তা কখনো পছন্দ করতাম না। বর্তমানেও কেউ যদি আমাকে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য আহ্বান করে আমি অবশ্যই তাতে অংশগ্রহণ করবো।[১৭]

তখনকার নিয়ম ছিলো গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোনো ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনো ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লিষ্ট সকলকে তার সমর্থন করতেই হবে; চাই সে যত বড় বা বীভৎস অন্যায় করুক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয়ে যায় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই এ ধরনের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে পারে না। তাদের অঙ্গীকারনামার শর্তগুলো ছিলো–

০১. দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

০২. বিদেশী লোকজনের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

০৩. দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনোই কুণ্ঠাবোধ করবো না।

১৭. ইবনে হিশাম: ১/১৩৩ ও ১৩৫ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ৩০-৩১ পৃ.

০৪. অত্যাচারী ও অনাচারীদের থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

এটা ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি অঙ্গীকারনামা। ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারনামা। তাই একে হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা বলা হয়।[১৮]

শিক্ষা:

০১. একজন সুচিন্তাশীল ব্যক্তি অন্যায়-অনাচারের মাঝে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না।

০২. সমাজ থেকে সব ধরনের অশান্তি ও গর্হিত কাজ দূর করার জন্য উত্তম ব্যক্তিদের সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০৩. দুঃস্থ-দুর্বল লোকদের সহায়তায় উত্তম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং অত্যাচারীদের অত্যাচার রুখতে ঐক্যবদ্ধভাবে যথাযথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি. এক সম্ভ্রান্ত সম্পদশালিনী ও ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তিনি ব্যবসায়ীগণের নিকট অর্থলগ্নী করতেন। পুরো কুরাইশ গোত্র মূলত ব্যবসার উপরই নির্ভর করতো। খাদীজা রাযি. যখন মুহাম্মাদ ﷺ এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র ও আমানতদারিতার ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন তিনি তাঁর নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। তা হলো, তিনি খাদীজা রাযি. এর অর্থ নিয়ে ব্যবসা করার জন্য তাঁর দাস মায়সারাহ'সহ শামে যেতে পারেন। তিনি আরও বললেন, অন্য ব্যবসায়ীকে যে পরিমাণ লাভ দেওয়া হয়; তাঁকে তার চেয়ে বেশি লাভ দেওয়া হবে। মুহাম্মাদ ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। খাদীজা রাযি. এর অর্থ ও দাস মায়সারাহকে নিয়ে তিনি শামে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো পঁচিশ বছর।[১৯]

১৮. ইবনে হিশাম: ১/১৩৩ ও ১৩৫ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ৩০-৩১ পৃ.
১৯. ইবনে হিশাম: ১/১৮৭-১৮৮ পৃ.

শিক্ষাঃ

নিজের জরুরত মেটানোর জন্য হালাল উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা উত্তম কোনো পেশা অবলম্বন করা উচিত।

খাদীজা রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ

ব্যবসা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খাদীজা রাযি. হিসেব করে দেখলেন, তিনি এত বেশি অর্থ পেলেন; যা এর আগে কখনো পাননি। তাছাড়া মায়সারাহ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ এর সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক মাধুর্যতা সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর প্রতি খাদীজা রাযি. এর শ্রদ্ধা ও ব্যাকুলতা বাড়তে থাকলো। ক্রমেই তাঁর মনে মুহাম্মাদ ﷺ কে স্বামী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছে আর আগ্রহ প্রবল হতে লাগলো। অথচ এর আগে বড় বড় সরদার, নেতা, গোত্রপ্রধানগণ তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন; কিন্তু তিনি তাদের কারো প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি। মুহাম্মাদ ﷺ কে স্বামী হিসেবে পেতে তাঁর যারপরনাই ব্যাকুলতা যেন বৃদ্ধিই পাচ্ছিলো। তিনি তাঁর বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ'র সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। তাকে বললেন, তাঁর এ প্রস্তাবটি মুহাম্মাদ ﷺ কে জানানোর জন্য।

রাসূল ﷺ স্বীয় চাচা আবু তালিবকে তা জানালেন। তিনি খাদীজা রাযি. এর চাচার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে বিবাহের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করলেন। তারপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দু'টি প্রাণ পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। বিবাহ অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযারের প্রধানগণের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করে।[২০] আবু তালিব এ পবিত্র বিবাহের খুতবা পাঠ করেন। তা হলো–

"ইনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। যিনি ধন-সম্পদের দিক থেকে কম হলেও মহান চরিত্র আর অনুপম গুণাবলীর দরুন যাকেই তাঁর মোকাবেলায় আনা হবে; তিনি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হবেন। কেননা ধন-সম্পদ একটি ছায়ার মতো; যা আসে আর যায়। আর মুহাম্মাদ যাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার

---

২০. ইবনে হিশামঃ ১/১৮৯-১৯০ পৃ.; ফিকহুস সীরাহঃ ৫৯ পৃ.; তালকীহুল ফুহুমঃ ৭ পৃ.

সম্পর্ক; যা আপনাদের সবারই জানা, তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাচ্ছেন। তার সমুদয় মোহরানা চাই তা দেরিতে দেওয়া হোক বা তাড়াতাড়ি; তা আমার সম্পদ থেকে দেওয়া হবে। আল্লাহর শপথ! তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও নন্দিত হবেন।"

শাম থেকে ফেরার দু'মাস পর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ ﷺ বিয়ের মোহরস্বরূপ খাদীজা রাযি. কে ২০টি উট প্রদান করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিলো পঁচিশ বছর। আর খাদীজা রাযি. এর বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল ﷺ অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করেননি।[২১]

রাসূল ﷺ এর সন্তানগণের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্য সকলেই ছিলেন খাদীজা রাযি. এর গর্ভজাত সন্তান। তাঁদের প্রথম সন্তানের নাম কাসিম। এ জন্যই রাসূল ﷺ কে আবুল কাসিম উপনামে ডাকা হতো। কাসিমের পর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়াহ, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিলো তাইয়িব ও তাহির।

রাসূল ﷺ এর সকল পুত্র সন্তান বাল্যাবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তবে কন্যাগণের সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরাহ'র মর্যাদা লাভ করেছেন। তবে ফাতেমা ব্যতীত সকল কন্যাই পিতার জীবদ্দশাতে মৃত্যুবরণ করেন। আর ফাতিমা রাযি. রাসূল ﷺ এর ওফাতের ছয় মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।[২২]

কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ ও হাজারে আসওয়াদ সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন, তখন কুরাইশগণ কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করেন। কারণ তা অনেক আগে নির্মাণ করা হয়েছিলো বিধায় দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যায় এবং যে কোনো সময় ভেঙে পড়ারও উপক্রম হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া মক্কায় ঐ বছর বন্যা হওয়ার কারণে কা'বা অভিমুখে পানির স্রোত সৃষ্টি হয়েছিলো। এমন অবস্থায় কুরাইশগণ কা'বা পুনঃনির্মাণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। এ নির্মাণের সময়

---

২১. প্রাগুক্ত

২২. ইবনে হিশাম: ১/১৯০-১৯১ পৃ.; ফিকহুস সীরাহ: ৬০ পৃ.; ফাতহুল বারী: ৭/১৫০ পৃ.

তাদের বৈধ অর্থ-সম্পদগুলোই শুধু ব্যবহার করা হয়েছিলো।

আল্লাহর ঘরের দেয়াল ভাঙা তাঁর ক্রোধের কারণ মনে করে ভয়ে কেউই দেয়ালে হাত লাগাচ্ছিলো না। তখন সর্বপ্রথম ভাঙার কাজে হাত দেন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ মাখযূমী। তারপর বাকিদের ভয় কেটে গেলে তারাও তাতে হাত লাগায়। নির্মাণ কাজে প্রত্যেক গোত্র যেন অংশ নিতে পারে, সেজন্য পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিলো– কে কোন অংশ নির্মাণ করবে? বাকূম নামক এক রোমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিলো; কিন্তু হাজারে আসওয়াদের স্থান পর্যন্ত গিয়ে কাজ থেমে যায়। ব্যাপারটি হলো, কে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করে মহাগৌরব অর্জন করবে? চার-পাঁচ দিন এ নিয়ে ঝগড়া চলছিলো। সবাই নিজ নিজ দাবিতে অনড়। তাদের জিদ ধীরে ধীরে রেষারেষি পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এ ব্যাপারে তারা কিন্তু খুনাখুনি করতেও পিছপা হবে না, সকল গোত্রে যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রব; এমনই এক অবস্থা তখন বিরাজ করছিলো।

এমন অবস্থায় আবু উমাইয়া মাখযূমী এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, আগামীকাল সকালে যিনি সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন; তিনিই এ বিবাদ মীমাংসা করবেন। সকলে এ প্রস্তাব মেনে নিলো। পরদিন দেখা গেলো সবার প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আল-আমীন সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন। তখন তারা চিৎকার করে বলে উঠলো–

هذا الامين رضيناه هذا محمد

"তিনি বিশ্বস্ত। আমরা সকলেই তাঁর উপর সন্তুষ্ট। তিনি মুহাম্মাদ।"

যখন তারা রাসূল ﷺ এর নিকট বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করলো। তখন তিনি একটি চাদর চাইলেন। তারপর চাদরের উপর হাজারে আসওয়াদকে রাখলেন। অতঃপর গোত্রপতিদেরকে বললেন, আপনারা সকলে চাদরের পাশ ধরে উত্তোলন করুন। তারা তাই করলো। যখন চাদর নিয়ে তারা পাথর রাখার স্থানে এলো; তিনি নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদ উঠিয়ে যথাস্থানে

রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলো। ফলে অত্যন্ত সহজ ও সুশৃঙ্খলতার সাথে বিষয়টির সমাধান হয়ে গেলো।[২৩]

শিক্ষাঃ

০১. বিবাদ মীমাংসাকারী বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই উত্তম গুণাবলী ও সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাহলে সকল শ্রেণীর লোক যে কোনো সিদ্ধান্ত সহজে মেনে নেবে।

০২. বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে এমন বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে, যাতে সবাই সন্তুষ্টচিত্তে ফায়সালা মেনে নেয়। এবং পরবর্তীতে এ নিয়ে আর কোনো কলহ-কোন্দলের সূত্রপাত না ঘটে।

নবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন সংক্ষিপ্ত চরিত

মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে যেসব উত্তম গুণের বিকাশ হতে পারে; সেই সব গুণের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে রাসূল ﷺ এর সম্পূর্ণ জীবনে। তিনি ছিলেন যথার্থ চিন্তা-চেতনার অধিকারী। পারদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। রাসূল ﷺ কে দেওয়া হয়েছিলো সুষমা-মণ্ডিত দেহ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যাবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা। তিনি দীর্ঘ সময় যাবৎ নীরবতা অবলম্বনের ফলে নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যান ও অনুসন্ধান কাজে রত থাকতেন এবং সকল বিষয় সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ন্যায় ও সত্য উদঘাটন করতে সক্ষম হতেন। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নির্ভুল নিরীক্ষণ ক্ষমতার মাধ্যমে মানব সমাজের প্রকৃত অবস্থা, গোত্রসমূহের গতিবিধি, মন-মানসিকতা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুধাবন করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী ছিলেন। যার ফলে শত অন্যায়-অবিচারে বেষ্টিত সমাজে বাস করেও তিনি কখনো শরাব স্পর্শ করেননি, বেদিমূলে যবেহকৃত পশুর গোস্ত কখনো ভক্ষণ করেননি। সর্বোপরি তিনি কোনো ধরনের কলুষতায় নিজেকে জড়াননি।

২৩. ইবনে হিশামঃ ১/১৯২-১৯৭ পৃ.; ফিকহুস সীরাহঃ ৬২ পৃ.; সহীহ বুখারীঃ ১/২১৫

শৈশবকাল থেকেই তিনি আরবের মিথ্যা উপাস্যগুলোকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। এমনকি লাত ও ওয্যার নামে শপথ করার ব্যাপারটি তাঁর কানে গেলে তিনি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।[২৪] তাঁর দৃষ্টিতে অন্য কোনো জিনিস এতটা ঘৃণ্য ছিলো না।

রাসূল ﷺ আল্লাহর খাস রহমত ও হেফাজতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তাই যখনি পার্থিব কোনো লালসার প্রতি প্রবৃত্তি আকর্ষিত হতে যাচ্ছিলো, তখনি আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন।

ইবনে আসীরের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল ﷺ বলেন, আইয়্যামে জাহিলিয়াতের লোকজন যে সকল কাজ করেছে দু'বার ছাড়া আর কক্ষনো সে ব্যাপারে আমার খেয়াল জাগেনি; কিন্তু সে দু'বারের বেলায় আল্লাহ তাআলা আমার এবং সে কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরপর আর কক্ষনো সে ব্যাপারে আমার কোনো খেয়াল জাগেনি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা আমাকে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করেছেন।

বুখারী শরীফে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, কা'বা গৃহের নির্মাণকালে রাসূল ﷺ এবং আব্বাস রাযি. পাথর বহন করছিলেন। আব্বাস রাযি. তাঁকে বললেন, 'লুঙ্গি কাঁধে রাখো। তাহলে বহনজনিত যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবে।' তখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলে তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে গেলো এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, 'আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লুঙ্গি বেঁধে দেওয়া হলো। অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, এরপর আর কখনো তাঁর সতর দেখা যায়নি।[২৫]

রাসূল ﷺ এর সকল কাজ ছিলো আকর্ষণীয়। তিনি সর্বোত্তম চরিত্র ও মহানুভবতার অধিকারী এবং সর্বযুগের সকলের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য ছিলেন। তাঁর মাঝে ছিলো শিষ্টাচার, নম্রতা-ভদ্রতা, দয়া, দূরদর্শীতা, সত্যবাদিতা এবং সদালাপ-সদাচারের মতো সর্বপ্রকার মহৎ

---

২৪. ইবনে হিশাম: ১/১২৮
২৫. সহীহ বুখারী: ১/৩

গুণের সমাহার। তাঁকে কখনো মিথ্যা স্পর্শ করতে পারেনি। সত্যবাদিতার জন্য তিনি এতই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, আরববাসীগণ সকলেই তাঁকে 'আল-আমীন' বলে আহ্বান করতেন।

সর্বোপরি তিনি ছিলেন আরববাসীদের মাঝে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। খাদীজা রাযি. সাক্ষ্য দিতেন যে, তিনি অভাবগ্রস্তদের বোঝা বহন করতেন, নিঃস্ব ও অসহায়দের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এবং ন্যায্য দাবিদারদের সহায়তা করতেন। তাছাড়া তিনি অতিথিপরায়ণতার জন্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২৬]

শিক্ষাঃ

একজন যোগ্য নেতা বা দাঈকে অবশ্যই উত্তম গুণাবলীতে গুণবান হতে হবে।

নবুওয়াতী জীবন

রিসালাত ও দাওয়াত

দাওয়াতের সময়কাল এবং স্তরসমূহ আলোচনা ও অনুধাবনের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াতী জীবনকালকে আমরা দু'টি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। কাজকর্মের ধারা প্রক্রিয়া এবং সাফল্য। সাফল্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এর এক অংশ অন্য অংশ থেকে ছিলো ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়। যথাক্রমে অংশ দু'টি হচ্ছে–

০১. মক্কায় অবস্থানকাল প্রায় ১৩ বছর।
০২. মদীনায় অবস্থানকাল ১০ বছর।

তারপর মক্কায় অবস্থানকাল ও কর্মপ্রক্রিয়াকে তিনটি অনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা–

---

২৬. সহীহ বুখারীঃ ১/৩

০১. সর্বসাধারণের অবগতির অন্তরালে গোপন দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের স্তর (৩ বছর)।

০২. মক্কাবাসীদের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের স্তর (নবুওয়াতের চতুর্থ বছর থেকে মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত)।

০৩. মক্কার বাহিরে ইসলামের দাওয়াত ও বিস্তৃতির স্তর।

মদীনায় অবস্থান ও কার্যপ্রক্রিয়ার স্তরসমূহ যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

নবুওয়াতের আলোকধারা

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্নতায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তখন তাঁর দ্বীনের বিচার-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা জনগণ ও তাঁর মাঝে এক ধরনের প্রাচীর তৈরি করে দেয়। ক্রমান্বয়ে তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠে। খাবার ও পানি নিয়ে তিনি মক্কা হতে দু'মাইল দূরে জাবালে নূরের গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

পুরো রমজান মাস তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। মশগুল থাকতেন বিশ্বপরিচালক মহান সত্তার ধ্যানে। স্বগোত্রীয়দের অর্থহীন বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁকে খুবই পীড়া দিতো। কিন্তু তখন তাঁর সামনে এমন কোনো পথ ছিলো না, যে পথে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সন্ধান পাবেন।[২৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হেরা গুহায় গমন মূলত আল্লাহ তাআলা'র ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ। যার জন্য নবুওয়াতের মতো এক মহানেয়ামত নির্ধারিত হয়ে আছে। যিনি মানবজাতিকে গোমরাহী থেকে উদ্ধার করবেন, তাদেরকে পথ নির্দেশনা দেবেন; তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন– তিনি দুনিয়াবী সকল কাজ থেকে মুক্ত থেকে নির্জনে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ

২৭. রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৪৭; ইবনে হিশাম: ১/২৩৫-২৩৬ পৃ.; ফী যিলালিল কুরআন: ২৯/১৬৬

নবুওয়াত প্রাপ্তির তিন বছর পূর্ব থেকেই এক মাসব্যাপী নির্জনতা অবলম্বন করতে থাকলেন।[২৮]

শিক্ষাঃ

০১. মুমিন ব্যক্তি যদি মাঝে মাঝে নির্জনতাকে আপন করে নেয়; তাহলে সে ঈমানের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অর্জন এবং আল্লাহ তাআলা কে পাওয়ার পথ লাভ করতে সক্ষম হয়। কারণ তখন শারীরিক ও দুনিয়ার সব ধরনের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

০২. সমাজ থেকে মিথ্যা ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে তাওহীদের সঠিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক মুমিনেরই যথাসাধ্য চেষ্টা-ফিকির করা উচিত।

০৩. সত্য ও সঠিক বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সদা সচেষ্ট হতে হবে। সবাই অন্যায়-অশ্লীলতায় লিপ্ত হচ্ছে; তা দেখে অপরাধের স্রোতে ভেসে যাওয়া যাবে না।

নবুওয়াত প্রাপ্তি

রাসূল ﷺ এর বয়স যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো; যা হলো পূর্ণতা প্রাপ্তির বয়স এবং বলা হয় যে, এ বয়স হচ্ছে পয়গম্বরগণের নবুওয়াত প্রাপ্তির বয়স, তখন নবুওয়াতের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগলো। তা প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিলো। তিনি যখন কোনো স্বপ্ন দেখতেন, তা সুবহে সাদিকের মতো স্পষ্ট প্রতীয়মান হতো। তারপর আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন, তিনি মুহাম্মাদ ﷺ কে নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় ভূষিত করবেন।[২৯]

২৮. ফী যিলালিল কুরআন: ২৯/১৬৬-১৬৭ পৃ.

২৯. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, বায়হাকীর মতে স্বপ্নের সময় ছিলো ছয় মাস। তাহলে বলা যায়, তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার পর স্বপ্নের মাধ্যমে রবিউল আউয়াল মাসে ওহী অবতরণ শুরু হয়; কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় রমজান মাসে ওহী নাযিল হয়। -ফাতহুল বারী: ১/২৭

রাসূল ﷺ এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াতের পরম মর্যাদায় ভূষিত করেন। দিনটি ছিলো রমজান মাসের ২১ তারিখ সোমবার দিবাগত রাত, ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগস্ট।

ওহী নিয়ে জিবরাঈল আ. এর আগমন

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন, তখন আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল আ. তাঁর নিকট আগমন করেন। এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, اقرأ (পড়ুন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ما أنا بقارئ (আমি পড়তে অভ্যস্ত নই)। তারপর তিনি তাঁকে শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اقرأ (পড়ুন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও বললেন, ما أنا بقارئ (আমি পড়তে অভ্যস্ত নই)। তারপর তৃতীয় দফায় আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اقرأ (পড়ুন)

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

"পড়ুন! আপনার রবের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথে তা পড়লেন। এভাবে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্থিরচিত্তে ঘরে এসে খাদীজা রাযি. কে বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। কিছুক্ষণ পর তিনি শান্ত হলে খাদীজা রাযি. কে হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে জানালেন। তাঁকে তখন ভীত-সন্ত্রস্ত দেখে খাদীজা রাযি. বললেন, আল্লাহ কক্ষনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মেটান। অসহায়দের পাশে দাঁড়ান। মেহমানদের আপ্যায়ন করেন। ঋণগ্রস্তদের দায় মোচন করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপদস্থ করবেন না।

এরপর খাদীজা রাযি. তাঁকে নিয়ে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে

নাওফালের কাছে যান। ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ছিলেন খৃষ্টান ধর্মের একজন বড় ও প্রসিদ্ধ আলেম। রাসূল ﷺ তার কাছে সকল ঘটনা খুলে বলেন। সব শোনার পর ওয়ারাকা বললেন, ইনি তো সে জিবরাঈল; যিনি মূসা আ. এর নিকট আগমন করেছিলেন।[৩০]

তারপর ওয়ারাকা বললেন, 'হায়! যেদিন আপনার স্বজাতি আপনার উপর নানাভাবে অত্যাচার করবে, যেদিন আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে; সেদিন যদি আমি শক্তিশালী থাকতাম! আমি যদি জীবিত থাকতাম!'

রাসূল ﷺ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে ওরা দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?'

ওয়ারাকা বললেন, 'হ্যাঁ, তারা এমন করবে। শুধু আপনাকে নয়, মানব সমাজে যখনই কোনো সত্যের বার্তাবাহকের আবির্ভাব ঘটেছে, তখনই তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁর উপর নানাভাবে জুলুম করেছে। নির্যাতন চালিয়েছে। তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। মনে রাখুন, আমি সে সময় জীবিত থাকলে আপনাকে সবদিক থেকে সাহায্য করবো।' কিন্তু অল্প সময় পরেই ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করেন।[৩১]

শিক্ষা:

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ব্যতীত জীবন কখনো পরিশুদ্ধ হয় না এবং মানুষের অবস্থা ও জীবনের শৃঙ্খলা সঠিক হয় না। সে লক্ষ্যেই তৎকালীন মক্কায় শিরক, সুদ, অত্যাচার-অনাচার, যিনা-ব্যভিচার আর বেহায়াপনার মতো নানা জঘন্য অপরাধ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা 'ইক্বরা' তথা পড়ো– এ পদ্ধতিতেই ঐশী বাণীর সূচনা করেছেন। তাই জাহিলী সমাজের সর্বাঙ্গের পরিশুদ্ধির জন্য ওহীর এ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত চিকিৎসা তুল্য।

----

৩০. ইবনে হিশাম: ১/২৩৭-২৩৮ পৃ.; তারীখে তবারী: ২/২০৭
৩১. সহীহ বুখারী: ১/২ ও ৪৩ পৃ.

রাসূল ﷺ এর উপর দায়িত্ব অর্পণ

রাসূল ﷺ এর উপর দায়িত্ব অর্পণের দু'টি স্তর রয়েছে।

প্রথমত: রাসূল ﷺ এর উপর নবুওয়াতের প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন, قُمْ فَأَنذِرْ "উঠুন, ভীতি প্রদর্শন করুন।" অর্থাৎ মানবমণ্ডলী যদি আল্লাহ তাআলা ভিন্ন বাতিল উপাস্যের ইবাদাত করা, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে শিরক করা, আল্লাহর হক্ব ও কর্মসমূহের সাথে অংশীদার স্থাপন করা থেকে বিরত না হয় এবং অজ্ঞতা, পাপাচার, পথভ্রষ্টতা পরিহার না করে; তবে তাদেরকে আল্লাহর কঠিন আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করুন।

দ্বিতীয়ত: রাসূল ﷺ এর উপর আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়সমূহের সাথে তাঁর সত্তার সমন্বয় সাধন করা এবং তার উপর স্বয়ং অটল থাকা। ঐসব বিষয়কে কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই সযত্নে সংরক্ষণ করা। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য এক উত্তম আদর্শ বনে যাওয়া। যথা, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ "আপনার রবের বড়ত্ব ঘোষণা করুন।" অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "আপনার কাপড় পবিত্র করুন।" বাহ্যিক অর্থে কাপড়ের মাধ্যমে শরীরের পবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, মহান আল্লাহর সামনে অপবিত্রতা নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নয়। এখানে পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাবতীয় শিরক ও মন্দ কর্ম থেকে দূরে থাকা এবং উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ "এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন।" অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন, وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ "আর অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অনুগ্রহ করবেন না" অর্থাৎ কোনো ভালো কাজের প্রতিদান মানুষের নিকট কামনা করা যাবে না এবং ভালো কাজের বিনিময়ে দুনিয়াতে এর চেয়েও বেশি তাঁর নিকট আশা করা যাবে না।

পরবর্তী আয়াতসমূহে মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, তাদেরকে তাঁর শাস্তি ও পাকড়াও সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা এবং দ্বীনের কারণে মানুষের পক্ষ থেকে যে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে, তাদের দ্বারা অত্যাচারিত-নির্যাতিত হতে হবে; ঐসব বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ

তাআলা ইরশাদ করেন, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "আর আপনি আপনার প্রভুর জন্য ধৈর্যধারণ করুন।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ তাআলা এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন যে, নবুওয়াতের মহামর্যাদাপূর্ণ কাজের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হতে হবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঘুমের আচ্ছাদন ও বিছানার উষ্ণতা পরিত্যাগ করে আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ﴾

"হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি উঠুন, সতর্ক করুন।"

বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি নিজের জন্যই বাঁচতে চায়; সে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে চলতে পারে। কিন্তু আপনাকে এক বিরাট ও মহান দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে। তাই ঘুমের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। আরাম-আয়েশের সাথে আপনার কী সম্পর্ক? আপনার গরম বিছানার কী প্রয়োজন? কী প্রয়োজন আপনার সুখময় জীবনযাপনের? আপনি উঠে পড়ুন এবং ঐ মহান কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আপনার ঘুম এবং আরাম আয়েশের সময় এখন অতিক্রান্ত। এখন আপনাকে অবিরাম পরিশ্রম করে যেতে হবে এবং দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আল্লাহর পথে আহ্বান এবং তাওহীদের প্রতি দাওয়াতের কাজ হচ্ছে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের কাজ; কিন্তু এ পথে চলার ব্যাপারটি হচ্ছে অত্যন্ত ভীতিজনক, পদে পদে বিপদ। এ মহান কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে শান্তির নীড় ঘর-বাড়ি, সুখময় পারিবারিক পরিবেশ, আরাম-আয়েশ, স্নিগ্ধ শয্যা থেকে টেনে এনে একের পর এক মহাপরীক্ষা আর কষ্ট-মুসীবতের অথৈ সাগরে নিক্ষেপ করে দিলো। দাঁড় করিয়ে দিলো মানুষের বাহ্যিক পোষাকি আচরণ এবং শঠতাপূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিগত দ্বিধাদ্বন্দ্বের দারুণ টানাপড়েনের মধ্যে।

তারপর রাসূল ﷺ নিজের অবস্থা এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে গেলেন এবং বিশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ বেশির ভাগ সময় জাগ্রত অবস্থার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করলেন। এ দীর্ঘকাল যাবৎ সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ বলতে তাঁর আর কিছুই রইলো না। তাঁর জীবনে রইলো আল্লাহর কাজের জন্য দায়বদ্ধতা। কাজ ছিলো আল্লাহর প্রতি বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানানো। বিশ্বের বুক থেকে সকল প্রকারের অসত্য, অন্যায় ও মিথ্যার মূলোৎপাটন এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে পথপ্রদর্শন।

আল্লাহর পথে আহ্বান, সত্যের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কথাগুলো আপাতদৃষ্টিতে ততটা কঠিন কিংবা দুঃসাধ্য মনে নাও হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে কঠিন এবং কষ্টসাধ্য কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই হতে পারে না। রিসালাতের আমানত হচ্ছে বিশ্বের বুকে সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ এবং দুর্বহ আমানত। এ আমানত হচ্ছে একদিকে বিশ্বময় মানবের চরম উৎকর্ষ ও বিকাশের আমানত এবং অপরদিকে যাবতীয় বাতিল ও গায়রুল্লাহ্‌র প্রভাব প্রতিহত করে তাকে ধ্বংস করার আমানত। কাজেই তাঁর কাঁধে যে বোঝা অর্পণ করা হয়েছিলো; তা ছিলো সমগ্র মানবতার বোঝা। ময়দানে জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত কুফরী মতবাদকে প্রতিহত করার বোঝা। বিশ বছরেরও অধিক সময় যাবৎ অবিরামভাবে তিনি ব্যাপক ও বহুমুখী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। সেই দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থাৎ, যখন তিনি আসমানী আহ্বান শ্রবণের মাধ্যমে অত্যন্ত কঠিন ও কণ্টকময় দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন, তখন থেকেই তাঁকে কোনো এক অবস্থা অন্য কোনো অবস্থা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও গাফেল কিংবা উদাসীন করে রাখতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আমাদের এবং সমগ্র মানবতার পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন।[৩২]

শিক্ষা:

০১. দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সে সম্পর্কে অন্যদেরকে জানাতে হবে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, 'আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি দ্বীন শেখা ও শেখানো এবং আল্লাহ তাআলা'র

৩২. ফী যিলালিল কুরআন, সূরা মুযযাম্মিল ও মুদ্দাসির, পারাঃ ২৯, পৃষ্ঠা নংঃ ১৬৮-১৭১

বার্তা প্রচার করা, এ ধাপগুলো পার করছেন।'

০২. হক্ব-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। তাই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর পতাকাকে বুলন্দ করার তরে আল্লাহর পথে মাতৃভূমি, পরিবার, ধন-সম্পদ এমনকি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়।

৩. ওহীর বাহক ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াদের জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাস কখনো কাম্য নয়; বরং তা পরিহার করে আল্লাহর তাওহীদের বাণী প্রচার এবং তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাওহীদের পতাকাবাহী উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরীগণকে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সদা সর্বদাই তৎপর থাকতে হবে।

দাওয়াতের প্রথম পর্যায়

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার

দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ কে ইসলাম প্রচারের জন্য আদেশ করা হয়; কিন্তু তখন বিশ্বজুড়ে ছিলো ধর্মহীনতা ও পথভ্রষ্টতার জয়জয়কার। বিশেষ করে, আরবদের মিথ্যা অহংকার ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ তাদেরকে সত্যের দিকে কর্ণপাত করার জন্য বিন্দুমাত্রও উদ্বুদ্ধ করেনি। তাই শুরুতে আল্লাহর প্রজ্ঞার চাহিদা ছিলো রাসূল ﷺ কে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ না দেওয়া; যেন সাধারণ মানুষ শুরু হতেই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ না হয়ে পড়ে। রাসূল ﷺ প্রথমে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। স্বীয় দূরদর্শিতা অনুযায়ী তিনি যাদের মাঝে পুণ্য ও কল্যাণের নিদর্শন দেখতে পেতেন; তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন।

শিক্ষা:

> কোনো অঞ্চলে দ্বীনের সঠিক মানহাজ প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রথম পরিচিত লোকদের মাঝে ঐসব ব্যক্তিকে বাছাই করে বের করতে হবে; যারা সহজে সত্যকে মেনে নেবে এবং এর প্রচার-প্রসারের জন্য উদ্যমী হবে।

ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তীগণ

রাসূল ﷺ এর দাওয়াতে খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা, আলী ইবনে আবু তালিব, যায়েদ ইবনে হারিসাহ, বিলাল ইবনে রবাহ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, রাসূল ﷺ এর কন্যাগণ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ইসলাম কবুল করেন।

তবে তাঁদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন?- এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, খাদীজা। কেউ বলেন, আবু বকর আবার কেউ বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব। আর প্রত্যেক মতের পক্ষেই একাধিক আলেম

রয়েছেন। সকল মতামতকে একত্র করলে যে সারমর্ম দাঁড়ায়, সে সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, সবচেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা হলো– এ কথা বলা যে, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন আবু বকর রাযি., বালকদের মধ্যে আলী রাযি., মহিলাদের মধ্যে খাদীজা রাযি., অধীনস্থদের মধ্যে যায়েদ রাযি. ও গোলামদের মধ্যে বিলাল রাযি.।[৩৩]

সালাত আদায়

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মিরাজের পূর্বে অবশ্যই সালাত পড়তেন। তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয হওয়ার পূর্বে তা ফরয ছিলো কিনা– এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, সূর্যের উদয়-অস্ত এ দুই সময়ে নামাজ ফরয ছিলো।

এভাবে তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইসলামের দাওয়াত কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। রাসূল ﷺ তা সাধারণভাবে লোকসমাজে প্রকাশ করতেন না; কিন্তু কুরাইশরা ইসলামের খবরাখবর জানতো। মক্কাতে তখন ইসলামের কথা ছড়িয়ে পড়ে। লোকসমাজে এ নিয়ে গুঞ্জন চলতো। আবার কেউ কেউ এর প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করতো। মুমিনদের সাথে শত্রুতাভাব দেখাতো। তবে সামনাসামনি কিছু বলতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল ﷺ তাদের ভিত্তিহীন ও মনগড়া উপাসনা নিয়ে কোনো সমালোচনা করতেন।

শিক্ষা:

০১. সুস্থ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সঠিক বিবেচনা বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সহজেই হক্বের দাওয়াতে সাড়া প্রদান করেন। পক্ষান্তরে নির্বোধ ও বক্র মস্তিষ্কধারী লোক ও হীন চরিত্রের অধিকারীরা তা প্রত্যাখ্যান করে।

০২. স্বল্প সংখ্যক ও দুর্বল প্রকৃতির লোকদের মাধ্যমে দাওয়াতের সূচনা হয়ে ধীরে ধীরে তা বৃহদাকার ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা শত্রুপক্ষের উপর তাদেরকে বিজয়ী করে যমীনের ক্ষমতা দান করেন।

---

৩৩. ইবনে সালাহ ও ইমাম নাববী রহ. একই মত ব্যক্ত করেন। দেখুন, ইরাকীকৃত মুক্বাদামায়ে ইবনে সালাহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ: ২৬৬-২৬৮ পৃ.; তাকরীবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাদরীবুর রাবী: ২০৮-২০৯ পৃ.

০৩. যারা এ দ্বীনকে কবুল করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে; তাদের জন্য কল্যাণ অবধারিত। আর এ দ্বীন সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই প্রযোজ্য।

দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়:

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচারের পর কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ কে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিলেন–

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾

"আর আপনি সতর্ক করুন আপনার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।"[৩৪]

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾

"আপনাকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তা আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করুন এবং মুশরিকদের বিরূপ আচরণ উপেক্ষা করে চলুন।"[৩৫]

আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ইসলাম প্রচার

প্রথম সম্মেলন: উল্লিখিত প্রথম আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ বনু হাশিম গোত্রকে একত্রিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। বনু মুত্তালিবের প্রায় ৪৫ জন লোক এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল ﷺ যখন তাঁর আলোচনা শুরু করবেন এমন সময় হঠাৎ আবু লাহাব বলে উঠলো, দেখো! এরা সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে। তোমার জন্য সকল আরববাসীর সাথে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি স্বীয় কথায় অটল থাকলে তোমার বিরুদ্ধে কুরাইশ গোত্র অস্ত্রধারণ করবে। তারপর আমার জানার দরকার নেই যে, নিজ পিতৃপরিবারের মধ্যে আর অন্য কেউ তোমার চেয়ে বেশি সর্বনাশা

৩৪. সূরা শুআরা: ২১৪
৩৫. সূরা হিজর: ৯৪

আছে কিনা? আবু লাহাবের এ ধরনের অর্থহীন আস্ফালন দিয়েই সম্মেলন শেষ হলো।

শিক্ষা:

০১. নিজের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের কাছে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

০২. নির্বোধ ও অহংকারী ব্যক্তিরা সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে না। ফলে ইসলাম ও কুফর– এ দুই শ্রেণীতেই সমস্ত মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরস্পর বিপরীত এ দুই বিভাজনের ফলে দু'পক্ষের মাঝে শুরু হয় চিরন্তন শত্রুতা ও কঠোর মনোভাবের; যদিও তাদের পরস্পরের মাঝে রক্তের সম্পর্ক থাকে।

০৩. সত্য প্রকাশকারীকে সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর দাম্ভিক মূর্খদের বিরুদ্ধাচরণের মুখোমুখী হতে হয়।

দ্বিতীয় সম্মেলন: কয়েক দিন পর রাসূল ﷺ স্বগোত্রীয় লোকদের একত্রিত করে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন।

তিনি বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তাঁর উপর ভরসা করছি। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। অতঃপর তিনি বলেন, "কল্যাণকামী পথপ্রদর্শক কখনোই স্বীয় আত্মীয়-স্বজনদের সামনে মিথ্যা বলতে পারে না। সে আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহর কসম, তোমরা সকলে ঠিক সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে; যেভাবে তোমরা (প্রতিদিন) ঘুমাও। এবং তোমরা সেভাবে পুনরুত্থিত হবে, যেভাবে তোমরা (পুনরায়)

ঘুম থেকে উঠো। সেদিন তোমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে। ফলে ভালো-খারাপ কর্মের ভিত্তিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।"

এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন, (জানতে চাইবে না) আমরা তোমার কতটুকু সাহায্য করতে পারবো? তোমার উপদেশ, তোমার সত্য কথা আমরা কতটুকু মানবো? এখানে আগত সকলের মতো আমিও তোমার পরিবারের একজন সদস্য। ব্যবধান শুধু এই যে, আমি অন্য লোকদের তুলনায় সাহায্য করার দিক থেকে অগ্রগামী। তাই তোমার নিকট যে নির্দেশ এসেছে; সে অনুযায়ী কাজ করো। আল্লাহ ভরসা, আমি অবিরাম তোমার সাহায্য করে যাবো। তবে আমি আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।

আবু লাহাব বললেন, আল্লাহর কসম! এসব অন্যায় কথা। এর হাত অন্য লোকদের আগে তোমরাই ধরে নাও।

আবু তালিব আবু লাহাবের মুখ থেকে এমন কথা শোনামাত্রই বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তাঁর হেফাজত করে যাবো।[৩৬]

শিক্ষা:

০১. আল্লাহর উপর ভরসা করে দাওয়াতী মিশন নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলে আল্লাহ তাআলাই সাহায্যকারী নির্বাচন করে দেবেন।

০২. সত্যের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে, দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছু লোককে এমন পাওয়া যায়; যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আবার কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে; যারা সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সাফা পর্বতের উপর

রাসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে মক্কার সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশদের গোত্রসমূহের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। যখন তারা আহ্বান

৩৬. ইবনুল আসীরকৃত ফিকহুস সীরাহ: ৭৭ ও ৮৮ পৃ.

শুনতে পেলো, সকলে সেখানে উপস্থিত হলো। আর যারা উপস্থিত হতে পারেনি, তারা নিজের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠালো। রাসূল ﷺ তখন বললেন, আমি যদি বলি– পর্বতের অপরদিকে এক শক্তিধর সেনাবাহিনী তোমাদের উপর হামলা করার জন্য ওঁত পেতে আছে; তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলে উত্তরে বললো, হ্যাঁ। অবিশ্বাস করার কী আছে? আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যার সংস্পর্শে আসতে দেখিনি।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, তবে শোনো! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে দ্রোহীতা ও পাপ কাজে ডুবে থাকার দরুন ভীষণ আযাব থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি। আর আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেমন কেউ একজন শত্রুকে দেখলো; ফলে সে তার পরিবারকে এ ব্যাপারে সতর্ক করলো।

যখন এ ভীতি প্রদর্শনমূলক বক্তব্য শেষ হলো, সবাই যার যার মতো চলে গেলো। কেউ কোনো প্রতিবাদ করলো না; কিন্তু আবু লাহাব তার মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। সে রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বললো, সর্বনাশ হোক তোমার! এজন্যই কি এখানে আমাদের একত্রিত করেছো?[৩৭] আবু লাহাবের এরূপ আচরণের প্রেক্ষাপটে তারই ধ্বংসের কথা কুরআনে অবতীর্ণ হলো–

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত। ধ্বংস হোক সে নিজে।"[৩৮]

শিক্ষা:

যারা দ্বীন ও দ্বীনের দাঈদের ধ্বংস কামনা করে; মূলত তারা নিজেরাই ধ্বংসে নিমজ্জিত।

---

৩৭. সহীহ বুখারী: ২/৭০২ ও ৭৪৩ পৃ.; সহীহ মুসলিম: ১/১১৪

৩৮. সূরা লাহাব: ০১

দাওয়াত বন্ধের প্রথম পদক্ষেপ

হাজ্ব যাত্রীগণকে বাধা দেওয়ার সভা

রাসূল ﷺ প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করার কয়েক মাস পরই হাজ্বের মৌসুম এলো। আর হাজ্বের সময় দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল মক্কায় আগমন করতো। এ সুযোগে রাসূল ﷺ তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করবেন। তাই কাফেররা ঠিক করলো, তাঁর বিরুদ্ধে এমন কোনো অপপ্রচার চালাতে হবে; যেন তাঁর কথায় আগত লোকজন কোনোভাবেই প্রভাবিত না হতে পারে।

এ উদ্দেশ্যে তারা আলাপ-আলোচনা করতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ'র ঘরে সমবেত হলো। ওয়ালীদ বললো, এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত ঠিক করো; যেন একজনের কথা অন্যজনের বিপরীত না হয়। অন্যরা বললো, আপনি একটি মোক্ষম কথা ঠিক করে দিন। সে বললো, না। তোমরা বলো আমি শুনি। ওয়ালীদের কথার পরই কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, কাহিন (গণক)। ওয়ালীদ বললো, না; তা হবে না। আমরা অনেক কাহিন দেখেছি। তিনি কাহিনের মতো গুনগুন করেন না।

অন্যরা: তবে পাগল বলবো।

ওয়ালীদ: না, তিনি পাগল নন। আমরা পাগলের কাজকর্ম ও প্রলাপ সম্পর্কে জানি। তিনি এমন নন।

অন্যরা: তাহলে কবি বলি?

ওয়ালীদ: না। কাব্যরীতি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। তাকে কবি বলা যায় না।

অন্যরা: তাহলে যাদুকর বললে কেমন হয়?

ওয়ালীদ: এ ব্যক্তিকে যাদুকর বলা যায় না। কারণ যাদুকরের ঝাঁড়-ফুঁক, গিরা দেওয়া, সত্য-মিথ্যা বলা সম্পর্কে আমরা জানি। তিনি এই সবের কিছুই করেন না।

তখন উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আমরা কী বলবো?

ওয়ালীদ বললো, আল্লাহর শপথ! তাঁর কথাবার্তা বড়ই মিষ্টি মধুর। ভিত বড়ই শক্ত। শাখা-প্রশাখা বড়ই মনোমুগ্ধকর। তাঁর সাথে মানুষ কিছুক্ষণ থাকলে আমাদের কথা মিথ্যা মনে করবে। তারপর ওয়ালীদ কিছুক্ষণ ভেবে বললো, তাঁকে তোমরা যাদুকর বলবে। কেননা তিনি যা বলেন; তা যাদু বলেই মনে হয়। তিনি পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, ভাই-ভাইয়ে, গোত্র-গোত্রে, আত্মীয়-স্বজনে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত তারা এ কথার উপর একমত হয়ে প্রস্থান করলো।[৩৯]

যাই হোক, তারা যে সিদ্ধান্ত করেছিলো তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাজ্ব কাফেলার পথের পাশে কিংবা বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে জটলা বেঁধে রাসূল ﷺ এর দাওয়াত থেকে হাজ্বীদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। এবং তারা রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে নানান ধরনের কথা বলে তাদেরকে সতর্ক করতে থাকলো।[৪০]

রাসূল ﷺ যখন হাজ্ব শিবিরে, উকায, মাজিন্নাহ, যুল-মাজায বাজারে দাওয়াত দিতে যেতেন, তখন তাঁর পিছু পিছু আবু লাহাব গিয়ে বলতো, এর কথায় কান দিও না। সে মিথ্যুক ও বেদ্বীন হয়ে গেছে।[৪১]

কাফেরদের এ কৌশল হিতে বিপরীত প্রমাণিত হলো; কেননা যখন হাজ্ব যাত্রীরা নিজেদের গৃহে ফিরে যাচ্ছিলো, সে সময় তারা রাসূল ﷺ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলো। এভাবে হাজ্ব যাত্রীদের মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর নবুওয়াত ও ইসলামের মৌলিক কথাবার্তা আরব দেশে বিস্তার লাভ করলো।

শিক্ষা:

কাফের-মুশরিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে যতই অপপ্রচার চালাক না কেন! তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই; কারণ অনেক ক্ষেত্রে তাদের এসব অপপ্রচারের ফলে ইসলামের বাণী দূর-দূরান্তে পৌঁছে যায়। মানুষ যখন

---

৩৯. ইবনে হিশাম: ১/২৭১ ওয়ালীদ সম্পর্কে সূরা মুদ্দাসিরের (১১-২৬) ১৬ টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

৪০. ইবনে হিশাম: ১/২৭১

৪১. সুনানে তিরমিযী: ৩/৪৯২; মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৪১

কাফেরদের অপপ্রচারগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করে, তখন তাদের কাছে সত্য বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে যায়! বর্তমানেও কাফের-মুশরিক ও তাদের দালাল তাগুতেরা সত্যের পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে গেলেও সত্যান্বেষীগণের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

হক্বের বিরুদ্ধাচরণে বাতিলের নানান পন্থা অবলম্বন

কুরাইশরা যখন দেখলো, রাসূল ﷺ কে তাঁর দাওয়াতের কাজ থেকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না; তখন তারা এ দাওয়াতী কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে নানান ধরনের পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করলো। এবং বিভিন্নভাবে তাঁকে কষ্ট দিতে লাগলো।

প্রথম পন্থা: মানসিক কষ্ট প্রদান

ক. উপহাস, ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অকারণ হাসাহাসি: বিভিন্ন রকমের অবমাননাকর উক্তির মাধ্যমে তারা রাসূল ﷺ কে জর্জরিত ও অতিষ্ঠ করতে চাইলো; যেন মুসলিমদেরকে সন্দেহপরায়ণ, বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করে তাঁদের কাজের উদ্যম ও আগ্রহকে নষ্ট করা যায়। তারা কখনো তাঁকে পাগল বলে সম্বোধন করতো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾

"আর তারা বলে, ওহে! যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে; তুমি একজন পাগল।"[৪২]

কখনো কখনো যাদুকর বলে মিথ্যার অপবাদ দিতো।

﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾

৪২. সূরা হিজর: ০৬

“আর তারা এ কারণে আশ্চর্যবোধ করছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফেররা বললো, সে মিথ্যাচারী যাদুকর।”[৪৩]

মুশরিকদের অবস্থা পবিত্র কুরআনে এভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ - وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ- وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ -وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ - وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ - ﴾

“নিশ্চয়ই যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করতো। এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করতো, তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করতো। তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরতো, তখনও হাসাহাসি করে ফিরতো। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখতো, তখন বলতো– নিশ্চয়ই এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি।”[৪৪]

শিক্ষা:

সত্য পথের পথিকদের যুগে যুগে নানাভাবে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয়েছে; তবুও তারা দ্বীনের পথ থেকে সরে যাননি। তিরস্কারকারীদের তিরস্কারের ফলে সত্যের পতাকাবাহীদের কাজের গতি কখনোই মন্থর হয়নি।

---

৪৩. সূরা সদ: ০৪
৪৪. সূরা মুত্বাফফিফীন: ২৯-৩৩

খ. সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি ও মিথ্যা অপপ্রচার চালানো : কুরাইশরা সাধারণ মানুষের সামনে রাসূল ﷺ এর শিক্ষা-দীক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতো। এ সম্পর্কে জনমনে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতো ও মিথ্যা অপপ্রচার চালাতো। এবং তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে আজেবাজে প্রশ্ন করতো– এসব হীন প্রচেষ্টা তারা এত অধিক পরিমাণে করতো; যেন লোকজন তাঁর দাওয়াতের দিকে মনোযোগ স্থির করার সুযোগ না পায়। তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে–

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ "(এতটুকুই নয়) বরং তারা (এ কথাও) বলে যে, এসব অলীক স্বপ্ন।"[৪৫] بَلِ افْتَرَاهُ "বরং সে নিজে এটা মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে"[৪৬] অর্থাৎ সে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়েছে। তারা এ কথাও বলতো যে, إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ "এক মানুষ তাঁকে (রাসূল ﷺ কে) শিখিয়ে দেয়।"[৪৭] তারা আরও বলতো– إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ "এটা মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। সে তা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন জাতির লোক তাঁকে সাহায্য করেছে।"[৪৮]

গ. অতীতকালের ঘটনাবলী ও কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে ধূম্রজাল তৈরি করে জনমনে ধাঁধা সৃষ্টি করা ও সঠিক চিন্তা-উপলব্দি করার সুযোগ না দেওয়া : মুশরিকরা তাদের সাধ্যানুযায়ী কুরআন ও ইসলামের দাওয়াত থেকে সাধারণ মানুষদের ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে। তারা যখন দেখতো, রাসূল ﷺ দাওয়াত দিচ্ছেন বা সালাত আদায় করছেন কিংবা কুরআন তিলাওয়াত করছেন, তারা সেখান থেকে মানুষদের তাড়িয়ে দিতো। হৈচৈ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হট্টগোল পাকিয়ে দিতো। নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। যা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾

---

৪৫. সূরা আম্বিয়া: ০৫
৪৬. সূরা আম্বিয়া: ০৫
৪৭. সূরা নাহল: ১০৩
৪৮. সূরা ফুরকান: ০৫

"কাফেররা বলে, এ কুরআন শুনো না; বরং তা পড়ার সময় হট্টগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পারো।"[৪৯]

এ অবস্থা নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষ অবধি চলে।

ঘ. দাওয়াত রোধে বহির্বিশ্ব থেকে কল্পকাহিনী আমদানি : রাসূল ﷺ এর দাওয়াত রোধ করার লক্ষ্যে নাযর ইবনে হারিস (সে ছিলো কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম শয়তান।) একদিন হীরাহ গেলো এবং সেখান থেকে ইরানের বিখ্যাত বীর রুস্তম ও প্রাচীন গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের কেচ্ছা-কাহিনী শিখে আসলো। যখন রাসূল ﷺ কোথাও গিয়ে মানুষদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে ভয় দেখাতেন এবং কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কাহিনী শোনাতেন। তখন নরাধম নাযর ইবনে হারিস সেখানে গিয়ে তার ঐসব কাহিনী শোনাতো। তারপর বলতো, বলো দেখি– কোনদিক দিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কথা আমার কথা থেকে উত্তম?[৫০]

শিক্ষা:

বর্তমানেও মানুষরূপী শয়তানেরা প্রতিনিয়ত গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা, বিভিন্ন অশ্লীল প্রতিযোগিতা ও নানান ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করে সাধারণ লোকজনকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং এসব অনর্থক-বেহুদা কাজ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। এবং পবিত্র কুরআন-হাদীসের ইলম চর্চায় মশগুল হতে হবে।

দ্বিতীয় পন্থা: শারীরিক কষ্ট প্রদান

নবুওয়াতের চতুর্থ বছর রাসূল ﷺ যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। তখন এক মাস পর্যন্ত কাফের-মুশরিকরা কোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতন করেনি; বরং ইসলামের এ দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্য প্রাথমিক

---

৪৯. সূরা হামীম-সাজদাহ: ২৬
৫০. ইবনে হিশাম: ১/২৯৯-৩০০, ৩৫৮ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ১১৭-১১৮ পৃ.

অস্ত্র হিসেবে তারা মানসিক টর্চারকেই বেছে নেয়। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারলো যে, তাদের এ অপকৌশলের মাধ্যমে তারা তাওহীদের বাণীকে স্তিমিত করে রাখতে পারবে না; তখন তারা পুনরায় আলোচনা চক্রে মিলিত হলো। মুসলিমদেরকে শাস্তি প্রদান ও তাঁদেরকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম থেকে ফেরানোর ব্যাপারে সেখানে তারা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এরপর প্রত্যেক গোত্রপতি তার গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে শাস্তি দিতে শুরু করলো। দাস-দাসীদের উপর চাপিয়ে দিলো অতিরিক্ত কাজের বোঝা।

রাসূল ﷺ এর উপর অকথ্য নির্যাতন

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর তাদের নির্যাতনের ধারা ছিলো এরকম– যখন তিনি নামাজরত থাকতেন, তারা ছাগলের নাড়ি-ভুঁড়ি ও মলমূত্র এনে তাঁর উপর নিক্ষেপ করতো। তাঁর বাড়িতে উনুনের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে রান্না করার সময় হাঁড়ির মধ্যে আবর্জনা ছুড়ে মারতো।[৫১]

উকবা ইবনে আবী মুআইত ছিলো শয়তান প্রকৃতির লোক। একবার রাসূল ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে নামাজে দাঁড়ালেন। আবু জাহেল ও তার সঙ্গী-সহচররা সেখানে উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, কে আছে! অমুকের বাড়ি থেকে উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে মুহাম্মাদ (ﷺ) যখন সিজদায় যায়; তখন তাঁর উপর তা চাপিয়ে দেবে? ঐ সময় নরাধম উকবা ইবনে আবী মুআইত উঠে গেলো। সে ভুঁড়িটি নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগলো। যখন রাসূল ﷺ সিজদায় গেলেন, তখন সে ওই নিকৃষ্ট কাজটি করে বসলো। এদিকে নবী তনয়া ফাতিমা রাযি. এর কাছে এ দুঃসংবাদটি পৌঁছলে তিনি দ্রুত এসে ভুঁড়ি সরিয়ে পিতাকে তার নিচ থকে উঠালেন। অতঃপর রাসূল ﷺ মাথা উঠিয়ে তিনবার বললেন, اَللّٰهُمَّ عليك بقريش "হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশদেরকে পাকড়াও করুন।" এরপর তিনি কয়েকজনের নাম ধরে বদদুআ করেন। বদর যুদ্ধে তারা সকলেই নিহত হয়েছিলো।[৫২]

উরওয়া ইবনে যুবায়ের আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূল ﷺ এর উপর সবচেয়ে কঠিন বিপদ বা অত্যাচার কোনটি

৫১. ইবনে হিশাম: ১/৪১৬
৫২. সহীহ বুখারী: ১/৩৭

ছিলো? আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বললেন, একবার রাসূল ﷺ কা'বা প্রাঙ্গণে নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ উকবা ইবনে আবী মুআইত এসে রাসূল ﷺ এর কাঁধ ধরে তাঁর ঘাড়ে কাপড় পেঁচাতে লাগলো। এভাবে সে পেঁচাতে থাকলো। তখন আবু বকর রাযি. আসলেন। তিনি রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আর তিলাওয়াত করতে লাগলেন–

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ "তোমরা একজন লোককে শুধুমাত্র এ কারণে হত্যা করবে? যে লোকটি বলে, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ।"[৫৩]

একবার আবু জাহেল কুরাইশ প্রধানদের লক্ষ্য করে বললো, মুহাম্মাদ (ﷺ) কি আপনাদের সামনে স্বীয় মুখমণ্ডলকে ধূলোয় ধুসরিত করে? (অর্থাৎ নামাজের মধ্যে সিজদা করে?) তারা বলালো, হ্যাঁ। সে তারপর বললো, লাত ও ওয্যার কসম! যদি এরপর আমি তাকে এ অবস্থায় দেখি; তবে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ঠ করে ফেলবো। তাঁর চেহারা মাটির সঙ্গে আচ্ছা করে ঘষে দেবো।

এরপর একদিন রাসূল ﷺ নামাজ পড়ছিলেন। আবু জাহেল তার সংকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো যে, সে পেছনের দিকে সরে আসছে আর আত্মরক্ষার জন্য হাত নাড়াছাড়া করছে।

উপস্থিত লোকেরা বললো, তোমার কী হয়েছে?

সে বললো, আমার ও তাঁর মাঝে একটি আগুনের গর্ত রয়েছে। ভয়াবহ বিভীষিকাময় ও ভীতিপ্রদ শিকল রয়েছে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সে যদি আমার নিকটবর্তী হতো; তবে ফেরেশতাগণ তার এক একটি অঙ্গ উঠিয়ে নিয়ে যেতেন।[৫৪]

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হাজারে আসওয়াদের পাশে একত্রিত হয়ে লাত, ওয্যা, মানাতের নামে শপথ করলো, যদি আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ) কে দেখি; তবে এক পলকেই তাকে শেষ করে ফেলবো। আমাদেরকে কেউই বিরত রাখতে পারবে না।

---

৫৩. সূরা গাফির: ২৮; সহীহ বুখারী: ৩/১৪০০ (৩৬৪৬ নং হাদীস)
৫৪. সহীহ মুসলিম: ৪/২১৫ (২৭৯৭ নং হাদীস)

ফাতেমা রাযি. ঘটনাটি জানতে পারলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বাবার কাছে আসলেন এবং বললেন, আপনার গোত্রের নেতাগোছের কিছু লোক হাজারে আসওয়াদের পাশে শপথ করেছে, যদি তারা আপনাকে দেখে; তবে আপনাকে মেরে ফেলবে। তাদের প্রত্যেকের সাথেই আপনার রক্তের সম্পর্ক। রাসূল ﷺ বললেন, হে আমার আদরের মেয়ে! আমাকে ওযুর পানি দাও। অতঃপর তিনি ওযু করলেন। এবং মাসজিদে প্রবেশ করে তাদের কাছে গেলেন। আর তারা যখন তাঁকে দেখলো, বললো– এই তো সে। তারপর নিজেদের দৃষ্টি অবনত করে ফেললো। তারা নড়াচড়াও করতে পারলো না। এমনকি নিজেদের দৃষ্টিও উঠাতে পারলো না। তাদের কেউ দাঁড়াতে পর্যন্ত সক্ষম হলো না। রাসূল ﷺ তাদের কাছে আসলেন। এবং একমুষ্টি বালু নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। বললেন, ধূলি মলিন হোক তোমাদের চেহারাগুলো। রাবী বলেন, যাদের গায়েই সেদিন বালু পড়েছিলো, তাদের সকলেই বদরের দিন নিহত হয়েছিলো।[৫৫]

কুরাইশদের নির্যাতন সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা'র (দ্বীনের) জন্য আমি যতটুকু শঙ্কায় ভুগেছি। যতটুকু কষ্ট পেয়েছি; অপর কেউ এরকম পায়নি। আমার উপর দিয়ে ত্রিশটি দিন ও রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের নিচে লুকিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া আমার ও বেলালের আহারের মতো কিছুই ছিলো না।।[৫৬]

শিক্ষা:

> যাঁরা তাওহীদের বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল থাকেন, তাঁদেরকে শত কষ্ট ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। কেননা বাতিল কখনোই সত্যের পথিককে তাঁর আপন অবস্থায় শান্তিতে ছেড়ে দেয় না।

----

৫৫. মুসনাদে আহমাদ: ১/২০৩; মুসতাদরাকে হাকিম: ৩/১৫৭; হাদীসের সনদ সহীহ তবে শায়খাইন তা বর্ণনা করেননি। আর যাহাবীও এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।
৫৬. মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৮৭; সুনানে তিরমিযী: ৪/৬৪৫, হাদীস: ২৪৭২, তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান গরীব।

সাহাবায়ে কেরামগণের উপর নির্যাতন

আবু জাহেল যখন দেখতো, কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে; সে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতো। অপমান-অপদস্থ করতো, ধন-সম্পদের ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখাতো। আর তার আত্মীয় বা নিজ গোত্রের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর উপর চালাতো অমানুষিক নির্যাতন এবং মারধর করার জন্য অন্যকে প্ররোচিত করতো।[৫৭]

সাহাবায়ে কেরামগণের উপর নির্যাতনের কয়েকটি বেদনাদায়ক চিত্র–

০১. উসমান ইবনে আফফানের চাচা তাঁকে খেজুর চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে তার নিচে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়ার মাধ্যমে কষ্ট দিতো। [৫৮]

০২. মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. আরবের ধনীর দুলাল। তাঁর মা যখন শুনলো, তিনি ইসলাম কবুল করেছেন; তখন থেকে তাঁর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলো। প্রথম জীবনে মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. এর আরাম-আয়েশের অন্ত ছিলো না; কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। সাপের শরীর থেকে যেরকম খোলস খুলে পড়ে, সেরকম তাঁর শরীরের চামড়া খুলে খুলে পড়তো।[৫৯]

০৩. যখন উমাইয়া ইবনে খালাফ বিলাল রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারলো, সে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিতে থাকলো। কিন্তু বিলাল রাযি. তার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি; বরং তিনি আল্লাহর জন্য সে অকথ্য নির্যাতন সয়ে গেলেন। আল্লাহর উপরই ভরসা করলেন। তারা বিলাল রাযি. কে মরুভূমিতে বের করে নিয়ে আসতো এবং মক্কার বিভিন্ন দল যখন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যেতো; সে সময় তারা তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দিতো। এ সময় তিনি বারবার মুখে উচ্চারণ করতেন 'আহাদ আহাদ'।[৬০]

০৪. আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. বনু মাখযূমের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ইয়াসির রাযি. এবং মাতার নাম সুমাইয়া রাযি.। তাঁরা সকলে

---

৫৭. ইবনে হিশাম: ১/৩২০

৫৮. রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৭৫

৫৯. রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৫৮ ও তালকীহুল ফুহূম আহলিল আসার

৬০. রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৫৭; ইবনে হিশাম: ১/৩১৭-৩১৮ পৃ.

একই সাথে ইসলাম কবুল করেন। তারপর তাঁদের উপর চলতে থাকে কাফের-মুশরিকদের নির্মম নির্যাতন। দুপুর বেলার প্রখর রোদে যখন বালুকণা-কংকর আগুনের মতো উত্তপ্ত হয়ে যেতো; নরাধম আবু জাহেল ও তার সঙ্গীরা ইয়াসির পরিবারকে সে উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে রাখতো। একদিন রাসূল ﷺ তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দ্বীনের জন্য তাঁদের এমন অবস্থা দেখে তিনি বললেন, صبرا يا ال ياسر "হে ইয়াসিরের পরিবারের লোকেরা! তোমরা ধৈর্যধারণ করো।" জালিম আবু জাহেল আম্মারের মা সুমাইয়া রাযি. এর উপর এমন বর্বর পাশবিক নির্যাতন চালাতো যে, এক সময় সে তাঁর লজ্জাস্থানে বর্শা বিদ্ধ করলো; ফলে সুমাইয়া রাযি. সেখানেই শহীদ হয়ে যান। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রথম শহীদ।[৬১]

০৫. খাব্বাব ইবনে আরাত রাযি. খুযাআহ গোত্রের উম্মে আনমার নামক এক মহিলার দাস ছিলেন। খাব্বাব রাযি. কে সে মহিলা আগুন দিয়ে নির্মম অত্যাচার করতো। উত্তপ্ত লোহা দিয়ে তাঁর পিঠ ও মাথায় সেক লাগাতো। বলা হতো, তিনি যেন মুহাম্মাদ ﷺ এর দ্বীনকে অস্বীকার করেন; তবেই তাঁর উপর থেকে নির্যাতনের অবসান হবে। কখনো ঐ হিংস্র পশুগুলো তাঁর চুল ধরে শক্ত হাতে টানাটানি করতো, আবার কখনো তাঁর ঘাড় মচকে দিতো। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে রেখে তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দিতো; যেন তিনি উঠতে না পারেন। এতে করে তাঁর পিঠের চর্বি গলে গলে সে আগুন নিভতো।[৬২]

মোট কথা, যখন কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন, মুশরিকরা তাঁর উপর হিংস্র হায়েনার মতো চড়াও হয়ে যেতো। দরিদ্র মুসলিমদেরকে শাস্তি দেওয়া ছিলো খুবই সামান্য ব্যাপার। দাস-দাসীদেরকে তাদের মনিবরাই শাস্তি দিতো, তাদের ব্যাপারে কোনো কিছুরই পরোয়া করা হতো না। অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যেতো; কারণ তাদের উপর আপতিত এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেউই কথা বলতে পারতো না। তবে কোনো সম্ভ্রান্ত বা প্রভাবশালী ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলে শাস্তি দেওয়া ছিলো কঠিন ব্যাপার। এসব ব্যক্তির

৬১. ইবনে হিশাম: ১/৩১৯-৩২০ পৃ.
৬২. তালকীহুল ফুহুম: ৬০ পৃ.; রহমাতুল্লিল আলামীন: ৬০ পৃ.

উপর চড়াও হওয়ার সুযোগ তারা কমই পেতো। যদিও তারা নিজেদের জন্য এদেরকেই বেশি ক্ষতিকর মনে করতো ।

শিক্ষা:

০১. ইসলামের শাশ্বত বিধানকে অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরার কারণে নির্মম অত্যাচার সইতে হয়। এমন করুণ মুহূর্তে ধৈর্যধারণের পরই উন্মোচিত হয় বিজয়ের দ্বার; তাই অত্যাচার-নির্যাতনের চাপে হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়।

উপরের এ বর্ণনাসমূহ দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কেরামগণের নির্যাতিত হওয়ার মাত্র কিছু সংক্ষিপ্ত চিত্র। এমন ভয়াবহ সংকটময় অবস্থায় রাসূল ﷺ দু'টি হিকমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

০২. আরকাম ইবনে আবিল আরকাম রাযি. এর বাড়িকে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ।

০৩. মুসলিমদের হাবশায় হিজরত করার আদেশ প্রদান।

আরকাম রাযি. এর বাড়িতে

আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িটি ছিলো সাফা পর্বতের উপর। এ স্থানটি ছিলো অত্যাচারীদের দৃষ্টির আড়ালে। রাসূল ﷺ মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষা ও দাওয়াতী কাজ চালানোর জন্য এ বাড়িকে নির্দিষ্ট করেন। যেন এখানে থেকে মুসলিমগণ নিরাপদে তাদের ইবাদত করতে পারেন। অত্যাচারী মুশরিকদের অজান্তে যারা ইসলাম কবুল করতে চান; তারা যাতে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন।

তবে রাসূল ﷺ তাঁর ইবাদত এবং প্রচারমূলক কাজ-কর্ম মুশরিকদের সামনাসামনি প্রকাশ্যে করতে থাকেন। তাঁকে কিছুতেই তারা বাধা দেওয়ার সাহস পেতো না। তবুও মুসলিমদের কল্যাণের কথা চিন্তা-ভাবনা করে তিনি গোপনভাবেই তাঁদের সাথে একত্রিত হতেন।

শিক্ষাঃ

যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, যত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীনই হতে হোক না কেন, দ্বীনের কাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না। যেখানে বা যেভাবেই হোক তা চালিয়ে যেতে হবে।

আবু তালিবের নিকটে কুরাইশ প্রতিনিধি দল

ইবনে ইসহাক বলেন, কুরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আবু তালিবের নিকট এসে অভিযোগের সুরে বললো, আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করছে। আমাদেরকে জ্ঞানহীন নির্বোধ বলছে। পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। তাই হয় আপনি তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখুন বা আমাদের ও তাঁর মাঝখান থেকে সরে দাঁড়ান। কারণ আপনি তাঁর থেকে ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। আবু তালিব তাদেরকে শান্তভাবে বিভিন্ন কথা বলে বুঝিয়ে বিদায় করলেন।[৬৩]

শিক্ষাঃ

০১. তাওহীদের ধর্ম ইসলাম সকল প্রকার জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতার পারিপার্শ্বিকতা থেকে মুক্ত।

০২. পূর্বপুরুষদের অন্ধপ্রীতি সত্য গ্রহণে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আবু তালিবকে কুরাইশদের হুমকি

রাসূল ﷺ এর কাজ পূর্ণমাত্রায় চলছিলো। এদিকে কুরাইশরা একবার আবু তালিবের কাছে ধরনা দিয়ে গেলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিলো না। তাই এবার তারা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার কাছে এলো। বললো, আবু তালিব! আপনি আমাদের মাঝে একজন সম্মানিত লোক। আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম, আপনার ভাতিজাকে তাঁর এ কাজ থেকে দূরে সরান; কিন্তু আপনি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। আমাদের পূর্বপুরুষ বা

---

৬৩. ইবনে হিশামঃ ১/২৬৫

দেব-দেবীকে গালি দেবে, আমরা তা কখনো সহ্য করবো না। তাঁকে আপনি নিবৃত্ত রাখুন; তা না হলে আমাদের মাঝে দু'দলের এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে।

কুরাইশদের এমন কঠোর কথায় আবু তালিব বিচলিত হলেন। তিনি রাসূল ﷺ কে ডেকে পাঠালেন। আবু তালিব তাঁকে কুরাইশদের সাথে আলোচনার আদ্যপ্রান্ত বর্ণনা করে বললেন, বাবা! আমার উপর এমন বোঝা চাপিও না; যার ভার বহনে আমি সমর্থ নই।

রাসূল ﷺ এর চাচার সাহায্যের হাতও বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়লো। তবুও তিনি আল্লাহ তাআলা'র উপর অবিচল আস্থা রেখে বললেন–

يا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري علي ان اترك هذا الامر حتي يظهره الله او اهلك فيه ما تركته

"হে চাচাজান! আল্লাহর শপথ। যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়; তবুও আমি এ কাজকে ছেড়ে দেবো না। যতক্ষণ না আল্লাহ এ দ্বীনকে বিজয় দান করবেন, না হয় আমি নিজে এ কাজে থেকে ধ্বংস হয়ে যাবো; তবুও আমি এ কাজ ছেড়ে দেবো না।"

রাসূল ﷺ এমনই এক মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে চাচার কাছ থেকে বের হয়ে এলেন। কিন্তু চাচা আবু তালিবের নিজের কথার উপর আক্ষেপ হতে লাগলো। তিনি পরক্ষণেই তাঁকে ডেকে বললেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! নিজ কাজ নির্দ্বিধায় চালিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কোনো অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করবো না।[৬৪]

---

৬৪. ইবনে হিশাম: ১/২৬৫-২৬৬ পৃ.

শিক্ষাঃ

০১. তাওহীদের প্রকৃত অনুসারীগণ সত্য দ্বীনের উপর অটল থাকুক, এটা কাফেররা কিছুতেই মেনে নেবে না। এ জন্যই তারা তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধে অবতীর্ণ।

০২. দ্বীনের উপর অটল-অবিচলতা ও দৃঢ় মনোবল সব ধরনের প্রতিকূলতাকে হার মানাতে সক্ষম।

০৩. হয়তো বিজয়, নয়তো শাহাদাত– এমনই হবে তাওহীদবাদীদের দৃপ্ত শপথ।

আবু তালিবের কাছে কুরাইশ প্রতিনিধি দলের পুনরায় গমন

কুরাইশরা যখন দেখলো মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাওয়াত থেকে বিরত থাকা তো দূরের কথা আরও দৃঢ়তার সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা বুঝতে পারলো, আবু তালিব মুহাম্মাদ (ﷺ) কে ত্যাগ করবেন না। প্রয়োজনে তাদের সাথে তিনি হাজার বারও শত্রুতা করতে রাজি আছেন; তবুও তিনি নিজ ভাতিজাকে ছাড়বেন না।

এবার তারা পরামর্শ করে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ'র সন্তান ওমারাহকে সঙ্গে নিয়ে আবু তালিবের নিকট এসে বললো, আবু তালিব! এ হচ্ছে কুরাইশদের মাঝে সবচেয়ে সুদর্শন ও ধার্মিক যুবক। আপনি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিন। বদলে আমাদের হাতে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে অর্পণ করুন। সে আপনার ও আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরোধিতা করছে। আমাদের জাতীয়তা, একতাকে বিনষ্ট করছে। সকলের জ্ঞান-বুদ্ধিকে হেয় জ্ঞান করছে। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

আবু তালিব জবাব দিলেন, তোমরা একেবারে জঘন্য ও অর্থহীন কথা বললে। তোমরা তোমাদের সন্তানকে দিচ্ছো; যাতে আমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করি! আর আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দিই; যেন তোমরা তাকে হত্যা করতে পারো! আল্লাহর শপথ! এমনটি কক্ষনো হতে পারে না। এ

সময় মুতইম ইবনে আদী বললো, আবু তালিব! তোমার সাথে এরা বিচার বিবেচনাসুলভ কথাবার্তা বলছে। তারা চাচ্ছে, তোমাকে বিপজ্জনক অবস্থা থেকে বাঁচাতে। আর তুমি তাদের কথায় কান দিচ্ছো না।

জবাবে আবু তালিব বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা বিবেচনামূলক কোনো কথাই বলোনি; বরং আমার সঙ্গ ত্যাগ করে আমার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছো। বিরুদ্ধবাদীদের সাহায্যার্থে কোমর বেঁধে নেমেছো। ঠিক আছে, তোমাদের যেটা করণীয় তোমরা তাই তো করবে।[৬৫] কুরাইশরা এবারের আলোচনাতেও হতাশ হয়ে ফিরে গেলো। এভাবে কোনো কাজ না হওয়ায়, এবার তারা রাসূল ﷺ এর সাথে সরাসরি শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

শিক্ষা:

০১. হক্বকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফেররা বহু ধরনের অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। তারা একের পর এক নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে।

০২. মুমিন কখনো জাতীয়তাবাদের অন্ধ চেতনায় বিশ্বাসী হয় না। কাফের-মুশরিকরাই জাতীয়তাবাদের অন্ধ পতাকা তলে সমবেত হয়ে লড়াই করে।

হাবশায় মুসলিমদের প্রথম হিজরত

দিনের পর দিন বাড়তেই থাকলো মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন। মুসলিমদেরকে সীমাহীন অত্যাচারের মধ্যে জীবনযাপন করতে হচ্ছিলো। এমন সময় আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন–

﴿ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ - وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ - إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

৬৫. ইবনে হিশাম: ১/২৬৬-২৬৭ পৃ.

"বলুন, হে বান্দাগণ! যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। এ দুনিয়ায় যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। নিশ্চয়ই যারা ধৈর্যধারণকারী তাদেরকে অপরিমিত প্রতিদান দেওয়া হবে।"[৬৬]

রাসূল ﷺ অনেক আগ থেকে হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা জানতেন। জানতেন যে, সেখানে কারো প্রতি অত্যাচার করা হয় না। মুসলিমগণ সেখানে গিয়ে নিরাপদে থাকতে পারবে, শান্তিতে ধর্ম পালন করতে পারবে। এ সকল উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ সাহাবাগণকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন।[৬৭] রাসূলের নির্দেশে মুসলিমদের একটি দল নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সেখানে হিজরত করেন।

শিক্ষা:

আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। যদি কোথাও দ্বীন পালন করতে অসুবিধা হয়ে থাকে; তাহলে অন্যত্র হিজরত করতে হবে। তবুও দ্বীন ছাড়া যাবে না। দ্বীন পালনে নমনীয়তা প্রদর্শন করা যাবে না।

হাবশায় হিজরতকারী মুসলিমদের প্রত্যাবর্তন

সে বছর রমজান মাসের কথা। রাসূল ﷺ হারাম শরীফে আগমন করলেন। কুরাইশদের একটি বিরাট দল তখন সেখানে উপস্থিত ছিলো। রাসূল ﷺ আকস্মিকভাবেই সূরা নাজম তিলাওয়াত শুরু করলেন। তাঁর কণ্ঠে কালামুল্লাহ'র সুললিত তিলাওয়াত শুনে এর অবর্ণনীয় কোমলতা ও অপূর্ব মিষ্টতায় তারা মুগ্ধ হয়ে পড়লো। যারা কুরআন তিলাওয়াতের সময় হট্টগোল করতো, এখন তারাই রাসূলের তিলাওয়াত মনোযোগের সাথে শুনতে লাগলো। রাসূল ﷺ এ সূরার শেষ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছিলেন, তখন কাফেরদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হতে লাগলো। যখন তিনি এ সূরার শেষ আয়াতটি তিলাওয়াত

৬৬. সূরা যুমার: ১০
৬৭. যাদুল মাআদ: ১/২৪

করলেন–

فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوا "সুতরাং, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় পতিত হও। আর তাঁর বন্দেগী করো।[৬৮]

অতঃপর তিনি সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত কাফেররাও সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। তাদের এ অবস্থার কথা অনুপস্থিত কাফের-মুশরিকরা শুনে তাদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে তিরস্কার করতে থাকে। ফলে তারা নিজেদের দ্বারা অনিচ্ছাকৃত যে কাজটি হয়েছিলো, তার মাশুলরূপে রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে নতুন মাত্রায় অপপ্রচার চালাতে শুরু করলো।

অপরদিকে কুরাইশদের এ সিজদার খবর হাবশায় ভিন্নভাবে পৌঁছলো। তাঁরা জানতে পেলো কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এছাড়াও এ খবরকে আরও ভিন্ন আঙ্গিকে প্রচার করা হলো। ফলে মুহাজিরগণের মধ্যে শুরু হলো– মক্কায় ফিরে আসার ব্যাকুলতা। তাদের একটি দল পরবর্তী শাওয়াল মাসেই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন; কিন্তু মক্কা থেকে একদিনের দূরত্বে থাকাবস্থায় তাঁরা জানতে পারলেন আসল ঘটনা। তাই কিছু সংখ্যক মুহাজির আবার হাবশায় ফিরে গেলেন। আর কিছু সংখ্যক সঙ্গোপনে বা কুরাইশের বিভিন্ন ব্যক্তির আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।[৬৯]

এরপর মক্কায় মুসলিমদের উপর বিশেষ করে আগত মুহাজিরদের উপর নতুন মাত্রায় জুলুম-নির্যাতন শুরু হলো। এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনও অত্যাচার থেকে রেহাই পেলো না। কারণ হাবশায় মুসলিমদের নিরাপদে ও সুখে শান্তিতে থাকা, তাঁদের প্রতি নাজ্জাশীর কোমল আচরণ কাফেরদের প্রতিহিংসাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মুসলিমদের এমন অবস্থায় রাসূল ﷺ তাঁদেরকে পুনরায় হাবশায় হিজরত করার পরামর্শ দিলেন।

শিক্ষা:

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া ছাড়া শত্রুদের প্রচারিত খবর শুনেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা উচিত নয়।

---

৬৮. সূরা নাজম : ৬২

৬৯. সহীহ বুখারী: ১/১৪৬; ১/৫৪৩

হাবশায় মুসলিমদের দ্বিতীয় হিজরত

রাসূল ﷺ এর নির্দেশ পেয়ে মুসলিমগণ হিজরতের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হিজরত করা প্রথমবারের তুলনায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিলো। কারণ প্রথমবার কুরাইশরা এ ব্যাপারে এতটা সচেতন ছিলো না। এবার তারা সকলেই মুসলিমদেরকে হিজরত থেকে ঠেকাতে উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু কুরাইশ কাফেরদের শত প্রচেষ্টা ও সচেতনতা সত্ত্বেও মুসলিমগণ হিজরত করতে সক্ষম হলেন। কারণ তাঁদের সাথে ছিলো স্বয়ং আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহর রহমতে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দ্বিতীয়বারে সব মিলিয়ে মোট ৮২ বা ৮৩ জন পুরুষ[৭০] এবং ১৮ কিংবা ১৯ জনের মতো মহিলা হিজরত করেন ।[৭১]

কুরাইশদের নতুন ষড়যন্ত্র

মুসলিমগণ শান্তিতে থাকবে, নিরাপদে তাঁদের দ্বীন পালন করবে, এটা কাফেররা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না; হোক সেটা তাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে দূরদেশ হাবশাতে। সুতরাং তারা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করলো যে, কীভাবে সেখান থেকে তাঁদের ফিরিয়ে আনা যায় এবং তাঁদের উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়? তারা ঠিক করলো হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর নিকট একটি বিচক্ষণ প্রতিনিধি দল পাঠাবে; যারা সেখানে গিয়ে দক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে মুসলিমদের সেখান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনবে। আর এজন্য তারা বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ কূটনৈতিক হিসেবে আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে রবীআহকে নির্বাচন করে। আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে রবীআহ কুরাইশদের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন নিয়ে হাবশায় গমন করে। এবং প্রথম থেকেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে থাকে। তারা সেখানে পৌঁছে নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ না করে প্রথমে তাঁর সভাসদ ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে। এবং মুসলিমদের সেখান থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে বাদশাকে রাজি করাবে বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে।

৭০. সংখ্যায় ভিন্নতার কারণ, আম্মার রাযি. এর হিজরত নিয়ে মতানৈক্য
৭১. যাদুল মাআদ: ১/২৪; রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৬১

পরের দিন সকালে তারা নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করলো এবং তাঁর সামনে কুরাইশদের উপঢৌকন পেশ করে বললো, হে মহামান্য বাদশা! আমাদের দেশের কিছু অর্বাচীন-নির্বোধ যুবক পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আপনার দেশে চলে এসেছে। এবং তারা আপনার দেশে থেকেও আপনার ধর্ম গ্রহণ করেনি; বরং নতুন এক ধর্ম গ্রহণ করেছে। যে ধর্ম সম্পর্কে না আমরা কিছু জানি। আর না আপনাদের সে সম্পর্কে কিছু জানা আছে। আমাদেরকে তাদের পরিবার-পরিজন, তাদের পিতা-মাতা এখানে পাঠিয়েছে; যেন আমরা তাদেরকে নিজ দেশে নিয়ে যাই। কেননা দেশের লোকেরাই জানে, তারা কী রকম নিন্দনীয় কাজ করেছে।

পুরোহিতরা (তাদের কথার সমর্থনে) বললো, মাননীয় বাদশা! তারা সত্য বলেছে। ওদের সম্পর্কে ওদের দেশের লোকজনই বেশি জানে। আপনি তাদেরকে দূতদ্বয়ের হাতে সমর্পণ করুন। এসব কথা শুনে নাজ্জাশী রাগে ফেটে পড়লেন আর বললেন, না। আল্লাহর শপথ! একদল লোক আমার দেশে এসেছে, আমার প্রতিবেশিত্ব বেছে নিয়েছে, অন্যদের উপরে আমার প্রতিবেশিত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাঁদের সাথে কথা না বলে আমি তাঁদেরকে এদের হাতে সোপর্দ করতে পারি না। আমি আগে তাঁদের সাথে কথা বলবো। দেখবো বিষয়টি কী? যদি তাঁরা এমনই হয় যেরকম এরা বলছে; তবে তাঁদেরকে এদের হাতে সোপর্দ করতে দোষ নেই। আর যদি তা না হয়; তবে তাঁদেরকে এদের হাত থেকে রক্ষা করবো এবং উত্তম প্রতিবেশী হিসেবে বরণ করে নেবো।

নাজ্জাশীর সভায় মুসলিমদের আগমন

অতঃপর নাজ্জাশী তাঁর দেশে আশ্রিত মুসলিমদের তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন; যাতে করে তিনি তাঁদের সাথে সরাসরি কথা বলে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। মুহাজিরগণ পরস্পর বলতে লাগলেন, আমরা তার সামনে কী বলবো? পরে তাঁরা ঠিক করলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা তাই বলবো; যা আমাদেরকে রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন, আর যেসব বিষয়ে তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। তাঁরা কথা বলার জন্য জাফর ইবনে আবী তালিব রাযি. কে মনোনীত করলেন।

তাঁরা নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কোন ধর্ম? যার কারণে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছো! এবং নিজ সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে আমার দেশে চলে এসেছো; অথচ আমার ধর্ম গ্রহণ করোনি এবং অন্য কোনো জাতির ধর্মও গ্রহণ করোনি!

জাফর রাযি. এর ঐতিহাসিক ভাষণ

প্রত্যুত্তরে জাফর রাযি. বললেন, হে সম্রাট! আমরা ছিলাম জাহেল জাতি। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জন্তু খেতাম, অশ্লীল-অপকর্ম করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতাম, আমাদের সবলরা দুর্বলদের ধন-সম্পদ গ্রাস করতো, আমরা হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কা করতাম না।

এমনিভাবেই চলতে থাকলো এবং এক সময় আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্য থেকেই একজনকে আমাদের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠালেন; যার উচ্চবংশ, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিষ্কলুষতা সম্পর্কে আমরা খুব ভালো করেই জানি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন। এবং আমাদেরকে বললেন, আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যে পাথরপূজা, মূর্তিপূজা করতাম, সেগুলোকে যেন ছেড়ে দিই। তিনি আমাদেরকে আদেশ করলেন– সত্য বলতে, আমানত আদায় করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করতে, অবৈধ-অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে ও রক্তপাত না ঘটাতে। এবং আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, সতী নারীকে অপবাদ দেওয়া থেকে নিষেধ করলেন। আমাদেরকে আদেশ করলেন– আমরা যেন নামাজ পড়ি, যাকাত আদায় করি (এভাবে তিনি তার সামনে ইসলামের প্রতিটি বিষয় তুলে ধরলেন)। ফলে আমরা তাঁকে সত্যায়ন করলাম। তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম, তাঁর আনুগত্য করলাম। তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি অনুগত হলাম। এবং আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করতে থাকলাম, তাঁর সাথে অন্য কোনো জিনিসকে শরীক করা থেকে বিরত রইলাম। যা তিনি আমাদের জন্য হারাম বলেছেন; তা থেকে বিরত থাকলাম। যা তিনি হালাল বলেছেন; তা মেনে নিলাম। তাই আমাদের গোত্রের লোকজন আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করতে

থাকলো। আমাদেরকে শাস্তি দিতে লাগলো। দ্বীনের ব্যাপারে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দিলো। যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে মূর্তিপূজার দিকে নিয়ে যেতে চাইলো; যেন আমরা সে সকল অপবিত্র কাজ করি, যা আমরা পূর্বে করে এসেছি।

যখন তারা আমাদের উপর চড়াও হলো, আমাদের উপর নির্যাতন শুরু করলো, আমাদের দ্বীনের মাঝে ও আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইলো; তখন আমরা আপনার দেশে চলে এলাম, অন্যদের চাইতে আপনাকে নির্বাচন করলাম, আপনার প্রতিবেশী হতে আগ্রহী হলাম। আশা করলাম, অন্তত আপনার কাছে থেকে আমরা নির্যাতিত হবো না।

নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তোমাদের কাছে কি তার কিছু অংশ আছে? জাফর রাযি. বললেন, হ্যাঁ। নাজ্জাশী বললেন, তবে আমাকে তা পড়ে শোনাও। অতঃপর জাফর রাযি. তাকে সূরা মারইয়াম থেকে প্রথম অংশ পড়ে শোনালেন।

জাফর রাযি. এর তিলাওয়াত শুনে নাজ্জাশী এত অধিক পরিমাণে কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। সাথে সাথে তাঁর ধর্মীয় মন্ত্রীবর্গও কাঁদলেন এবং তাদের সামনে থাকা ধর্মীয় গ্রন্থ ভিজিয়ে ফেললেন। তারপর নাজ্জাশী বললেন, এটি এবং ঈসা আ. যা নিয়ে এসেছিলেন; তা একই উৎস থেকে আগত। তোমরা চলে যাও। তোমাদের কাছে আমি তাঁদেরকে সমর্পণ করবো না। আর তাঁরা এখানে কোনো প্রকার নির্যাতিতও হবে না।

শিক্ষা:

স্পষ্ট ও সুন্দর বাচনভঙ্গির মাধ্যমে দ্বীনের প্রকৃত স্বরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

মুসলিমগণ ও নাজ্জাশীর মাঝে শত্রুতা বাঁধানোর চেষ্টা

আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে রবীআহ যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো। তখন আমর বললো, কাল আমি এমন এক বিষয় নিয়ে আসবো; যাতে তারা

মূল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের পায়ের তলের মাটি সরে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে রবীআহ তাকে বললো, না। তা করা উচিত হবে না। শত হলেও তারা তো আমাদের আত্মীয়। আমর বললো, আমি অবশ্যই বাদশাকে জানাবো যে, তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. কে একজন বান্দা মনে করে। পরের দিন তারা আবার বাদশার কাছে আসলো এবং আমর বললো, হে বাদশা! তারা ঈসা আ. সম্পর্কে জঘন্য কথা বলে।

নাজ্জাশী মুসলিমদের মতামত জানতে একজন দূত পাঠালেন। যখন দূত আসলো, মুসলিম মুহাজিরগণ পরস্পরকে বললো, তোমরা তাকে ঈসা আ. সম্পর্কে কী বলবে? পরিশেষে তাঁরা ঠিক করলেন, আমরা তাই বলবো; যা আল্লাহ বলেছেন। এবং তাই বলবো; যা রাসূল ﷺ আমাদের জানিয়েছেন। তাতে যা হবার হোক! যখন তাঁরা নাজ্জাশীর কাছে এলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ঈসা আ. সম্পর্কে কী বলো?

জাফর রাযি. বললেন, আমরা তাই বলি; যা আমাদের নবী ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এবং এমন একটি রূহ; যা তিনি নিষ্পাপ ও কুমারী নারী মারইয়াম আ. এর প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। তারপর নাজ্জাশী নিজের হাতকে মাটিতে মারলেন। আর সেখান থেকে একটি কাঠি নিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি যা বললে ঈসা আ. এর চাইতে বেশি কিছু ছিলেন না। যখন তিনি এসব কথা বলছিলেন, তখন উপস্থিত পুরোহিতরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছিলো।

তাই নাজ্জাশী বললেন, আল্লাহর শপথ! যদিও তোমরা অসন্তুষ্ট হও; তবুও সে যেটা বললো, সেটাই সত্য। তারপর তিনি বললেন, তোমরা আমার দেশে নিরাপদ। তোমাদের সাথে যে অসদাচরণ করবে; তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। তোমাদের কাউকে কষ্ট দেওয়ার বদলে যদিও আমাকে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া হোক; আমার কাছে তা পছন্দনীয় হবে না। এ কথা বলে বাদশা তার সভাসদদের বললেন, তোমরা তাদের (কুরাইশ প্রতিনিধি দলের) হাদিয়াগুলো ফিরিয়ে দাও। এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই আমার। ফলে তারা দু'জন লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেলো।[৭২]

---

৭২. সীরাতুন নাববী ফী দওয়িল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ ১/৩৭৭-৩৮০ পৃ.; ইবনে হিশাম: ১/২৮৯-

শিক্ষাঃ

০১. কাফেররা চায় না যে, মুসলিমগণ কোথাও সুখে থাকুক। যেখানেই তাঁদের একটু শান্তির আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কাফেররা সেখানেই তাঁদেরকে নানাভাবে অতিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টা করে।

০২. আল্লাহ তাআলা যাদের জন্য হিদায়াত লিখে রেখেছেন, তারাই কেবল হিদায়াতপ্রাপ্ত হোন।

অত্যাচারে কাফেরদের কঠোরতা অবলম্বন

যখন মুশরিকদের এসব চতুরতা পর্যবসিত হলো, হীন প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থতায় পরিণত হলো। তখন তারা আরও আক্রোশে ফেটে পড়লো এবং মক্কায় অবস্থানরত অবশিষ্ট মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। এমনকি তারা রাসূল ﷺ এর দিকেও তাদের নোংরা হাত প্রসারিত করলো। তারা এটাও স্থির করলো যে, রাসূল ﷺ এর প্রচারাভিযান বল প্রয়োগ করে বন্ধ করে দিতে হবে; না হলে তাঁকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।

রাসূল ﷺ সালাত আদায় করতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন, অন্যান্য ইবাদতগুলোও মুশরিকদের সামনে প্রকাশ্যে করে যেতেন; তারা তাঁকে কিছুই করতে পারতো না। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾

"অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন; যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" ৭৩

---

২৯৩ পৃ.; হাসান সনদে উম্মে সালামাহ রাযি. থেকে বর্ণিত।

৭৩. সূরা হিজর: ৯৪

শিক্ষা:

মুসলিমদের সাথে কাফেরদের শত্রুতা জিহাদ বা কোনো একটি বিধান নিয়ে নয়। বরং এ হচ্ছে তাওহীদ ও কুফরের দ্বন্দ্ব; কেননা তখনো মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয হয়নি।

বড় বড় সাহাবাগণের ইসলাম গ্রহণ

মক্কাভূমি মুসলিমদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছিলো। সব সময় মক্কার আকাশে অত্যাচারের কালো মেঘ ছেয়ে থাকতো। সে কালো মেঘের মাঝে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমক দেখা গেলো। প্রাণসঞ্চার হলো মাজলুমদের দেহে। খুশির জোয়ারে ভরে উঠলো তাঁদের অঙ্গন। এর কারণ হলো, বড় বড় সাহাবীগণের ইসলাম গ্রহণ।

হামযা রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ

একদিন আবু জাহেল সাফা পর্বতের পাদদেশে রাসূল ﷺ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে রাসূল ﷺ এর সাথে কটু বাক্য ব্যবহার করলো। এমনকি একটি পাথর উঠিয়ে তাঁর মাথা মোবারকে আঘাত করলো। ফলে তাঁর মাথা থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছিলো। তারপর আবু জাহেল কুরাইশদের বৈঠকে গিয়ে মিলিত হলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআনের দাসী এসব দেখছিলো। সে হামযা রাযি. কে শিকার থেকে ফিরে আসতে দেখে তাঁকে এ পুরো ঘটনা জানালো। তা শোনামাত্র হামযা রাযি. ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। সামান্য মুহূর্তও বিলম্ব না করে তিনি আবু জাহেলের সন্ধানে ছুটে চললেন। আজ যেখানেই আবু জাহেলকে পাবেন; তার ভূত ছাড়িয়েই তবে ক্ষান্ত হবেন। অবশেষে হারাম শরীফের প্রাঙ্গণে তার দেখা মিললো। হামযা বললেন, হে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণকারী! তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ কে গালি দিয়েছো! এবং তাঁকে পাথর দিয়ে আঘাত করেছো! অথচ আমি তাঁর দ্বীনেই আছি। এরপর তিনি ধনুক দিয়ে তার মাথার উপর এমনভাবে আঘাত করলেন; ফলে সে আহত হয়ে পড়লো।

এদিকে এ হামলার কারণে আবু জাহেলের বনু মাখযূম ও হামযা রাযি. এর পক্ষে বনু হাশিম একে অপরের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠলো। কিন্তু আবু জাহেল এভাবে সকলকে নিরস্ত করলো যে, আবু উমারাহকে যেতে দাও! আমি আসলেই তার ভাতিজাকে গালি দিয়েছি এবং আঘাত করেছি।[৭৪]

প্রথমদিকে হামযার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিলো আপন ভাতিজার প্রতি আবেগের কারণে; কেননা কাফেররা তাঁকে কষ্ট দিতো, এটা চাচার পক্ষে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ছিলো। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি অত্যাচার কমে আসবে, এ ভেবে ইসলাম কবুল করলেন।[৭৫] পরে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইসলামপ্রীতি জাগিয়ে দিলেন। ফলে তিনি ইসলামের রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিমদের শক্তি ও সম্মান উভয়ই বৃদ্ধি পেলো।

উমর রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে হামযা রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর উমর রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ উমর রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন।

রাসূল ﷺ বলেছিলেন–

اللَّهُمَّ أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام

"হে আল্লাহ! উমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জাহেল ইবনে হিশামের মধ্য হতে যে আপনার নিকট অধিক প্রিয়, তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন।"[৭৬]

---

৭৪. ইবনে হিশাম: ১/২৯১-২৯২ পৃ.; রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৬৮ ; শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব লিখিত মুখতাসারুস সীরাহ: ৬৬ পৃ.
৭৫. শাইখ আব্দুল্লাহ লিখিত মুখতাসারুস সীরাহ: ১০১ পৃ.
৭৬. ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে এবং তাবারানী ইবনে মাসউদ রাযি. ও আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

এক রাতে উমর রাযি. হারামে আগমন করেন। কা'বার পর্দার ভেতরে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকেন। রাসূল ﷺ তখন নামাজে সূরা আল-হাক্কাহ তিলাওয়াত করছিলেন। উমর রাযি. তিলাওয়াত শ্রবণ করে মুগ্ধ ও হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি তখন মনে মনে বললেন, কুরাইশরা যেমন বলে থাকে, ইনি তো একজন কবি। তখন রাসূল ﷺ পাঠ করছিলেন–

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾

"নিশ্চয়ই এটি এক মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের বাণী। তা কোনো কবির কথা নয়। কিন্তু তোমরা অল্পই ঈমান আনো।"[৭৭]

উমর রাযি. তখন মনে মনে বললেন, আরে এ তো আমার মনের কথা। তিনি তা কী করে জানলেন! তখন তার মনের ভেতর ভাবোদয় হলো, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) একজন গণক। এর পরপরই রাসূল ﷺ তিলাওয়াত করলেন–

﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

"এবং এটা কোনো গণকের কথা নয়; কিন্তু তোমরা অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করো। এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।"[৭৮]

রাসূল ﷺ নামাজে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। উমর রাযি.ও এর পুরোটাই শ্রবণ করলেন। এ সম্পর্কে উমর রাযি. বলেন, সে সময়ে ইসলাম আমার অন্তররাজ্যে স্থান করে নেয়।[৭৯] কিন্তু নিজের পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের কারণে তাঁর পক্ষে ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব হয়ে যায়।

---

৭৭. সূরা আল-হাক্কাহ: ৪০-৪১
৭৮. সূরা আল-হাক্কাহ: ৪২-৪৩
৭৯. তারীখে উমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে জাওযী রহ.: ০৬, ০৯-১০ পৃ.; ইবনে হিশাম: ১/৩৪৬ ও ৩৪৮ পৃ.

তার কঠোরতার কারণে তিনি রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের জন্য ছিলেন অত্যন্ত বিপজ্জনক শত্রু। এমনকি একদিন তিনি খোলা তরবারি হাতে মুহাম্মাদ ﷺ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পথে নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভীর সাথে দেখা হলে, সে জিজ্ঞেস করলো, হে উমর! কী উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছো? উমর রাযি. তখন বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ বললো, তাঁকে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে? উমর রাযি. বললেন, মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গেছো! তারপর নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ তাকে বললো, তোমাকে এক আশ্চর্যের কথা বলি– তোমার বোন ও ভগ্নিপতি তোমাদের ধর্ম ছেড়ে বেদ্বীন হয়ে গেছে। এ কথা শুনে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সোজা ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে ছুটলেন।

সেখানে ঘরের ভেতর খাব্বাব রাযি. তাঁদেরকে তা'লীম দিচ্ছিলেন। উমর রাযি. এর আগমনের আওয়াজ শুনে তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু উমর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছামাত্র খাব্বাবের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন। তিনি এসে বললেন, কার মৃদু আওয়াজ শুনলাম? তাঁরা বললেন, আমরা নিচু গলায় কথা বলছিলাম। উমর বললেন, সম্ভবত তোমরা বেদ্বীন হয়ে গেছো? ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, তোমাদের ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে যদি সত্য থাকে, তবে করণীয় কী? এ কথা শোনার পর তিনি ভগ্নিপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। উমরের বোন তাঁকে স্বামীর কাছ থেকে জোর করে আলাদা করে নিলেন। উমর প্রচণ্ড রেগে তাঁকে চড় মারলেন; ফলে তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে যায়। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তিনি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হোন। তাঁর বোন রাগ ও আবেগের সঙ্গে বললেন, উমর যদি তোমার দ্বীন ছাড়া অন্য ধর্মে সত্য থাকে। এ কথা বলে তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। শাহাদাতের এ বাণী শোনামাত্র উমর রাযি. এর মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। নিজ বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে তিনি লজ্জিত হলেন। তারপর বোনকে দরদের সাথে বললেন, তোমাদের নিকট যে কিতাব আছে; তা দাও না, দেখি।

তাঁরা বললেন, অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা যাবে না। তাই তিনি গোসল করে আসলেন। তারপর সহীফাখানা পড়তে থাকলেন। এভাবে তিনি সূরা ত্বহা পাঠ করলেন।

তারপর বললেন, এ তো বড় পবিত্র কথা! খাব্বাব রাযি. তখন গোপন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, উমর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। বিগত বৃহস্পতিবার রাসূল ﷺ তোমার জন্য দুআ করেছেন। তা কবুল হয়েছে। তারপর তিনি রাসূলের অবস্থান জানতে চাইলেন। উমর রাযি. তরবারি কোযবদ্ধ করে সাফা পাহাড়ে এসে দারুল আরকামে উপস্থিত হলেন।

তিনি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। তখন দরজার ফাঁক দিয়ে একজন উমর রাযি. কে দেখলেন। সাথে সাথে তা রাসূল ﷺ কে জানানো হলো। সকলেই তখন সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। হামযা রাযি. বললেন, কী হয়েছে? বিষয়টা জানার পর তিনি বললেন, যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে; তবে আমাদের কাছে সদিচ্ছার অভাব হবে না। আর যদি তাঁর অন্য উদ্দেশ্য থাকে; তবে তাঁর তরবারি দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হবে।

রাসূল ﷺ এর কাছে তখন ওহী নাযিল হচ্ছিলো। ওহী নাযিল শেষে তিনি বৈঠক ঘরে আসলেন। উমরের জামা ও তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন, উমর! যেমনটি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ'র উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো; সেই রূপ লাঞ্ছনা আসার আগে কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না? রাসূল ﷺ তখন তাঁর জন্য দুআ করলেন। তাঁর দুআর পর উমর রাযি. এর অন্তরে স্পন্দনের সৃষ্টি হলো। তিনি সাথে সাথে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম কবুল করে নিলেন। তখন মুসলিমগণ এত জোরে তাকবীর দিলেন যে, তা মাসজিদে হারামে অবস্থানকারীরাও শুনতে পায়।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, ইসলাম কবুলের পর উমর রাযি. তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে আবু জাহেল কে চিহ্নিত করলেন। তার ঘরে তিনি করাঘাত করলেন। সে উমর রাযি. কে আন্তরিকতা সাথে অভ্যর্থনা জানালো। উমর রাযি. তখন তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা তাকে জানিয়ে দিলেন। আবু জাহেল তাঁর জন্য বদদুআ করে দরজা বন্ধ করে দিলো।[৮০] এভাবে তিনি নিজ মামা আসী ইবনে হাশিমের নিকটে গিয়েও তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা বলে এলেন।[৮১] তারপর তিনি এমন একজনকে খুঁজলেন, যে ব্যক্তি কোনো খবর

৮০. ইবনে হিশাম: ১/৩৪৯-৩৫০ পৃ.
৮১. তারীখে ইবনে খাত্তাব: ০৮ পৃ.

জোরেশোরে প্রচার করতে পারে। এ কাজে জামীল ইবনে মা'মার জুমাহীর কথা শুনে তার কাছে গিয়ে উমর রাযি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার করতে বলেন। সে প্রচার করতে শুরু করে, উমর বেদ্বীন হয়ে গেছে। উমর রাযি. তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, এ মিথ্যা বলছে; বরং আমি মুসলিম হয়েছি। এরপর লোকজন তাঁর উপর চড়াও হয়। একপক্ষে জনতা অপরপক্ষে একা উমর রাযি.। এভাবে সূর্য প্রায় মাথার উপর উঠা পর্যন্ত লড়াই চলতে লাগলো। উমর রাযি. ক্লান্ত হয়ে বসে গেলেন। লোকজন তখনও তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো। তিনি বললেন, তোমরা যা খুশি করো। আমরা যদি তিনশ' হতাম! তবে মক্কায় তোমরা থাকতে, না আমরা থাকতাম; তা দেখে নিতাম।[৮২] তারপর তারা উমর রাযি. এর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

উমর তখন ঘরে বসে আছেন। এ অবস্থায় তাঁদের মিত্র সাহম গোত্রের আবু আমর আস ইবনে ওয়ায়িল এসে তাঁর কাছে ঘটনা জানতে চায়। ওদিকে সমগ্র উপত্যকা তখন লোকে লোকারণ্য। আস তাদের কাছে গিয়ে তাদের ইচ্ছা জানতে চায়। অতঃপর তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।[৮৩]

ইবনে আব্বাস রাযি. একবার তাঁর কাছে জানতে চান, তাঁর খেতাব কীভাবে ফারূক হলো? তখন তিনি বললেন, যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। রাসূল ﷺ এর কাছে আরজ করলাম, গোপনীয়তার কী দরকার? সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করবো। তারপর আমরা দু'টি সারিতে রাসূল ﷺ কে বেষ্টন করে বাহিরে এলাম ও মাসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম। একটি সারির পুরো ভাগে আমি। অন্য সারির পুরো ভাগে হামযা রাযি.। আমাকে ও হামযা রাযি. কে মুসলিমদের মাঝে দেখে কুরাইশদের মন এমনভাবে ভাঙলো যে, আগে কখনো এমন হয়নি। সেদিন রাসূল ﷺ আমার উপাধি দিয়েছিলেন ফারূক।[৮৪]

শিক্ষা:

০১. একজন আদর্শবান নেতার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে 'মানুষ

---

৮২. ইবনে হিশাম: ১/৩৪৮-৩৪৯ পৃ.; তারীখে ইবনে খাত্তাব: ০৮ পৃ.
৮৩. ইবনে হিশাম: ১/৩৪৯
৮৪. ইবনে জাওযীকৃত তারীখে উমর ইবনে খাত্তাব: ৬-৭ পৃ.

চেনা'। যেমন উমর ও আবু জাহেল দু'জনের মাঝে বড় মাপের নেতা হওয়ার যোগ্যতা ছিলো। রাসূল ﷺ তা বুঝে আল্লাহর নিকট তাদের যে কোনো একজনের হিদায়াতের জন্য দুআ করেছেন।

০১. আদর্শবান নেতার অপর একটি অন্যতম গুণ হলো, অধীনস্থদের রোগ বুঝে ওষুধ প্রয়োগ করা।

০২. যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি সর্বদাই শ্রেষ্ঠ থাকেন। প্রয়োজন শুধু দ্বীনের বুঝ থাকা।

রাসূল ﷺ এর কাছে কুরাইশ প্রতিনিধি

দু'জন বীর পুরুষের ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা কমে আসে। এমনকি কাফের-মুশরিকরা নিজেদের কর্ম-কৌশলেও পরিবর্তন আনে। তারা অত্যাচারের পরিবর্তে এবার প্রলোভনের মাধ্যম গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের জানা ছিলো না যে, মুসলিমদের কাছে দ্বীনের তুলনায় এ সকল বস্তু খড়-কুটারও মর্যাদা রাখে না।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, উতবা ইবনে রবীআহ একদিন কুরাইশদেরকে রাসূল ﷺ এর সাথে কথা বলার প্রস্তাব পেশ করে। রাসূল ﷺ তখন মাসজিদুল হারামের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রস্তাবে বলা হলো, সে রাসূল ﷺ কে কিছু গ্রহণ করার কথা বলবে। এভাবে তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে তাওহীদের বাণী প্রচার করা থেকে নিবৃত্ত করবেন। মুশরিকরা তার সাথে একমত হলো।

উতবা রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বললো, ভাতিজা! তোমার সামনে আমি কিছু প্রস্তাব পেশ করছি। এমনটি হতে পারে, কোনো কথা তোমার ভালো লাগবে এবং তুমি তা গ্রহণ করে নেবে।

রাসূল ﷺ তার কথা শোনাতে বললেন। সে বলতে শুরু করলো– তুমি মানুষের সামনে যা উপস্থিত করছো, তার উদ্দেশ্য যদি হয় ধন-সম্পদ; তবে তোমার জন্য আমরা বিপুল পরিমাণে ধন-সম্পদের ব্যবস্থা করে দেবো। যদি

তোমার উদ্দেশ্য মান-মর্যাদা হয়; তবে আমাদের নেতৃত্ব তোমার হাতে সমর্পণ করে দেবো। যদি তুমি চাও যে, রাজা-বাদশা হবে; তবে তোমাকে আমাদের সম্রাটের পদ দিয়ে দেবো। আর যদি তোমার উপর জিন সওয়ার হয়ে থাকে, যার চিকিৎসা করতে তুমি সক্ষম নও; তবে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবো।

এরপর রাসূল ﷺ বললেন, হে আবু ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ হয়েছে? তবে আমার কথা শোনো।

সে বললো, হ্যাঁ। আমি শুনবো। রাসূল ﷺ বললেন–

﴿ حم - تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ - كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ﴾

"হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শোনে না। তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত।"[৮৫]

উতবা রাসূল ﷺ এর তিলাওয়াত শুনছিলো। যখন সিজদার আয়াত আসলো রাসূল ﷺ সিজদায় গেলেন। সিজদা থেকে উঠে বললেন, আবু ওয়ালীদ! তোমাকে যা শোনানোর প্রয়োজন ছিলো তা শুনেছো। এখন তুমি জানো আর তোমার কর্ম জানে। উতবা সেখান থেকে উঠে তার সঙ্গীদের কাছে গেলো। সেখানে তারা বুঝতে পারলো যে, এ উতবা সে উতবা নয়; যাকে তারা পাঠিয়েছিলো। কেননা তার মাঝে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিলো। তাকে কী খবর

৮৫. সূরা ফুসসিলাত: ১-৫

জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো, আল্লাহর শপথ! তা কবিতাও নয়, যাদুও নয়। তোমরা আমার কথা মেনে নাও। তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও। তাঁর মুখে যে বাণী শুনলাম, অচিরেই কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটবে। যদি কোনো আরবী তাঁকে হত্যা করে ফেলে; তবে তো তোমাদের কাজ হয়েই গেলো। আর তা না হলে সে আরবীদের উপর বিজয় হলে তো তোমাদেরই লাভ। লোকজন বললো, তোমার উপরও জাদুর প্রভাব কাজ করেছে। সে বললো, আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম। তোমরা যা ভালো মনে করো তাই করবে।[৮৬]

শিক্ষাঃ

০১. বল প্রয়োগ করে দ্বীনের কাজ বন্ধ করতে না পারলে কুফরীজোট বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে কাবু করতে চায়। তাদের কোনো প্রস্তাব (নেতৃত্বের, ধন-সম্পদের প্রলোভন) গ্রহণ করলে যদি দ্বীনের বড় কোনো উপকারও হয়; তবুও সে পন্থা অবলম্বন করা রাসূল ﷺ এর মানহাজ নয়।

০২. দ্বীনের ক্ষতি হয় এমন কাজে কাফেরদের সাথে আপোষ করা রাসূল ﷺ এর আদর্শ নয়।

রাসূল ﷺ এর সাথে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কথোপকথন

কুরাইশ নেতা উতবার সাথে রাসূল ﷺ এর কথোপকথনের সময় তিনি শুধু তাকে তিলাওয়াত শুনিয়েছিলেন। তাই কুরাইশদের মনে তখনও আশা ছিলো যে, আরেকবার মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কাছে প্রস্তাব পাঠানো যাক। তারা পরামর্শের পর একদিন মাগরিবের পর কা'বা প্রাঙ্গণে মুহাম্মাদ ﷺ কে ডাকলেন। হয়তো কোনো কল্যাণ আছে ভেবে তিনি চলে আসলেন। তারা উতবার মতো প্রস্তাব পেশ করলো। তারা মনে করেছিলো, হয়তো উতবা একা ছিলো, এ কারণে তিনি উতবার কথা গ্রহণ করেননি।

রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ, মর্যাদা চাই না। আমাকে তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে; যেন আমি

৮৬. ইবনে হিশামঃ ১/২৯৩-২৯৪ পৃ.

তোমাদেরকে ভয় দেখাই। যদি তোমরা মেনে নাও; তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা ভাল পরিণাম ভোগ করবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো; তবে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করে যাবো। এরপর তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো।

এবার তারা নতুন ফন্দি আঁটলো। তারা চাইলো, তাদের যমীন থেকে পাহাড় সরিয়ে তা প্রশস্ত করে দিক। সেখানে ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেওয়া হোক। তাদের মৃতদেরকে জীবিত করে দেওয়া হোক। বিশেষ করে কুসাই ইবনে কিলাবকে। রাসূল ﷺ এবারও পূর্বের মতো উত্তর প্রদান করলেন। এরপর তারা বললো, আসমান থেকে একজন ফেরেশতা এসে তাঁর সত্যায়ন করলে তারা ঈমান আনবে। এবারও রাসূল ﷺ পূর্বের মতোই বললেন। তিনি তো তাদের শাস্তির ভয় দেখান; তাই তারা এবার শাস্তি আনয়নের দাবি জানালো। শেষপর্যায়ে তারা হুমকি দিতে শুরু করলো। তারা বললো, তোমাকে আমরা সহজে ছেড়ে দেবো না। তাদের হুমকি শোনার পর রাসূল ﷺ অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় নিজের পরিবারের কাছে চলে এলেন।

শিক্ষা:

০১. দুনিয়াবী কোনো লালসায় প্রভাবিত হয়ে দ্বীনের স্বার্থকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

০২. কাফেররা যতই ভীতি প্রদর্শন করুক না কেন, প্রকৃত দাঈ কখনো তা পরোয়া করেন না; বরং দাওয়াতী মিশন নিয়ে তিনি সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকেন।

রাসূল কে হত্যার ব্যাপারে আবু জাহেলের অঙ্গীকার

রাসূল ﷺ সেখান থেকে ফিরে আসলে আবু জাহেল সকলের সামনে রাসূল ﷺ কে পাথর দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলার ঘোষণা প্রদান করে। সে বললো, যখন মুহাম্মাদ সিজদায় যাবে, তখন পাথর মেরে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো। এখন এ অবস্থায় তোমরা যদি আমাকে একা ছেড়ে দাও, আর না হয় সাহায্য করো; বনু আবদে মানাফ এরপর যা চায় তা করুক। উপস্থিত

লোকজন বললো, আমরা তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি ইচ্ছা করেছো, করে ফেলো।

সকালে আবু জাহেল এক খণ্ড পাথর নিয়ে কা'বা প্রাঙ্গণে বসে রইলো। রাসূল ﷺ সেখানে আসলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন। তিনি সিজদায় গেলে আবু জাহেল পাথর নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো; কিন্তু নিকটে পৌঁছে পরাজিত সৈনিকের মতো সে আবার পেছনে চলে এলো। এ সময় তাকে অত্যন্ত বিবর্ণ এবং ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিলো। সে পাথরটিকে শক্ত করে খামছে ধরে ছিলো। তার হাত পাথরের সাথে চিমটে লেগে গেলো। পাথর থেকে হাত ছাড়াতে তাকে অনেক বেগ পোহাতে হলো। কিছু কুরাইশ নেতা এগিয়ে এসে বললো, আবুল হাকাম! কী হলো? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সে বললো, আমি আমার কথার বাস্তবায়ন করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর মাঝে ও আমার মাঝে একটি ভয়ানক উট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো; যেন সেটি আমাকে খেয়ে ফেলবে।

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জিবরাঈল আ. উটের আকৃতিতে (সেখানে উপস্থিত) ছিলেন। সে যদি আমার নিকট আসতো; তবে তার উপর বিপদ অবতীর্ণ হতো।[৮৭]

কাফেরদের পক্ষ থেকে আপোষ করার চেষ্টা

কুরাইশদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, হুমকি-ধমকির অস্ত্রও যখন ব্যর্থ হলো, আবু জাহেল রাসূল ﷺ কে হত্যা করার চেষ্টা করেও বিফল হলো। তাই তারা এবার নতুন ফন্দি বের করছিলো। তারা রাসূল ﷺ কে সত্য নবী হিসেবে জানতো। তাদের এ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ "তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।"[৮৮]

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূল ﷺ তাওয়াফ করছিলেন এমন সময় কুরাইশ গোত্রগুলোর কয়েকজন সর্দার তাঁর কাছে এসে বললো, এসো আমরা তোমার আল্লাহর উপাসনা করবো। এরপর তোমরাও আমাদের মা'বূদের উপাসনা

৮৭. ইবনে হিশাম: ১/২৯৮-২৯৯ পৃ.
৮৮. সূরা শূরা: ১৪

করবে। দেখবো কার মধ্যে কোন অংশ ভালো, আমরা তার সে অংশ গ্রহণ করবো। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা সূরা কাফিরূন নাযিল করেন–

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾

"আপনি বলুন, হে কাফেরকুল! তোমরা যার ইবাদত করো, আমি তার ইবাদত করি না।"[৮৯]

ইবনে জারীর ও তাবারানীর এক বর্ণনায় আছে, (কুরাইশ কাফেররা প্রস্তাব পেশ করলো) যদি রাসূল ﷺ তাদের মা'বূদের এক বছর ইবাদত করে; তাহলে তারাও রাসূল ﷺ এর রবের ইবাদত করবে।

সে সময় নাযিল হয়–

﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾

"আপনি বলুন, হে মূর্খরা! তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করার জন্য আমাকে আদেশ করছো?"[৯০]

কুরাইশরা রাসূল ﷺ এর সত্যবাদিতা, ক্ষমাশীলতা, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কঠিন মোকাবেলার মুখে টিকে থাকা, সকল প্রকার প্রলোভন প্রত্যাখ্যান, প্রত্যেক বালা-মুসীবতে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রত্যক্ষ করলো। তখন মুহাম্মাদ ﷺ এর সত্যিকার নবী হওয়ার ব্যাপারে তাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। ফলে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তারা তাঁর সম্পর্কে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করার নিমিত্তে ইয়াহুদীদের সাথে মিলিত হবে। নাযর ইবনে হারিস পূর্বে তাদেরকে রাসূল ﷺ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানায়। তার উপদেশ শোনার পর তারা তাকে ইয়াহুদীদের শহরে যাওয়ার অনুরোধ করে। তাই সে ইয়াহুদী পণ্ডিতদের নিকটে আসলে তারা

৮৯. ইবনে হিশাম: ১/৩৬২
৯০. সূরা যুমার: ৬৪

তাকে পরামর্শ দিলো, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারলে বুঝা যাবে, তিনি সত্যিকার নবী। আর না দিতে পারলে বুঝা যাবে, এটা তাঁর নিচক দাবি।

প্রশ্ন তিনটি হলোঃ ০১. প্রথম যুগের সে যুবকদের অবস্থা কী? কেননা তাদের ব্যাপারটা রহস্যঘেরা ও আশ্চর্যজনক। ০২. সে ব্যক্তি কে; যিনি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলো। তার খবর কী? ০৩. (তাঁকে জিজ্ঞেস করবে) রূহ জিনিসটা কী?

তারপর নাযর ইবনে হারিস মক্কায় ফিরে এলো। সে কুরাইশ কাফেরদের বললো, আমি তোমাদের জন্য এমন বিষয় নিয়ে এসেছি; যা মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবে। সে তিনটি প্রশ্ন তাদেরকে জানিয়ে দিলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করলে, এর কয়েকদিন পর সূরা কাহ্ফ নাযিল হয়। সেই সব যুবক হলো আসহাবে কাহ্ফ। সারা পৃথিবী ভ্রমণকারী হলেন, যুল কারনাইন। আর রূহ সম্পর্কে নাযিল হলো–

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

"আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। আর এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।"[৯১]

ফলে কুরাইশদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তারপরও তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

মোট কথা, কাফেররা রাসূল ﷺ কে প্রত্যেক দিক থেকে ঠেকানোর চেষ্টা করে। তাদের ষড়যন্ত্র এক স্তর থেকে অন্য স্তরে মোড় নিতে থাকে। তারা

৯১. সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৫

এক পদক্ষেপের পর অন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সামনে অস্ত্র হাতে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখে না। কিন্তু অস্ত্রধারণ তো তাদের জন্য কেবল মুসীবতই বৃদ্ধি করবে। তাই তারা কী করবে? তা ভেবেই পেরেশান হয়ে যায়।

শিক্ষা:

০১. দ্বীনের ব্যাপারে মুমিন কখনো কাফেরদের সাথে আপোষ করে না।

০২. পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী ও আত্মঅহমিকায় মত্ত থাকা ব্যক্তিরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে জানার পরেও ইসলাম গ্রহণ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

আবু তালিব ও তার আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থান

আবু তালিব যখন দেখলেন, কুরাইশরা সর্বদিক থেকে তাঁর ভাতিজার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। মুশরিকরা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে হত্যা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিশেষ করে, উকবা ইবনে আবী মুআইত, আবু জাহেল প্রমুখ, এরা যা ঘটিয়েছিলো তা তিনি ঠিকই খেয়াল করেছেন। তখন তিনি স্বীয় হাশিম ও আব্দুল মুত্তালিবের পরিবারবর্গকে একত্রিত করেন। তারপর তিনি তাদের সামনে প্রেক্ষাপট পরিষ্কার করে মুহাম্মাদ ﷺ এর দেখাশোনা ও সাহায্য-সহযোগিতার দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে পালনের জন্য অনুরোধ জানালেন। সকলেই তা মেনে নিলো। তবে আবু লাহাব তা গ্রহণ না করে মুশরিকদের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ-কর্ম করার ও তাদের সাহায্য করার ঘোষণা দেয়।[৯২]

বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনকে বয়কট

রাসূল ﷺ এর দাওয়াত ঠেকানোর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো। এবার কাফেররা নতুনভাবে তাঁকে আটকানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো। মুশরিকরা মুহাসসাব নামক উপত্যকায় খাইফে বনী কিনানাহ'র ভেতরে একত্রিত হয়ে এ

৯২. ইবনে হিশাম: ১/২৬৯

বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মাদ (ﷺ) কে তাদের হাতে হত্যার জন্য সোপর্দ করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তারা পালন করবে।

০১. বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সাথে সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ থাকবে।

০২. কেউ তাদের কন্যা দান করতে পারবে না, তাদের কন্যা বিয়ে করতে পারবে না।

০৩. তারা কখনো বনু হাশিমের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।

০৪. তাদের প্রতি কোনো প্রকার ভদ্রতা প্রদর্শন করা হবে না।

এ অঙ্গীকারনামা লিখেছিলো বাগীয ইবনে আমির ইবনে হাশিম। রাসূল ﷺ তার প্রতি বদদুআ করেন; ফলে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়।[৯৩] অবশেষে এ অঙ্গীকারনামার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো, তা কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। যার ফলে আবু লাহাব ছাড়া বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের মুসলিম ও কাফের সকলেই শিআবে আবু তালিবের গিরিসংকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো নবুওয়াতের সপ্তম বর্ষের মুহাররম মাসের প্রারম্ভে চাঁদ রাতে।

শিআবে আবু তালিবে

শিআবে আবু তালিবের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিলো অত্যন্ত মর্মান্তিক। ঠিক মতো না পানি পৌঁছতো না খাদ্য। কারণ, মক্কায় খাদ্য-শস্য যা আসতো; তা মুশরিকরা তাড়াহুড়ো করে কিনে নিতো। অপরদিকে খাদ্যের অভাবে শিআবে আবু তালিবে শিশুদের আর্তচিৎকার, গগনবিদারী হাহাকার বিরাজ করছিলো। গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা মিটাচ্ছেন আরবের শ্রেষ্ঠ বংশের লোকজন। তাদের নিকট খাবার পৌঁছানো ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যতটুকু পৌঁছতো তাও ছিলো সামান্য। হারাম মাসে তাদের বের হওয়ার সুযোগ ছিলো। তাছাড়া মক্কার বাহির থেকে কোনো

---

৯৩. যাদুল মাআদ: ২/৪৬

ব্যবসায়ী কাফেলা আসলে তারা তাদের থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারতেন। কিন্তু কাফেররা সে সময় জিনিসপত্রের দাম কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দিতো, ফলে তা গিরিসংকটবাসীর ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে চলে যেতো। খাদীজা রাযি. এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম ইবনে হিযাম কখনো কখনো তাঁর ফুফুর জন্য খাবার পাঠাতেন। একদিন আবু জাহেল বাঁধ সাধলো। তবে শেষ পর্যন্ত আবুল বুখতারীর মধ্যস্থতায় সেই বারে তিনি খাবার প্রেরণে সক্ষম হলেন।

এদিকে আবু তালিব প্রিয় মুহাম্মাদ (ﷺ) এর নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। লোকজনের যখন ঘুমিয়ে যাওয়ার সময় হতো, তিনি তাঁকে নিজ বিছানায় শুইয়ে দিতেন। এমন মনোভাবে যে, যদি কেউ তাঁকে হত্যা করার মনস্থ করে তবে দেখে নিক, তিনি কার বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি নিজ পুত্র, ভাই কিংবা ভাতিজাদের মধ্য হতে একজনকে রাসূল ﷺ এর স্থানে শোয়ার জন্য বলতেন। আর তার শয্যায় প্রিয় মুহাম্মাদ (ﷺ) কে শয়নের ব্যবস্থা করে দিতেন।

এ অবস্থায়ও রাসূল ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমগণ গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে হাজ্বে আসা লোকজনের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন।

শিক্ষা:

০১. বর্তমানেও কাফের-মুশরিক ও তাদের দালাল মুনাফিক জোট মিলে সত্যিকারের একনিষ্ঠ মুসলিমদেরকে অবরুদ্ধ করে কোণঠাসা করার পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এসব অপচেষ্টা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, বিইযনিল্লাহ।

০২. পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক, দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে।

বিনষ্ট হয়ে পড়লো অঙ্গীকারনামা

এক অবর্ণনীয় কষ্টের মাঝেই দিন কাটছিলো শিআবে আবু তালিবে। প্রথম থেকেই কিছু লোক এ অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা সব সময়ই এ

অঙ্গীকারনামার সমাপ্তি ঘটানোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। অবশেষে সেই মোক্ষম সময় এলো।

বনু আমির ইবনে লুঈ গোত্রের হিশাম ইবনে আমর নামক এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে শিআবে আবু তালিবে খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে দিতেন। এ ব্যক্তি একদিন যুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া মাখযূমীর নিকট এসে বললেন, আমরা উদরপূর্তি করে আহার করছি, উত্তম বস্ত্র পরিধান করছি। আর বনু হাশিম খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত। তুমি এটা কীভাবে বরদাস্ত করো? তোমার মামা বংশের এ করুণ অবস্থা তুমি ভালো করেই জানো।[৯৪] ব্যথা বিজড়িত কণ্ঠে যুহাইর বললেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? তবে আমার সাথে কেউ থাকলে অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে ফেলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। হিশাম বললেন, বেশ তো। আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। যুহাইর বললেন, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো।

এ উদ্দেশ্যে হিশাম মুতইম ইবনে আদীর নিকট গেলেন। তাকে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সম্পর্কের সূত্রে আবদে মানাফের সন্তান হওয়ার দোহাই দিলেন। যুহাইরের মতো মুতইম ইবনে আদীও রাজি হয়ে গেলেন এবং তৃতীয় একজন ব্যক্তি জোগাড় করতে বললেন। হিশাম জানালেন তারও ব্যবস্থা হয়েছে আর সে হচ্ছে যুহাইর। এবার চতুর্থ আরেকজনের খোঁজ চললো। এভাবে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আবুল বুখতারী, যামআহ ইবনে আসওয়াদ কে তাদের সঙ্গে নিলেন। তারপর সকলে হাজূনের নিকট একত্রিত হয়ে অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে ফেলার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। যুহাইর বললেন, এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আমিই মুখ খুলবো। পূর্বের কথার মতো সকলে মজলিসে উপস্থিত হলেন। যুহাইর তাওয়াফ শেষ করে কুরাইশদের আহ্বান করে বললেন, আমরা তৃপ্তিসহকারে খাওয়া-দাওয়া করবো আর বনু হাশিম ধ্বংস হয়ে যাবে? আল্লাহর শপথ! আমি এ অন্যায় অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে ফেলা পর্যন্ত বসে থাকতে পারি না। আবু জাহেল বললো, তুমি ভুল বলছো। প্রত্যুত্তরে যামআহ বললেন, আল্লাহর শপথ! বরং তুমিই অধিক ভুল বকছো। কিসের অঙ্গীকারপত্র? আমরা কখনো এতে সম্মতি দেইনি।

---

৯৪. যুহাইর ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ও আবু তালিবের বোন আতিকার পুত্র।

অপরদিকে আবুল বুখতারী বলে উঠলেন, যামআহ ঠিকই বলছে। ওতে আমাদের সম্মতি ছিলো না। এখনো তা মানতে আমরা বাধ্য নই। এরপর মুতইম ইবনে আদী বললেন, তোমরা উভয়েই ন্যায্য কথা বলেছো। তাদের সমর্থনে হিশাম ইবনে আমরও একই কথা বললেন। এদিকে আবু জাহেল বললো, বুঝেছি। এসব কথা গত রাত হতেই ঠিক করা ছিলো।

ঠিক এ সময় আবু তালিব হারাম শরীফের এক প্রান্তে দাঁড়ানো ছিলেন। কারণ আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ এর কাছে ওহী নাযিল করেছেন যে, অঙ্গীকারনামাকে এক প্রকার কীট খেয়ে ফেলেছে। শুধু তাতে আল্লাহর নামই অবশিষ্ট আছে। আর রাসূল ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবকে পাঠালেন; যাতে তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তাদেরকে সংবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, যদি আমার ভাতিজার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে তাঁর ও তোমাদের মাঝ থেকে আমি সরে দাঁড়াবো। তখন তোমরা যা ইচ্ছে তাই করবে। আর যদি সত্যি প্রমাণিত হয়। তবে বয়কটের মাধ্যমে যে অন্যায় চলে আসছে; তা থেকে বিরত হতে হবে। এ কথায় কুরাইশরা একমত হয়ে বললো, আপনি ইনসাফের কথা বলেছেন।

এদিকে আবু জাহেল ও অন্যান্যদের সাথে তর্কাতর্কি শেষ হলে মুতইম ইবনে আদী অঙ্গীকারনামা হাতে নিয়ে দেখেন যে, ঠিকই তাতে শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' ছাড়া সব লেখাই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর অঙ্গীকারনামা ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং এর ফলে বয়কটের অবসান ঘটে। মুশরিকরা নবুওয়াতের এক বিশেষ নিদর্শন দেখে চমৎকৃত হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আচরণের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন সূচিত হলো না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴾

"কিন্তু যখন তারা কোনো নিদর্শন দেখে তখন মুখ ফিরিয়ে বলে, এটা তো সেই আগের থেকে চলে আসা যাদু।"[৯৫]

ফলে মুশরিকরা বিমুখই রয়ে গেলো। স্বীয় কুফরে আরেক ধাপ অগ্রসর হলো।[৯৬]

৯৫. সূরা কমার: ০২

৯৬. সহীহ বুখারী: ১/২৬১; ইবনে হিশাম: ১/৩৫০-৩৫১ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/৪৬; মুখতাসারুস

শিক্ষাঃ

০১. জামাআতবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রত্যেকের উচিত নিজ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা। কারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। যেমনটি করেছিলেন হিশাম ইবনে আমর।

০২. কাফেররা সব সময় সত্য পথের পথিকদেরকে সর্বদিক থেকে বয়কট করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

আবু তালিবের নিকট কুরাইশদের শেষবার গমন

গিরিসংকট থেকে বের হয়ে আসার পর পূর্বের মতোই রাসূল ﷺ দাওয়াত প্রদান অব্যাহত রাখলেন। অপরদিকে কুরাইশরা মুসলিমদের উপর আগের মতোই চাপ প্রয়োগ করছিলো। আবু তালিবও আগের মতোই স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাহায্য করছিলেন নিজের জীবন বাজি রেখে। কিন্তু গিরিসংকটে থাকার দরুন আবু তালিব গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবার মুশরিকরা ভাবলো, যদি আবু তালিব মারা যান এবং তারা এরপর তার ভাতিজার উপর অত্যাচার করে, ফলে তাদের বদনাম হবে। তাই তারা আবু তালিবের কাছে আসলো শেষ সিদ্ধান্তের জন্য।

তারা আবু তালিবকে বললো, আবু তালিব! আপনি আমাদের মাঝে সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত। এখন আপনি অন্তিম শয্যায় শায়িত। অপরদিকে আপনার ভাতিজা ও আমাদের মাঝে চলছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। সেটাও আপনার অজানা নয়। আমাদের চাওয়া হলো, আপনি আমাদের মাঝে ও আপনার ভাতিজার মাঝে একটি অঙ্গীকার করে দেবেন। যার ফলে, আমরা তাঁর থেকে পৃথক থ াকবো এবং তিনি আমাদের থেকে পৃথক থাকবেন। অর্থাৎ আমাদের ধর্মমতের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। আমরাও তাঁর ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবো না।

আবু তালিব রাসূল ﷺ কে ডেকে নিলেন। তাঁর সামনে সব বর্ণনা করলেন। তার উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন–

সীরাহ: ৬৮-৭৩ পৃ.

ارأيتم ان أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب و دانت لكم بها العجم

"আমি যদি তোমাদেরকে একটি প্রস্তাব পেশ করি, যা মেনে নিলে তোমরা আরবের অধিকারী হয়ে যাবে ও আজম তোমাদের অধীনস্থ হয়ে যাবে।"

নেতৃত্বের পাগল আরব জাতি। রাসূল ﷺ এর কথা তাদের মগজকে একদম আচ্ছন্ন করে ফেললো। তারা ভাবলো, যদি একটি কথা মেনে নিলে সমগ্র আরবের সম্রাট হওয়া যায়; তবে মেনে নিলে ক্ষতি কী? আবু জাহেল বললো, আচ্ছা! তুমি বলো তো কথাটি কী? তোমার পিতার কসম! যদি তা সত্য হয়; তবে একটি কেন এরকম দশটি কথা মানতেও আমরা প্রস্তুত। রাসূল ﷺ বললেন–

لا اله الا الله- تخلعون ما تعبدون من دونه

"আপনারা বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করছেন, তা পরিহার করুন।"

এবার তারা হাতে হাত মারতে মারতে ও তালি দিতে দিতে বললো, তুমি এটাই চাচ্ছো– সকল ইলাহ এর জায়গায় এক ইলাহ কে মানতে? তারপর তারা বললো, এ ব্যক্তি তোমাদের একটি কথাও মানতে প্রস্তুত নয়। তাই চলো, নিজের পিতৃপুরুষদের ধর্মের উপরই অটল থাকি। এরপর তারা নিজেদের রাস্তায় চলে গেলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা সদ এর প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয়।

শিক্ষা:

মুমিন তাওহীদের বিশ্বাসের উপর অটল থাকার জন্য দুনিয়ার সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে কাফের সবকিছু মানতে প্রস্তুত হলেও তাওহীদের বিশ্বাসকে মানতে প্রস্তুত নয়।

শোকের বছর

আবু তালিবের মৃত্যু

বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদির কবলে আবু তালিবের অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছিলো। অবশেষে গিরিসংকটের মাঝে কষ্টকর অবস্থা অবসানের ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর নবুওয়াতের দশম বছর রজব মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সহীহ বুখারীতে মুসাইয়িব রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। আবু তালিব যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ তার নিকট গিয়ে বললেন, চাচাজান! আপনি শুধু একবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ুন। যেন আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে আল্লাহর সামনে তা পেশ করতে পারি।

ধূর্ত আবু জাহেল তখন সেখানে উপস্থিত। সে সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া। তারা বললো, আবু তালিব কি শেষ পর্যন্ত আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে গেলো? এরপর তারা উভয়ে আবু তালিবের সাথে কথা বলতে থাকে। পরিশেষে আবু তালিবের মুখ থেকে যে কথাটি বের হয় তা হলো, আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীনের উপর। রাসূল ﷺ তখন বললেন, "আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত না হবো আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাবো। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়–

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

"নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবে, যদিও তারা আত্মীয় হোক, এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।"[৯৭]

৯৭. সূরা তাওবা: ১১৩

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না; তবে আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। তিনিই ভাল জানেন সৎপথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে।"[৯৮]

আবু তালিবের শেষ পরিণতি সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন, "তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে অবস্থান করছেন। যদি আমি তার সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম; তাহলে তিনি জাহান্নামের অতল গহ্বরে ডুবে যেতেন।"[৯৯]

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তার চাচা আবু তালিবের আলোচনা করা হয়। তখন তিনি বলেন, সম্ভবত কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে; যা শুধু তার দু'পায়ের গিঁট পর্যন্ত পৌঁছবে।[১০০]

শিক্ষা:

কারো মাঝে যদি ঈমানের দৌলত না থাকে; তাহলে তার কোনো মহৎ কর্মই তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না।

খাদীজা রাযি. এর ইন্তেকাল

আবু তালিবের মৃত্যুর পর মাত্র দুই মাস অতিবাহিত হলো [১০১] উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা রাযি. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়াতের দশম

৯৮. সূরা ক্বাসাস: ৫৬
৯৯. সহীহ বুখারী: ১/৫৪৮
১০০. সহীহ বুখারী: ১/৫৪৮
১০১. মতান্তরে তিন দিন

বছরের রমজান মাসে হয়েছিলো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিলো পঁয়ষট্টি বছর। রাসূল ﷺ তখন তাঁর জীবনের পঞ্চাশতম বছর অতিক্রম করছিলেন।[১০২]

দুঃখের উপর দুঃখ

প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিবের মৃত্যু ও প্রিয়তমা সহধর্মিণী খাদীজা রাযি. এর মৃত্যু; এ দু'টি ঘটনা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটে গেলো। যার ফলে রাসূল ﷺ একদিকে শৈশবে অভিভাবককে হারান। যিনি তাঁর জন্য সব সময় ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। অপরদিকে যিনি তাঁকে সব সময় পরামর্শ ও প্রেরণা যুগিয়ে যেতেন, সে প্রিয়তমা সহধর্মিণীর বিয়োগব্যথা।

চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর ফলে মুশরিকদের সাহস আরও বহু গুণে বৃদ্ধি পেলো। শত নিরাশার মাঝে তিনি তায়েফ গেলেন; হয়তো সেখানকার লোকজন ঈমান আনবে বা তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু সেখানেও তাঁর সাথে নির্মম আচরণ করা হয়েছে। অতীতের সকল নির্যাতনকে ছেয়ে গেছে তায়েফবাসীর নির্যাতন।

মুসলিমদের উপর জুলুম-অত্যাচার এত অধিক হারে বেড়ে যায় যে, ধৈর্যের পাহাড় আবু বকর রাযি.ও হাবশার পথ ধরেন। কিন্তু পথিমধ্যে ইবনে দুগুন্না তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে ফিরিয়ে আনেন। [১০৩]

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা রাসূল ﷺ কে এত অধিক পরিমাণে কষ্ট দিতো যে, আবু তালিবের জীবদ্দশায় তা কল্পনাও করা হতো না। একবার এক নির্বোধ গোঁয়ার কুরাইশ রাসূল ﷺ এর পবিত্র মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে। তিনি সেই অবস্থাতেই বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর এক কন্যা সে মাটি ধুয়ে দিচ্ছিলেন আর কাঁদছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে সান্তনা দিয়ে বলছিলেন–

لا تبكي يا بنية فان الله مانع اباك

"কেঁদো না মা, আল্লাহই তোমার পিতার হেফাজতকারী।"

---

১০২. ইবনুল কাইয়্যিম জাওযীকৃত তালকীহুল ফুহুম: ৭; রহমাতুল্লিল আলামীন: ২/১৬৪
১০৩. ইবনে হিশাম: ১/৪১৬

তিনি আরও বলেন, আমার চাচা যখন জীবিত ছিলেন কুরাইশরা আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করেনি; যা আমার সহ্যের বাহিরে ছিলো।[১০৪] এমনিভাবে তিনি একের পর এক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হোন। তাই তিনি এ বছরটির নাম রাখেন 'আমুল হুযন'।

পবিত্র মিরাজ

রাসূল ﷺ দ্বীনের দাওয়াত ও তার প্রতিক্রিয়ায় নির্যাতন-নিপীড়ন, অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যমপর্যায় অতিক্রম করছিলেন। সুদূর আকাশ প্রান্তে অমাবস্যার আঁধার ঠেলে সূর্যের আলোক রশ্মি দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। সমগ্র আরব রাসূল ﷺ এর বিরোধিতায় লিপ্ত। এমনই ক্লান্তিলগ্নে তাঁর দাওয়াতী কাজে সহায়তাকারী আবু তালিব ও খাদীজা রাযি. এর ইন্তেকালের কারণে তিনি বেদনায় জর্জরিত হয়ে পড়েন। ঠিক এমন কঠিন মুহূর্তে রাসূল ﷺ কে সান্তনা দানের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর সাক্ষাতলাভের সৌভাগ্য দান করেন। এটাই পবিত্র মিরাজ নামে পরিচিত।

মিরাজের সময়কাল

মিরাজের সময় নিয়ে সীরাত বিশারদগণের নিকট নানা মতানৈক্য রয়েছে। তার মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য তিনটি মত নিচে পেশ করা হলো।

০১. কারো মতে, হিজরতের ষোল মাস পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াতের বারোতম বছরে রমজান মাসে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০২. কেউ মনে করে থাকেন, হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াতের তেরোতম বছরের মুহাররম মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৩. অন্যদের মতে হিজরতের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াতের তেরোতম বছরের রবিউল আউয়াল মাসে মিরাজ হয়েছিলো।

পবিত্র মিরাজের ঘটনার বিবরণ

সংক্ষেপে এ ঘটনার বিবরণ হলো, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন, প্রাপ্ত তথ্যাদি মোতাবেক প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে– হযরত জিবরাইল আ. রাসূল

---

১০৪. তালকীহুল ফুহুম: ৬; রহমাতুল্লিল আলামীন: ২/১৬৫

ﷺ কে সশরীরে বোরাকের উপর আরোহণ করিয়ে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মাকদিস নিয়ে যান। সেখানে তিনি সকল নবী আ. এর উপস্থিতিতে নামাজের ইমামতি করেন। সে সময় বোরাক মাসজিদের দরজার আংটার সাথে বাঁধা ছিলো। নামাজ শেষে পুনরায় বোরাকে আরোহণ করে এক এক করে তিনি সাত আসমান অতিক্রম করেন। প্রত্যেক আসমানে একেকজন নবী আ. এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। অতঃপর তিনি রফরফ যোগে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন। সেখানে তিনি মহান আল্লাহ তাআলা'র সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। চলার শেষপর্যায়ে তাঁকে বাইতুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সফরে তিনি জান্নাত, জাহান্নামসহ আল্লাহ তাআলা'র আরও বহু নিদর্শন অবলোকন করেছেন। আল্লাহ তাআলা পুরস্কারস্বরূপ প্রিয় হাবীব ﷺ কে পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দান করেন। রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেছেন কিনা, এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. দ্বিমত পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর এক সূক্ষ্ম বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখার কোনো প্রমাণ নেই।"

পবিত্র মিরাজ থেকে ফিরে এসে যখন রাসূল ﷺ স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট তা বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন তারা এসব কিছুকে মিথ্যে এবং আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দিলো। তাতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। বরং রাসূল ﷺ কে অতিমাত্রায় নির্যাতন করতে লাগলো। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর রাযি. এসব কথা শোনামাত্রই সত্য বলে মেনে নেন এবং তা প্রচার করতে শুরু করেন। এ কারণেই তাঁকে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।[১০৫] এ পবিত্র মিরাজ একটি বরকতময়, রহস্যপূর্ণ ও হিকমত সম্বলিত ঘটনা। এটি রাসূল ﷺ এর জীবনের অন্যতম একটি অধ্যায়।

সাওদাহ রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ

সাওদাহ রাযি. নবুওয়াতের প্রথম অবস্থায় মুসলিম হয়েছিলেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের সময় তিনি তাঁর স্বামী সাকরান ইবনে আমর রাযি. এর সঙ্গে হিজরত করেন। তাঁর স্বামী সাকরান রাযি. হাবশায় ইন্তেকাল করেন। এ

১০৫. ইবনে হিশাম: ১/৩৯৯

কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি মক্কায় ফিরে এসে ইন্তেকাল করেন। সাওদাহ রাযি. এর ইদ্দত পালনের পর রাসূল ﷺ তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। খাদীজা রাযি. এর পর সাওদাহ রাযি. ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী।[১০৬]

প্রথম পর্যায়ের মুসলিমগণের ধৈর্য ও দৃঢ়তার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন, তাঁদেরকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, দৈন্য-দুর্দশা, নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হয়েছিলো। এ অবস্থায় তাঁরা ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাহস ও দৃঢ়তা, পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতা এমনকি প্রয়োজনে প্রাণ বিপন্ন করে ইসলামের বৃক্ষকে সজীব-সতেজ রেখেছেন। তাঁদের ত্যাগের এ অধ্যায় গভীরভাবে অনুধাবন করে বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হোন। তাদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর নিয়ে এ আলোচনার অবতারণা।

০১. আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান: উপযুক্ত প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য সর্বপ্রথম উত্তর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের প্রগাঢ় বিশ্বাস। কারণ তাওহীদের সুস্পষ্ট ধারণায় যখন মুমিনের হৃদয় আলোকিত থাকে, তখন পর্বতসম প্রতিবন্ধকতাও তাঁর সামনে শুষ্ক তৃণখণ্ডের মতো তুচ্ছ মনে হয়। তাঁর সামনে পৃথিবীর যত ভয়ংকর, ভয়-ভীতিপূর্ণ সমস্যা কিংবা কঠিন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, অটল বিশ্বাসে তাঁর হৃদয়-আত্মা বলীয়ান থাকে। এ কারণে ঈমানী সুধার আস্বাদনে পরিতৃপ্ত কোনো ঈমানদারের প্রাণের সজীবতা এবং উদার-উন্মুক্তচিত্তের আনন্দানুভূতি মূর্খ ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানবসৃষ্ট দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণাকে কক্ষনো পরোয়া করে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾

"অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে

১০৬. তালকীহুল ফুহুম: ৬; রহমাতুল্লিল আলামীন: ২/১৬৫

আসে; তা যমীনে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।"[১০৭]

০২. মহিমান্বিত ও প্রাজ্ঞ পরিচালনা: এটা সর্বজনবিদিত যে, রাসূল ﷺ ছিলেন বিশেষ করে, মুসলিম উম্মাহ এবং সাধারণভাবে বিশ্বমানবের জন্য মহিমান্বিত পরিচালক ও প্রাজ্ঞ পথপ্রদর্শক। নেতৃত্ব, অপরূপ দৈহিক সুষমা, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা, বিনম্র স্বভাব, উদার-উন্মুক্ত আচরণ, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও বাগ্মিতা এসব কিছুর সমন্বয়ে তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব; যাঁর সান্নিধ্য কিংবা সাহচর্যে মানুষ একবার এলে বারবার আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। তাঁর নম্র আচরণ, সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, আমানতদারিতা ইত্যাদি উত্তম গুণাবলীর জন্য বন্ধু-বান্ধব, এমনকি শত্রুরাও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারতো না।

একদা কুরাইশের তিন ব্যক্তি একত্রিত হয়। তারা প্রত্যেকে একে অপরের অগোচরে পৃথক পৃথকভাবে রাসূল ﷺ এর তিলাওয়াত শ্রবণ করছিলো। তাদের মধ্যে আবু জাহেলও ছিলো। একজন আবু জাহেলকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর নিকট যা শ্রবণ করেছো, সে সম্পর্কে তোমার মতামত কী? তা বলো। তখন আবু জাহেল রাসূল ﷺ এর গুণকীর্তন করতে বাধ্য হলো। তবে সে পরিশেষে এ কথাও বললো যে, আল্লাহর কসম! আমরা ঐ ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না এবং তাঁকে কখনোই সত্যবাদী বলবো না। সে এ কথাও বলতো, হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমাকে মিথ্যুক বলছি না; কিন্তু তুমি যা নিয়ে এসেছো, তা মিথ্যা মনে করছি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন−

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾

"অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।"[১০৮]

---

১০৭. সূরা রদ: ১৭
১০৮. সূরা আনআম: ৩৩

এই তো ছিলো রাসূল ﷺ এর শত্রুদের অবস্থা। অপরদিকে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কাছে তিনি ছিলেন প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সকলের চিন্তা-চেতনা ও অন্তরের চিকিৎসক। তাঁদের প্রাণ রাসূল ﷺ এর প্রাণের দিকে সেভাবে আকর্ষিত হতো, যেভাবে সাধারণ লৌহখণ্ড চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অন্তরে রাসূল ﷺ এর প্রতি যে প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা ছিলো, মানবজাতির ইতিহাসে কোথাও এর কোনো তুলনা মেলে না। যেমনটি হযরত আবু বকর রাযি. এর একটি ঘটনা থেকে অনুধাবন করা সম্ভব।

একদা হযরত আবু বকর রাযি. উতবা ইবনে রাবীআহ কর্তৃক অত্যন্ত নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে স্বীয় গোত্র বনী তাইমের লোকজন কাপড়ে জড়িয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে যান। তাদের ধারণা ছিলো, তিনি বুঝি আর বাঁচবেন না। কিন্তু দিনের শেষ ভাগে যখন তাঁর মুখ থেকে কথা ফুটেছে। তখন তিনি উপস্থিত লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, রাসূল ﷺ এর অবস্থা কী? এ কথা শুনে তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁকে বকাঝকা করে চলে গেলো। অতঃপর তিনি তাঁর মায়ের সহযোগিতায় রাসূল ﷺ এর সংবাদ জানতে পেরে বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূল ﷺ কে না দেখা পর্যন্ত আমি পানাহার করবো না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁর মা ও উম্মে জামিল রাযি. স্বীয় কাঁধে ভর করিয়ে তাঁকে দারুল আরকামে নিয়ে যান এবং সেখানে তিনি রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করেন। এমনই ছিলো রাসূল ﷺ এর প্রতি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অগাধ ভালোবাসা ।

০৩. দায়িত্ববোধের অনুভূতি: সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এটা সুস্পষ্টভাবে অবগত ছিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত এ বিশাল দায়িত্ব থেকে বিমুখ হওয়া কিংবা তা এড়িয়ে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, দায়িত্ব বিমুখ হলে বা এড়িয়ে গেলে তার পরিণতি হবে কাফের-মুশরিকদের অন্যায়, অত্যাচার এবং নিপীড়নের তুলনায় অনেক বেশি ভয়াবহ। এর ফলে সমগ্র মানবতার যে ক্ষতি হবে এবং এমন সব সমস্যার উদ্ভব হবে, যার তুলনায় এসব দুঃখ-কষ্ট এবং ক্ষয়ক্ষতি খুবই নগণ্য।

০৪. **পরকালীন জীবনে বিশ্বাস:** আল্লাহর যমীনে দ্বীন কায়েম করার জন্য মানুষের উপর অর্পিত দায়িত্ববোধকে শক্তিশালী ও কর্মমুখী করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে, পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এ কথার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, ইহকালীন জীবনের ভাল-মন্দ কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে বিচার দিবসের সুখ-শান্তি বা দুঃখ-কষ্টের ফায়সালা। তাই তাঁরা সর্বক্ষণ কল্যাণমুখী কাজকর্মে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা জান্নাত লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। অপরদিকে মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের আযাবের ভয়ে অস্থির হয়ে থাকতেন। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾

"এবং যাঁরা যা দান করবার; তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তাঁরা তাঁদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।"[১০৯]

এ বিষয়েও তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, পৃথিবীর ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস পারলৌকিক জীবনের তুলনায় মশার একটি পাখার সমতুল্যও নয়। তাঁদের বিশ্বাসে এমন দৃঢ়তার ফলে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন সব ছিলো নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কাজেই জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁদের বিশ্বাস এবং সহনশীলতাও ততোধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যা কাফের-মুশরিকদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছে।

০৫. **আল-কুরআন:** কাফের-মুশরিক সৃষ্ট ভয়ংকর বিপদাপদ ও ঘোর সামাজিক অনাচার এবং অবক্ষয়জনিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বিধান অবতীর্ণ করেছিলেন। যার মাধ্যমে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ইসলামের মৌলিক নিয়ম কানুনের উপর প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তখন দাওয়াতের কাজও পূর্ণোদ্যমে চলছিলো। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা এমন সব মৌলিক কর্মের আদেশ করেছেন, যার

১০৯. সূরা মুমিনুন: ৬০

উপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজের নির্মাণ প্রক্রিয়া। সে লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. পূর্ণোদ্যমে কাজ করছিলেন। ফলে মুশরিকগোষ্ঠী তা সহ্য করতে না পেরে তাঁদের উপর নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চাপিয়ে দেয়। আর তখনি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অনুভূতিকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান করার জন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾

"তোমারা কি এ ধারণা করেছো যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে; অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছিলো অর্থ সংকট, দুঃখ-কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে, যাতে রাসূল ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণকে পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।"[১১০]

তিনি আরও ইরশাদ করেন–

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি, অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾

১১০. সূরা বাকারা: ২১৪

“আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিলো। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদেরকে।”[১১১]

মহান আল্লাহ এমন বহু আয়াতে কারীমার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে দৃঢ়পদ করেছেন।

০৬. সফলতার শুভ সংবাদ: সাহাবায়ে কেরাম রাযি. উপর নানা নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁরা সত্য পথে অবিচল ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, এ দুঃখ-কষ্টের পর নিশ্চিত উন্মোচিত হবে সফলতার দ্বার। কারণ, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে বিজয়ী করার সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ- إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ- وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ -وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ -أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ- فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ -﴾

“আমার প্রেরিত বান্দাগণের ব্যাপারে পূর্বেই আমি এ কথা স্থির করে রেখেছি। অবশ্যই তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। আপনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন। এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। আমার আযাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? অতঃপর যখন তাদের আঙ্গিনায় আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো, তাদের সকালবেলাটি হবে খুবই মন্দ।”[১১২]

---

১১১. সূরা আনকাবুত: ১-৩
১১২. সূরা আস-সাফফাত: ১৭১-১৭৭

তিনি আরও ইরশাদ করেন–

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

"যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্য গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেবো এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; যদি তারা জানতো!"[১১৩]

উল্লিখিত বিষয়াদির আলোকে প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে এমন একটি সমন্বিত চেতনার সৃষ্টি হলো; যার মাধ্যমে বিপদাপদে ধৈর্যধারণের অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, আত্মশক্তির উৎকর্ষ সাধন, নিবেদিত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা এমন এক জীবন গঠনে উদ্যমী হয়ে গেলেন, কোথাও তার কোনো তুলনা মিলে না।

শিক্ষা:

মুমিনের হৃদয় সর্বদা আল্লাহর ভালোবাসা, পরকালীন কল্যাণের আকাঙ্খা এবং জান্নাতের প্রফুল্লতায় ভরপুর থাকে। তাই শত বাধা-বিপত্তি ও জুলুম-নির্যাতনের মাঝেও সত্যকে আঁকড়ে থাকে।

---

১১৩. সূরা নাহল: ৪১

দাওয়াতের তৃতীয় পর্যায়:

মক্কাভূমির বাহিরে ইসলাম প্রচার

তায়েফে রাসূল ﷺ

নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসে[১১৪] রাসূল ﷺ তায়েফ[১১৫] গমন করেন। সঙ্গে তাঁর আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. ছিলেন। তায়েফ যাওয়ার পথে যে গোত্রের নিকট তাঁরা উপস্থিত হতেন, তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তাঁর আহ্বানে তাদের কেউই সাড়া দেয়নি।

তায়েফ গমন করে তিনি সাকীফ গোত্রের তিন সহোদর নেতার কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা রাসূল ﷺ এর সাথে অশালীন আচরণ করে। রাসূল ﷺ মনোক্ষুণ্ন হয়ে তাদের ব্যাপারটা গোপন রাখতে বললেন।

রাসূল ﷺ তায়েফে দশ দিন ছিলেন। তিনি নেতৃস্থানীয় সকলের কাছেই ইসলাম পেশ করেন। কিন্তু তারা সকলেই নেতিবাচক উত্তর দেয় এবং তাঁকে তায়েফ ছেড়ে চলে যেতে বলে। ফলে ভগ্নহৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তায়েফের শিশু-কিশোর-যুবকদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হলো। পথের দু'পাশে তখন ভিড় লেগে গেলো। হাত তালি, অশ্রাব্য গালি, ক্রমাগত পাথরের আঘাত আসতে থাকলো। আঘাতের ফলে রাসূল ﷺ এর পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে যায়। যায়েদ ইবনে হারিসাহ তখন রাসূল ﷺ কে পাথর থেকে বাঁচানোর জন্য ঢাল হিসেবে নিজেকে তাঁর সামনে পেতে ধরেছেন। যার ফলে তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে আঘাত লাগায় তিনিও আহত হয়ে পড়েন। আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁরা একটি আঙুর বাগানে আশ্রয় নিলেন। বাগানটি রবীআহ'র দু'পুত্র উতবা ও শায়বাহ'র।[১১৬] তাঁরা বাগানে প্রবেশ করার পর হতভাগ্য তায়েফবাসী ফিরে গেলো।

---

১১৪. ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের শেষ বা জুন মাসের শেষের দিকে।
১১৫. মক্কা থেকে তায়েফ আনুমানিক ৬০ মাইল দূরে।
১১৬. বাগানটি তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে।

রাসূল ﷺ বাগানে এসে দেয়ালের সাথে হেলান দিলেন। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন। এ দুআটি দুর্বলদের দুআ নামে প্রসিদ্ধ।

রাসূল ﷺ এর এরূপ অবস্থা দেখার পর রবীআহ'র পুত্রদ্বয়ের মাঝে গোত্রীয় চেতনা জেগে উঠে। তারা তাদের গোলামকে দিয়ে একটি আঙুরের গোছা পাঠায়। গোলামটি খ্রিস্টান, যার নাম আদ্দাস। রাসূল ﷺ বিসমিল্লাহ বলে হাত বাড়িয়ে আঙুরের গোছাটি গ্রহণ করলেন এবং তা থেকে খেতে শুরু করলেন।

আদ্দাস বললো, এমন কথা তো এ অঞ্চলের লোকদের মুখে আর শুনিনি। রাসূল ﷺ জানতে চাইলেন, তুমি কোথায় থাকো? তোমার ধর্ম কী? সে বললো, আমি খ্রিস্টান। নিনাওয়ার বাসিন্দা। রাসূল ﷺ বললেন, সৎ ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তার গ্রাম থেকে? আদ্দাস বললো, আপনি কীভাবে তাঁকে চিনলেন? রাসূল ﷺ বললেন, তিনি আমার ভাই। আমিও নবী, তিনিও নবী। তারপর আদ্দাস রাসূল ﷺ এর হাত ও পায়ে চুমো দিতে থাকলো। এ দেখে রবীআহ'র পুত্ররা পরস্পরকে বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ (ﷺ) তো এবার তোমার গোলামকে বিগড়িয়ে দিলো।

যখন আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে আসে, তারা জানতে চাইলো, ব্যাপারটি কী? সে বললো, আমি ধরার বুকে এর চেয়ে উত্তম মানুষ দেখিনি। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয় জানালেন, যা কোনো নবী ছাড়া অন্য কেউ জানেন না।

তারা বললো, ঐ ব্যক্তি যেন তোমাকে নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করতে পারে। কেননা তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ।

রাসূল ﷺ মক্কার দিকে এগিয়ে চলছেন, এমন সময় যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে অবস্থায় মক্কা থেকে বের হলেন, এখন আবার কীভাবে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই একটি পথ বের করে দেবেন। তিনি অবশ্যই তাঁর মনোনীত দ্বীনকে সাহায্য করবেন। তাঁর নবীকে বিজয় দান করবেন।

তাঁরা মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করলেন। তারপর খুযাআহ গোত্রের একজন লোকের মাধ্যমে আখনাস ইবনে শারীকের নিকট

সংবাদ পাঠালেন; যেন তিনি রাসূল ﷺ কে আশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু তিনি আপত্তি জানালেন এ বলে যে, কুরাইশরা তার মিত্র। এরপর সুহায়েল ইবনে আমরকে বার্তা পাঠালেন; কিন্তু সেও অপারগতা প্রকাশ করলো। শেষে তিনি মুতইম ইবনে আদীর কাছে বার্তা পাঠালেন। মুতইম তার সম্প্রদায়কে ডেকে বললেন, তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে কা'বা প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়ে যায়।

তারপর মুতইম রাসূল ﷺ এর কাছে খবর পাঠালেন মক্কা আগমনের জন্য। তিনি মক্কায় প্রবেশ করে মাসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন। হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। অতঃপর দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর অস্ত্র সজ্জিত মুতইম ইবনে আদী ও তার লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি ঘরে ফিরে এলেন।[১১৭]

শিক্ষা:

০১. দাওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনকালে দাঈ নানা জুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হোন, তবুও তিনি ভেঙে পড়েন না; বরং ধৈর্যধারণ করেন এবং হিদায়াতের সুসংবাদ নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যান।

০২. দুর্বল এবং পরাজিত মস্তিষ্কের লোকেরাই সত্য ও সত্য পথের পথিকদের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হয় এবং অন্যায়ের ইন্ধন জোগায়।

০৩. মুমিন যত কঠিন এবং প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হোক না কেন! তিনি তাঁর দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যান। কারণ, তাঁর জীবনের লক্ষ্য এটাই এবং তাঁর মাধ্যমে একজন মানুষ সঠিক পথের দিশা পাওয়া তাঁর জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক দামি।

০৪. মুমিনের সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাই সারা পৃথিবী শত্রুতায় লিপ্ত হলেও হতাশার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর মদদ সাথে আছে তো; অবশ্যই উত্তম রাস্তার ব্যবস্থা হবে। তিনিই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

---

১১৭. ইবনে হিশাম: ১/৪১৯; যাদুল মাআদ: ২/৪৬-৪৭ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ১৪১-১৪২ পৃ.; অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

নবুওয়াতের দশম বছর যুল কা'দাহ মাসে[১১৮] রাসূল ﷺ তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। পুনরায় তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিকট দাওয়াত পেশ করে যাচ্ছেন। তখন ছিলো হাজ্বের সময়। আশপাশের ও দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা ও গোত্র থেকে তাদের প্রতিনিধি দল ও বিশেষ ব্যক্তির কাছে রাসূল ﷺ দাওয়াত পেশ করছিলেন। হাজ্বের সময় দাওয়াতের ধারা তো নবুওয়াতের চতুর্থ বছর থেকে চলে আসছে। তবে এবার তিনি দাওয়াতের সাথে সাথে তাঁকে সহযোগিতা করার প্রস্তাবও করে আসছেন।[১১৯]

গোত্রসমূহের নিকট ইসলাম পেশ করলে তাদের কী অবস্থা হয় বা তাদের জবাব কী ছিলো; সে সম্পর্কে ইবনে ইসহাক যা উল্লেখ করেছেন, তা হলো–

০১. বনু কালব: রাসূল ﷺ তাদেরকে দেওয়া আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর শাখা বনু আব্দুল্লাহর নিকট দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু তারা দাওয়াত গ্রহণ করেনি।

০২. বনু হানীফাহ: তাদেরকে দাওয়াত দিলে তারা এমন অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়, যা অন্য কারো থেকে প্রকাশ পায়নি।

০৩. আমির ইবনে সা'সাআহ: তাদেরকে আহ্বান জানালে তাদের মধ্যকার বাইহারাহ ইবনে ফিরাস নামক এক ব্যক্তি নেতৃত্ব সম্পর্কে জানতে চায়। বলে যে, যদি আমরা আপনাকে নিয়ে বিজয়ী হই; তবে নেতৃত্ব কার হবে? রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন, আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে প্রদান করবেন। সে বললো, আমরা আপনাকে নিজেদের জানের উপর খেলে রক্ষা করবো আর নেতৃত্ব হবে অন্য কারো! এমন ধর্মের আমাদের প্রয়োজন নেই। এরপর তারা নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে একজন বৃদ্ধকে তাদের সাথে রাসূল ﷺ এর সংলাপের ঘটনা শুনালেন। তিনি তখন মাথা চাপড়ে খুব আফসোস করলেন। বললেন, ইসমাঈল আ. এর গোত্রের কারো পক্ষে মিথ্যা নবুওয়াত দাবি করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্যই সত্য নবী। তোমাদের কি বুদ্ধির খরা দেখা দিয়েছে নাকি?[১২০]

---

১১৮. ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের জুনের শেষ বা জুলাইয়ের প্রথম ভাগে

১১৯. আর-রাহীকুল মাখতূম: ১৭৬ পৃ.

১২০. ইবনে হিশাম: ১/৪২৪-৪২৫ পৃ.

শিক্ষাঃ

০১. দাওয়াত প্রদান শুধু আশপাশের মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিভিন্ন মৌসুমে, মিলনমেলায়, সভা-সেমিনারে দাঈ তার দাওয়াত পরিচালনা করেন।

০২. লোকজনের বিমুখতায় দাঈ নৈরাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করেন এবং বারবার তাদের নিকট দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

০৩. আল্লাহ তাআলা এমন কিছু লোককে তৈরি করে দেন, যারা দাঈর আদর্শ গ্রহণ করবে এবং তাঁকে রক্ষা ও সহায়তা করবে।

০৪. দুর্বলতা ও স্বল্পতার কারণে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা দুর্বলতাকে সবলতায় এবং স্বল্পতাকে আধিক্যে রূপান্তর করতে সক্ষম। তাই মুমিন ব্যক্তি নিজের চেষ্টা চালিয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা তাতে অবশ্যই বরকত দেবেন।

বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত প্রদান

বিভিন্ন গোত্রকে দাওয়াত দেওয়ার অনুরূপ রাসূল ﷺ বিশেষ কিছু ব্যক্তিকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, সুওয়াইদ ইবনে সামিত, ইয়াস ইবনে মুআয, আবু যার গিফারী, তুফাইল ইবনে আমর দাওসী, যিমাদ আযদী। তাদের সকলে ইসলাম কবুল করেন; তবে ইয়াসের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। ইবনে হিশাম বলেন, তিনি মৃত্যুর সময় তাহলীল, তাকবীর, হামদ ও তাসবীহ জপতে জপতে ইন্তেকাল করেন।

দাওয়াতের কৌশল পরিবর্তন

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষ [১২১] হাজ্বের সময় হলো। মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকজনকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপপ্রচারের যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিলো; তা

---

১২১. জুলাই ৬২০ খ্রিস্টাব্দ

এড়ানোর জন্য রাসূল ﷺ তাঁর দাওয়াতের কৌশলে পরিবর্তন আনেন। তিনি এবার দিনের পরিবর্তে রাতের অন্ধকারে বের হতেন আর বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাতায়াত করে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন।

শিক্ষা:

০১. দাওয়াতের জন্য বিচক্ষণতা ও কুরআন সুন্নাহর গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

০২. অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াতের কৌশল পরিবর্তন হতে পারে।

ইয়াসরিবের ছয়জন পুণ্যবান ব্যক্তি

এ কর্মপদ্ধতির অনুসরণে এক রাতে রাসূল ﷺ আবু বকর রাযি. ও আলী রাযি. কে সঙ্গে নিয়ে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। বনু যুহল ও বনু শায়বানের বাসস্থলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। তাদের সাড়া অনুকূল হলেও তারা কোনো সিদ্ধান্তমূলক কথা বলতে পারেনি।[১২২]

এরপর রাসূল ﷺ মিনার ঢালু ভূমি ধরে অতিক্রম করার সময় অদূরে কিছু সংখ্যক লোকের কথা শুনতে পেলেন।[১২৩] এখানে ইয়াসরিবের খাযরাজ গোত্রের ছয়জন যুবক ছিলেন। ইয়াসরিববাসী পূর্বেই ইয়াহুদীদের মাধ্যমে নবী আগমনের কথা জানতেন। ইয়াহুদীরা তাদেরকে হুমকি দিতো, শীঘ্রই একজন নবী আসবেন। যার সাথে একত্রিত হয়ে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো।[১২৪]

রাসূল ﷺ তাদের কাছে এসে তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তারা বললো, আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক। তিনি তাদের সাথে কথা বলতে চাইলেন। ফলে তারা কথা শোনার জন্য বসে পড়লেন। তিনি তাদের সামনে ইসলামের হাকীকত উপস্থাপন করলেন, তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন। ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত পেশ করলেন।

---

১২২. মুখতাসারুস সীরাহ: ১৫০-১৫২ পৃ.
১২৩. রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৮৪
১২৪. যাদুল মাআদ: ২/৫০; ইবনে হিশাম: ১/৪২৯ ও ৫৪১ পৃ.

দাওয়াত পেয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগলো, ইনি মনে হয় সেই নবী; যাঁর সম্পর্কে ইয়াহুদীরা তোমাদেরকে হুমকি দেয়। তাই ইয়াহুদীরা যেন তোমাদেরকে পেছনে ফেলতে না পারে। তারা ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এরা ছিলেন ইয়াসরিবের জ্ঞানী ব্যক্তি। তখন ইয়াসরিবে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। তারা আশা করছিলেন, ইসলামের দাওয়াতই পারে তাদের সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে। তারা তাদের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন বলে রাসূল ﷺ এর কাছে ওয়াদা করলেন। যদি এর মাধ্যমে চলমান যুদ্ধ থেমে যায়; তবে রাসূল ﷺ হবেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত। তাদের কারণে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের পয়গাম পৌঁছে গেলো।[১২৫]

শিক্ষা:

পুণ্যবান ব্যক্তিগণ খুব সহজেই দ্বীনের দাওয়াত কবুল করেন এবং মিথ্যার অন্ধকার ঝেড়ে সত্যের পথ ধরেন।

আয়েশা রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূল ﷺ এর সাথে আয়েশা রাযি. এর বিবাহ হয়। ঐ সময় আয়েশা রাযি. এর বয়স ছিলো ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাযি. স্বামীর ঘরে পদার্পণ করেন।[১২৬]

আকাবার প্রথম বাইআত

নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে হাজ্বের মৌসুমে [১২৭] ইয়াসরিব থেকে ১২ জন লোক রাসূল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হোন। তাঁদের মধ্যে গত বছর ইসলাম গ্রহণকারী ৬ জনের ৫ জন আসেন। আর বাকি ৭ জন ছিলেন নতুন।[১২৮] তাঁরা

১২৫. ইবনে হিশাম: ১/৪২৮ ও ৪৩০ পৃ.
১২৬. তালকীহুল ফুহূম: ১০ পৃ.; সহীহ বুখারী: ১/৫৫০
১২৭. ৬২১ জুলাই
১২৮. ইবনে হিশাম: ১/৪৩১-৪৩৩ পৃ.

মিনার আকাবার নিকটে রাসূল ﷺ এর সাথে একত্রিত হলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে কয়েকটি বিষয়ের উপর বাইআতবদ্ধ হোন যে, ০১. আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে অংশীদার করবে না। ০২. চুরি করবে না। ০৩. যিনা করবে না। ০৪. নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না। ০৫. হাত-পায়ের মাঝে মনগড়া অপবাদ আনবে না। ০৬. কোনো ভালো কথায় আমাকে (রাসূল ﷺ) অমান্য করবে না।

পরিশেষে রাসূল ﷺ বলেন, এ সকল কথা যাঁরা মান্য করবে; আল্লাহ তাআলা'র নিকট তাঁদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। যে অমান্য করবে ও গোপন রাখবে; আল্লাহ চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন বা ক্ষমা করে দেবেন।[১২৯]

মদীনায় ইসলাম প্রচারক দল প্রেরণ

হাজ্বের পর তাঁদের সঙ্গে ইয়াসরিবে প্রথম প্রচারক দল প্রেরণ করা হয়। যেন যাঁরা মুসলিম হয়েছেন, তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা ও দ্বীনের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেওয়া হয়। আর যেসব মুশরিক আছে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়। এর জন্য রাসূল ﷺ মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. কে মদীনায় প্রেরণ করেন।

মদীনায় আনসার হাউজ

মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. আসআদ ইবনে যুরারাহ রাযি. এর বাড়িতে থেকেই ইসলামের প্রচার কাজ চালিয়ে যান। তাঁর দাওয়াতের ফলে বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদ, খাতমা ও ওয়ায়িলের বাড়ি ব্যতীত আনসারদের এমন কোনো বাড়ি ছিলো না; যার পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হোননি।[১৩০]

শিক্ষা:

> দ্বীনের প্রচারে-প্রসারে মুহাজির এবং আনসার উভয় শ্রেণীর গুরুত্ব অপরিসীম।

---

১২৯. সহীহ বুখারী: ১/৭; ১/৫৫০-৫৫১ পৃ.; ২/১০০৩ পৃ.
১৩০. ইবনে হিশাম: ১/৪৩৫-৪৩৮ পৃ.; ২/৯০; যাদুল মাআদ: ২/৫১

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের হাজ্ব মৌসুমে[১৩১] ইয়াসরিব থেকে ৭০ জনেরও অধিক মুসলিম হাজ্ব করার উদ্দেশ্যে আসেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের মদীনার মুশরিকরাও ছিলো। তাঁরা পরস্পরে বলছিলেন, আর কত দিন রাসূল ﷺ এভাবে মক্কায় পড়ে থাকবেন? মক্কায় পৌঁছে তাঁরা রাসূল ﷺ এর সাথে গোপনে যোগাযোগ করতে থাকেন। সিদ্ধান্ত হলো, আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যদিনে তাঁরা মিনার জামরাই উলা বা আকাবার নিকটে সুড়ঙ্গে একত্রিত হবেন।[১৩২]

কা'ব ইবনে মালিক বলেন, হাজ্ব থেকে ফারেগ হওয়ার পর নির্ধারিত সময় হলো। আমাদের সঙ্গে তখন আমাদের প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম ছিলেন। তিনি তখনো মুসলমান হোননি। আমরা তাঁকে দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম কবুল করলেন। আমরা তাঁকে জানালাম, আজ রাতে রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করার কথা আছে। আমরা তাঁকে আমাদের নেতা মনোনীত করলাম।

রাতে আমরা সকলের সাথে শুয়ে পড়ি। যখন রাতের তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হলো, আমরা নিজেদের জড়োসড়ো করে বের হলাম যেভাবে পাখি তার বাসা থেকে বের হয়। শেষ পর্যন্ত সকলে গিয়ে আকাবায় মিলিত হলাম। আমরা ছিলাম মোট ৭৫ জন। ৭৩ জন পুরুষ আর বাকি ২ জন মহিলা।

আমরা সকলে সুড়ঙ্গে এসে অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত সে কাঙ্খিত মুহূর্ত এলো; রাসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন। সাথে তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। যিনি তখনো মুসলমান হোননি। তবে তিনি চাচ্ছিলেন যে, নিজ ভাতিজার এ সমস্যার সমাধানে ইতমিনান হবেন। তিনি সর্বপ্রথম কথা আরম্ভ করেন।[১৩৩]

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজ গোত্রের মাঝে

---

১৩১. জুন ৬২২ খ্রিস্টাব্দ
১৩২. দিনটি হলো: ১২ই জিলহাজ্ব
১৩৩. ইবনে হিশাম: ১/৪৪০-৪৪১ পৃ.

মান-সম্মান, শক্তি-সামর্থ্য এবং হেফাজতের সঙ্গে আছেন। কিন্তু তোমাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবার ব্যাপারে তিনি সংকল্পবদ্ধ। তোমরা যদি তাঁর কাজ-কর্মে সাহায্য প্রদান করো এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্টতা থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হও; তবে ঠিক আছে। তোমরা যে জিম্মাদারী গ্রহণ করতে যাচ্ছো, আশা করি তার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে। কিন্তু যদি এমনটি হয়, তোমরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে যাবে বা প্রয়োজনে তোমরা তাঁর কোনো কাজে আসবে না; তবে তাঁকে এখনি ছেড়ে দাও। কেননা তিনি নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে মান-সম্মান ও হেফাজতের সঙ্গে আছেন।

কা'ব ইবনে মালিক রাযি. বললেন, আমরা আপনার কথা শুনেছি। তারপর রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি কথা-বার্তা বলুন। নিজের জন্য ও নিজ প্রভুর জন্য যে চুক্তি করতে পছন্দ করেন, তা করুন।[১৩৪] এরপর রাসূল ﷺ কথা বললেন এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন।

শিক্ষা:

> সুখে-দুখে, অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নেতাকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা ঈমান ও নেতার প্রতি ভালোবাসার দাবি।

বাইআতের বিষয়সমূহ

ইমাম আহমাদ রহ. জাবির রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমরা আরজ করলাম, হে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আমরা কীসের উপর শপথ গ্রহণ করবো?

তিনি বললেন, তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে–

০১. সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় কথা শুনবে ও মেনে চলবে।

০২. স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতায় একই ধারায় ব্যয় করবে।

---

১৩৪. ইবনে হিশাম: ১/৪৪২

০৩. ভালো কাজের জন্য আদেশ করবে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে।

০৪. আল্লাহর পথে দণ্ডায়মান থাকবে এবং তাঁর ব্যাপারে কারো তিরস্কারের পরোয়া করবে না।

০৫. যখন আমি তোমাদের কাছে হিজরত করে যাবো আমাকে সাহায্য করবে। যেভাবে তোমরা নিজেদের জীবন-সম্পদ ও সন্তানদের হেফাজত করো। এসব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।[১৩৫]

কা'ব রাযি. থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূল ﷺ শেষ শর্তের কথা বললেন, তখন বারা ইবনে মা'রূর রাযি. রাসূল ﷺ এর হাত ধরে বললেন, আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণকারী সত্তার শপথ! আমরা আপনাকে সেভাবেই রক্ষা করবো। অতএব হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আমরা যুদ্ধের সন্তান এবং অস্ত্র আমাদের খেলনা।[১৩৬]

বাইআতের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর পুনঃস্মরণ

ইবনে ইসহাক বলেন, যখন লোকজন অঙ্গীকার গ্রহণ করতে একত্রিত হলেন, তখন আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাযলাহ বললেন– তোমরা কী জানো, কোন কথার উপর তোমরা অঙ্গীকার করতে যাচ্ছো? তাঁরা বললেন, জি হ্যাঁ।

তিনি তখন বলছিলেন, লাল-কালো মানুষের বিরুদ্ধে জান্নাতের বিনিময়ে তোমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছো। যদি তোমাদের মনে হয়, তোমাদের ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিহত হলে তোমরা তাঁকে ছেড়ে দেবে; তবে তা হবে তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের ধ্বংসের কারণ। আর যদি তোমরা মনে করো, তা সত্ত্বেও তোমরা এ চুক্তি সম্পন্ন করবে; তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ।

তাঁরা সমস্বরে বললেন, আমরা এসব বস্তুর বিনিময়ে তা গ্রহণ করছি। তবে হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এসবের বিনিময়ে আমাদের জন্য কী রয়েছে?

---

১৩৫. ইবনে হিশাম: ১/৪৪২
১৩৬. প্রাগুক্ত

রাসূল ﷺ বললেন– জান্নাত।

তাঁরা বললেন, তবে আপনার হাত প্রশস্ত করুন।

রাসূল ﷺ হাত প্রসারিত করে তাঁদের বাইআত গ্রহণ করলেন।[১৩৭]

জাবির রাযি. বর্ণনা করেন, যখন আমরা বাইআত গ্রহণের জন্য দাঁড়ালাম আসআদ ইবনে যুরারাহ রাযি. তখন রাসূল ﷺ এর হাত ধরে বললেন, আমরা উটের কলিজা নষ্ট করে এখানে আসলাম। এ কথা বিশ্বাস করে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আজ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ আমরা গোটা আরবের সাথে শত্রুতা শুরু করলাম। সুতরাং যদি আমরা আমাদের ধন-সম্পদ, বিশেষ ব্যক্তিদের কোরবানী মেনে নিতে প্রস্তুত হই; তাহলে আমরা অঙ্গীকার করি। তাতে তোমাদের জন্য যে পুরস্কার রয়েছে তা হলো জান্নাত। আর যদি তা না হয়; তবে এখনই বলে দাও। আর তা হবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ওজর।[১৩৮]

শিক্ষা:

০১. মুমিনগণ মিথ্যাকে ছুড়ে ফেলে সত্যকে গ্রহণ করে। এতে সমগ্র পৃথিবীও যদি তাঁদের বিরুদ্ধে চলে যায়; তবুও তাঁরা পরোয়া করে না। বরং জান-মালের বিনিময়ে জান্নাতের আশায় তাঁরা তা উৎসর্গ করে দেয়।

০২. ঈমানের দাবি কী?– তা জেনে-বুঝেই সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম কবুল করেছিলেন। অথচ আজকের অধিকাংশ মুসলিম নিজেকে ঈমানদার পরিচয় দেয় বটে; কিন্তু মোটেই জানে না, ঈমানের দাবি কী?

বাইআতের পূর্ণতা

উপস্থিত লোকজন সমস্বরে বলে উঠলেন, আসআদ ইবনে যুরারাহ! নিজ হাত হটাও। আমরা এ অঙ্গীকার ছাড়তে পারি না বা ভঙ্গ করতে পারি না।[১৩৯] আসআদ ইবনে যুরারাহ জেনে নিলেন যে, আনসারগণ রাসূল ﷺ এর

১৩৭. ইবনে হিশাম: ১/৪৪৬
১৩৮. মুসনাদে আহমাদ
১৩৯. প্রাগুক্ত

জন্য যে কোনো কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। মূলত তিনি ছিলেন মুসআব ইবনে উমায়েরের সাথে মদীনায় ইসলামের প্রচারক। সে অর্থে তাঁকে বলা যায় মদীনার মুসলিমদের নেতা।

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূল ﷺ এর সাথে হাত মিলিয়ে সর্বপ্রথম অঙ্গীকার করেন আসআদ ইবনে যুরারাহ রাযি.। [১৪০] এরপর সাহাবায়ে কেরাম একে একে দাঁড়ালেন এবং রাসূল ﷺ এর হাতে বাইআত হলেন। রাসূল ﷺ তাঁদের জন্য এর বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।[১৪১]

আর অবশিষ্ট দু'জন মহিলাকে রাসূল ﷺ মৌখিকভাবে বাইআত করেন।[১৪২] অঙ্গীকার পর্ব শেষ হলে তাঁর আদেশে খাযরাজ গোত্র থেকে ৩ জন ও আউস গোত্র থেকে ৩ জন; মোট ১২ জন নেতা নির্বাচন করা হয়। রাসূল ﷺ পুনরায় তাঁদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন।[১৪৩]

চুক্তির কথা ফাঁস

অঙ্গীকারের একেবারে শেষ মুহূর্তে শয়তান এ ব্যাপারে জানতে পারে। যেহেতু তার হাতে এতটুকু সময় ছিলো না যে, সে কুরাইশদের বলে আসবে। তাই সে সেখান থেকে চিৎকার দিয়ে বললো, মুহাম্মাদ কে দেখো। তাঁর সাথে বেদ্বীনরা একত্রিত হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তারা এখানে একত্রিত হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এ হচ্ছে সুড়ঙ্গের শয়তান। হে আল্লাহর দুশমন! শীঘ্রই আমি তোর বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়ছি। এরপর তিনি সকলকে নিজ নিজ স্থানে চলে যেতে বললেন।

আনসারদের অবস্থান

শয়তানের কথা শুনে আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাযলাহ রাসূল ﷺ কে বললেন, আপনি যদি চান তবে কালই আমরা মিনাবাসীর উপর আক্রমণ চালাই। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে এ বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়নি।

---

১৪০. ইবনে হিশাম: ১/৪৪৭
১৪১. মুসনাদে আহমাদ
১৪২. সহীহ মুসলিম: ২/১৩১
১৪৩. ইবনে হিশাম: ১/৪৪৩-৪৪৬ পৃ.

তাই আপনারা নিজ নিজ জায়গায় চলে যান। আর গিয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর এভাবেই সকাল হয়ে গেলো।[১৪৪]

ইয়াসরিবের নেতাদের সামনে কুরাইশ মুশরিকদের গমন

কুরাইশরা এ বাইআতের বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলো। তারা ইয়াসরিবের নেতাদের সামনে গিয়ে এ ব্যাপারে জানতে চাইলো। কিন্তু যেহেতু তারা এ ব্যাপারে জানতো না; তাই তারা কিছুই বলতে পারলো না। সবশেষে তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর কাছে আসলো। সে বললো, এটা একেবারেই বাজে কথা। আমার অগোচরে আমার গোত্রের লোকেরা এমন কাজ করতেই পারে না। যদি আমি ইয়াসরিবে থাকতাম; তবুও তারা আমার সাথে পরামর্শ না করে এ কাজ করতো না।

আর মুসলিমগণ সবাই চুপচাপ রইলেন। হ্যাঁ বা না কোনো কিছুই বললেন না। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের ধারণা হলো যে, বাইআত না হওয়ার ঘটনাই সত্য। তাই তারা সেখান থেকে নৈরাশ হয়ে চলে এলো।[১৪৫]

সংবাদের সত্যতা জ্ঞাত হওয়া ও বাইআত গ্রহণকারীদের পশ্চাদ্ধাবন

যখন তারা এ বিষয়ে জানতে পারলো, ততক্ষণে হাজ্বীগণ ও আনসারগণ ইয়াসরিবের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়। মক্কাবাসীরা দ্রুত অগ্রসর হলেও তাঁদের ধরতে পারলো না। তবে সা'দ ইবনে উবাদাহ ও মুনযির ইবনে আমর কে তারা দেখে ফেলে। মুনযির রাযি. দ্রুততার সাথে চলে যান, ফলে তিনি বেঁচে যান। আর সা'দ রাযি. তাদের হাতে ধরা পড়লে তাঁকে কষ্ট দিতে দিতে মক্কায় আনা হয়। কিন্তু মুতইম ইবনে আদী ও হারিস ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া এসে তাঁকে ছাড়িয়ে দেন। কারণ, তাদের দু'জনের বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পথে চলার সময় তাঁদের নিরাপত্তায় চলতো।

এদিকে আনসারগণ তাঁকে মুক্ত করার ব্যাপারে পরামর্শ করছিলেন। ইতোমধ্যে দেখা গেলো, তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের নিকট ফিরে এসেছেন। এরপর সকলেই নিরাপদে ইয়াসরিবে চলে এলেন।[১৪৬]

---

১৪৪. ইবনে হিশাম: ১/৪৪৮

১৪৫. প্রাগুক্ত

১৪৬. যাদুল মাআদ: ২/৫১; ইবনে হিশাম: ১/৪৪৮-৪৫০ পৃ.

মদীনায় হিজরতের প্রথম দল

রাসূল ﷺ মুসলিমদেরকে এ নতুন দেশে হিজরত করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। হিজরতের অর্থ হলো, সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পদ সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষা করা। অধিকন্তু পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিপদাপদে ভরা।

মুসলিমগণ এসব বিষয় জেনেশুনে হিজরত শুরু করেন। মুশরিকরা সামনে তাদের বিপদ আছে বুঝতে পেরে, এখনই এ হিজরত ঠেকানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে। নিম্নে হিজরতের কয়েকটি নমুনা পাঠকগণের সামনে পেশ করা হলো–

০১. সর্বপ্রথম মুহাজির ছিলেন আবু সালামাহ রাযি.। ইবনে ইসহাকের মতে তিনি আকাবার বড় শপথের আগেই হিজরত করেন। সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু যখন তিনি যাত্রা করতে চাইলেন। তাঁর শ্বশুরপক্ষের লোকজন বললো, তোমার ব্যাপারে তুমি আমাদের উপর জয়ী হলে। তবে আমাদের মেয়েকে তোমার সঙ্গে শহরের পর শহর ঘুরতে দিতে পারি না। এ বলে তারা আবু সালামাহ'র স্ত্রীকে নিয়ে গেলো। অপরদিকে এতে করে আবু সালামাহ'র আত্মীয়রা রাগান্বিত হয়ে বললো, তোমরা যখন এ মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছো। তবে আমরাও আমাদের সন্তানকে তোমাদের সাথে যেতে দিতে পারি না। এ বলে তারা সন্তানটিকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে; ফলে তার এক হাত ছুটে আসে। এমন সময় আবু সালামাহকে মদীনায় একাকীই যেতে হয়।

এরপর উম্মে সালামাহ'র এমন অবস্থা হয় যে, প্রত্যেক দিন তিনি আবতাহ: যেখানে এ বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে, সেখানে আসতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতেন। এ অবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হলো। তার এ অবস্থা দেখে এক আত্মীয়ের দয়া হলো, বললো, কেন একে যেতে দিচ্ছো না? অযথা কেন তাঁকে তাঁর স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছো?

এ কথার প্রেক্ষিতে আত্মীয়রা তাঁকে বললো, তুমি চাইলে যেতে পারো। তখন উম্মে সালামাহ তাঁর সন্তানকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তানঈম গিয়ে পৌঁছলে উসমান ইবনে তালহার সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁকে আবু সালামাহ যে গ্রামে বাস করতেন সেখান পর্যন্ত পৌঁছে দেন।[১৪৭]

---

১৪৭. ইবনে হিশাম: ১/৪৬৮-৪৭০ পৃ.

০২. সুহাইব ইবনে সিনান রুমী রাযি. রাসূল ﷺ এর পর হিজরত করেন। যখন তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। কুরাইশরা তাঁর পথ রোধ করে। তারা বললো, তুমি আমাদের এখানে এসেছিলে ভিক্ষুক হিসেবে আর এখন তুমি নিজ সম্পদ নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে চাও? তিনি বললেন, যদি তোমাদেরকে এগুলো দিয়ে দিই; তবে কি আমাকে যেতে দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তিনি নিজ ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে হিজরত করলেন। রাসূল ﷺ যখন এ সম্পর্কে জানতে পারলেন, তিনি বললেন– সুহাইব লাভবান হয়েছেন, সুহাইব লাভবান হয়েছেন।[১৪৮]

০৩. উমর ইবনে খাত্তাব, আইয়াশ ইবনে আবী রবীআহ, হিশাম ইবনে আস ইবনে ওয়ায়িল রাযি. নিজেদের মধ্যে এটা স্থির করেন যে, তাঁরা সারিফ এর তানাযুব স্থানে খুব সকালে একত্রিত হয়ে সেখান থেকে মদীনা হিজরত করবেন। পরে হিশাম বন্দী হোন।

উমর ও আইয়াশ রাযি. যখন মদীনার কুবাতে অবতরণ করেন তখন আইয়াশের ভাই আবু জাহেল ও হারিস এসে উপস্থিত হয়। তাঁকে না দেখা পর্যন্ত তার মা চুল আঁচড়াবে না ও রোদ ছেড়ে ছায়ায় আসবে না বলে মানত করেছে। তাদের কথায় আইয়াশ রাযি. গলে যান এবং উমর রাযি. নিষেধ করা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে তারা হীন কৌশলে আইয়াশকে বন্দী করে ফেললো।

পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূলের আদেশে ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. তাঁদের দু'জনকে বন্দীদশা থেকে ছাড়িয়ে আনেন।[১৪৯]

মুশরিকদের শত বাধা সত্ত্বেও আকাবার শপথের পর মাত্র দু'মাসের মধ্যে রাসূল ﷺ, আবু বকর রাযি. ও আলী রাযি. ব্যতীত আর কোনো সাহাবীই মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন না। তবে এমন কিছু সাহাবা অবশিষ্ট ছিলেন যাদেরকে মুশরিকরা আটকে রেখেছিলো। আবু বকর রাযি.ও মদীনায় হিজরতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।[১৫০] রাসূল ﷺ তাঁকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বললেন। যেন তাঁরা দু'জন এক সাথে যেতে পারেন।[১৫১]

---

১৪৮. ইবনে হিশাম: ১/৪৭৭
১৪৯. ইবনে হিশাম: ১/৪৭৪-৪৭৬ পৃ.
১৫০. যাদুল মাআদ: ২/৫২
১৫১. সহীহ বুখারী: ১/৫৩৩

শিক্ষাঃ

মুমিন ব্যক্তি তাঁর দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে আপন মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে অন্যত্র হিজরত করেন।

দারুন নাদওয়াতে কুরাইশদের চক্রান্ত

মুশরিকদের মূর্তিপূজা, সামাজিক ঐক্যবদ্ধতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামনে হিজরত ছিলো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তারা জানতো মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মধ্যে কীরকম নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি আছে। আর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে রয়েছে তাঁকে অনুসরণ করার অদম্য আকাঙ্খা। তাঁরা যদি ইয়াসরিবের কর্তৃত্ব পেয়ে যায়; তবে তা হবে মূর্তিপূজকদের জন্য বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ, ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে তাদের ব্যবসার জাতীয় সড়ক। তাদেরকে সব সময় এ পথকে নিরাপদ রাখতে হবে। যদি মুসলিমগণ সেখানে ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলে; তবে তাঁরা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

আকাবার দ্বিতীয় শপথের আনুমানিক আড়াই মাস পর নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের ২৬ শে সফর[১৫২] বৃহস্পতিবার দারুন নাদওয়াতে কুরাইশ মুশরিকরা ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য কাজের চক্রান্ত করতে বসে। যার বিষয় ছিলো ইসলামকে মূল থেকে উৎপাটন করে ফেলা।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যখন তাদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা আঁকতে দারুন নাদওয়া (কুরাইশদের সংসদে) পৌঁছলো, তখন ইবলীস সম্ভ্রান্ত এক পণ্ডিতের বেশে উপস্থিত হলো। নিজেকে সে নাজদের শায়খ বলে পরিচয় দেয়।

শিক্ষাঃ

ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সর্বযুগেই কাফেররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র করে। ঐ সময়কার কাফেরদের দারুন নাদওয়া সংসদের বর্তমান রূপ হলো জাতিসংঘ নামক কুফফার সংঘসহ তাগুত-কাফেরদের নব্য সংসদ-পার্লামেন্ট।

---

১৫২. মোতাবেক ১২ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দ

চক্রান্তের বিস্তারিত ঘটনা

প্রথমে আবুল আসওয়াদ বললো, আমরা তাঁকে এ শহর থেকে বের করে দেই। তারপর তাঁর সাথে আমাদের সাথে কোনই সম্পর্ক থাকবে না। ফলে এ শহর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। কিন্তু শায়খ নাজদী এই বলে বাঁধ সাধলো, শহর থেকে বের করে দিলে সে কোনো আরব গোত্রে আশ্রয় নেবে এবং পরে তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। তোমরা অন্য চিন্তা করো।

আবুল বুখতারী বললো, তাঁকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো। তার উপর দরজা বন্ধ করে দাও। এভাবে না খেয়ে সে মারা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। শায়খ নাজদী বললো, এভাবে তাঁর খবর তাঁর অনুসারীদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাঁরা তখন হামলা চালিয়ে তাঁকে মুক্ত করে নেবে। অন্য চিন্তা করো।

শয়তান (আল্লাহ তাকে আরও অপদস্থ করুক) চাচ্ছিলো আরও খারাপ কিছু। এবার তার দোসর আবু জাহেল মুখ খুললো; যে মুখ থেকে ভালো খবর আশা করা যায় না। সে বললো, আমার প্রস্তাব হলো প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সুঠাম দেহবিশিষ্ট যুবক নির্বাচন করে তাদের হাতে ধারালো তলোয়ার দেওয়া হবে। তারা প্রত্যেকে এক সঙ্গে তলোয়ার মেরে তাঁকে হত্যা করবে। আর বনু আবদে মানাফ সকলের সাথে যুদ্ধ করে পারবে না। তাই তারা দিয়াতে রাজি হয়ে যাবে।

শায়খ নাজদী তার কথায় খুশি হয়ে বললো, "এটিই সবচেয়ে অগ্রগণ্য চিন্তা। যা সমর্থনের যোগ্য।" এভাবে চক্রান্ত স্থির করার পর সবাই তা বাস্তবায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রাসূল ﷺ এর হিজরত

রাসূল ﷺ এর দাওয়াতী কাজ বন্ধ করতে না পেরে মক্কার পাপিষ্ঠ কুফফাররা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এমন-ই সময় জিবরাঈল আ. মহান প্রভুর বাণী নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কুরাইশদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, আপনার প্রভু মক্কা থেকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেছেন। জিবরাঈল আ. তাঁকে হিজরতের সময় নির্ধারণ করে দেন এবং কুরাইশদের কীভাবে প্রতিহত করতে হবে,

তাও বলে দেন। এ কথাও বলে দেন যে, আপনি আজ রাতে আপনার শয্যায় শয়ন করবেন না।[১৫৩]

হিজরতের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ ঠিক দুপুরে লোকজন যখন বাড়িতে বিশ্রাম নেয়, তখন আবু বকর রাযি. এর গৃহে তাশরীফ এনে তাঁকে হিজরতের আদেশের কথা জানান। অতঃপর হিজরতের সময় নির্ধারণ করে রাসূল ﷺ আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাতের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর প্রস্তুতির ব্যাপারে কেউ কিছুই জানলো না।

শিক্ষা:

০১. দ্বীনের বাতিকে নিষ্প্রভ করতে কাফেররা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে সর্বোপায়ে অপচেষ্টা চালাতে থাকে। নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য যে কোনো ধরনের জঘন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এমনকি দাঈকে হত্যার জন্যও উদ্যত হতে পারে।

০২.উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এমনভাবে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে; যেন শত্রুপক্ষ কিছুতেই টের না পায়।

রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও

কাফেররা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১১ জন পাপিষ্ঠের একটি দলকে রাসূল ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও করার জন্য নির্বাচন করে। রাসূল ﷺ আলী রাযি. কে তাঁর সবুজ হাজরামী চাদর গায়ে দিয়ে স্বীয় বিছানায় শুইয়ে দেন এবং বলেন, ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।[১৫৪]

রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হওয়ার পর তারা রাসূল ﷺ এর বাড়িতে হাজির হয় এবং তাঁকে আটকানোর জন্য তাঁর গৃহের দরজায় অবস্থান নেয়।[১৫৫]

১৫৩.[২] ইবনে হিশাম: ১/৪৮২
১৫৪. ইবনে হিশাম: ৪৮২-৪৮৩ পৃ.
১৫৫. যাদুল মাআদ: ২/৫২

হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসূলের গৃহ ত্যাগ

এমন এক কঠিন মুহূর্তে রাসূল ﷺ মুশরিকদের কাতার ফেঁড়ে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছিটিয়ে দিলেন। এতে করে তারা রাসূল ﷺ কে আর দেখতে পেলো না। তখন তিনি এ আয়াতে কারীমা পাঠ করেছিলেন–

﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

"আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।"[১৫৬]

এরপর রাসূল ﷺ আবু বকর রাযি. কে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা শুরু করে রাতের আঁধারেই সাওর নামক পর্বত গুহায় পৌঁছলেন।[১৫৭] অপরদিকে কাফেররা রাত বারোটার অপেক্ষা করছিলো। তার আগেই তাদের নিকট তাদের ব্যর্থতার সংবাদ পৌঁছে গেলো। তারা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে রাসূল ﷺ কে দেখতে না পেয়ে সকাল পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলো এবং তথায় আলী রাযি. কে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মুহাম্মাদ (ﷺ) কোথায়? আলী রাযি. বললেন, আমি জানি না।

শিক্ষা:

০১. মুমিন যে কোনো কাজে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। শত্রু যেন তাঁর কোনো গোপনীয় বিষয় জানতে না পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

০২. শত্রুপক্ষের কাছে কিছুতেই তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।

---

১৫৬. সূরা ইয়াসীন: ০৯
১৫৭. ইবনে হিশাম: ১/৪৮৩

গৃহ থেকে গুহার পথে

রাসূল ﷺ ২৭ শে সফর নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছর মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ কিংবা ১৩ই সেপ্টেম্বর[১৫৮] মধ্যরাতের কিছু সময় পর নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে আবু বকর রাযি. এর গৃহে গমন করেন। সেখান থেকে পেছনের একটি জানালা দিয়ে আবু বকর রাযি. কে সাথে নিয়ে রাতের আঁধারে মদীনার পথ না ধরে উল্টো পথে উত্তর দিকে ইয়ামানের পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। এ পথে তিনি পাঁচ মাইল অতিক্রম করে ঐতিহাসিক সাওর পর্বতে আরোহণ করেন। এ গুহায় আরোহণের পথ খুবই কষ্টসাধ্য ছিলো। তিনি পদচিহ্ন গোপন করার জন্য আঙ্গুলের উপর ভর করে হাঁটছিলেন। এতে করে তাঁর পা মোবারক জখম হয়ে যায়। ইতিহাসে এটিই গারে সাওর নামে পরিচিত।[১৫৯]

শিক্ষা:

একজন আদর্শ নেতাকে অনেক কৌশলী হতে হয়। যে পথে অবস্থানের ব্যাপারে শত্রু ধারণা করতে পারে, তার বিপরীতে গিয়ে অন্য কোনো পথ ধরে চলাই হলো বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

গারে সাওরে প্রবেশ

প্রথমে আবু বকর রাযি. গুহায় প্রবেশ করলেন। যেন গুহা পরিষ্কার করে নিতে পারেন এবং সেখানে যদি কোনো ক্ষতিকর কিছু থাকে; তাহলে তিনি যেন তা থেকে রাসূল ﷺ কে দূরে রাখতে পারেন। তাতে কিছু গর্ত ছিলো। আবু বকর রাযি. নিজ কাপড় ছিঁড়ে সেগুলো বন্ধ করে দিলেন। কাপড়ের সংকটের দরুন দু'টো ছিদ্রে কাপড় দিতে না পারায় সেখানে থাকা কিছু বিচ্ছু আবু বকর রাযি. কে দংশন করে। অতঃপর রাসূল ﷺ আক্রান্ত স্থানে তাঁর থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলে ক্ষতস্থান ভালো হয়ে যায়। গুহায় অবস্থান কালে আবু বকর রাযি. এর পুত্র আব্দুল্লাহ রাযি. রাতে এসে দিনে মক্কায় কাফেরদের কৃত সকল

১৫৮. রাহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৯৫
১৫৯. রাহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৯৫

চক্রান্ত সম্পর্কে তাঁদেরকে অবগত করতেন। এভাবে তাঁরা তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন।[১৬০]

শিক্ষা:

০১. নেতার জীবন রক্ষার জন্য মুমিন সকল বিপদাপদকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়।

০২. একজন আদর্শ নেতা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি শত্রুপক্ষের সকল চক্রান্ত ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর রাখেন।

কুরাইশদের হীন প্রচেষ্টা

রাসূল ﷺ কে না পেয়ে তারা হযরত আলী রাযি. কে দীর্ঘক্ষণ নির্যাতন করে[১৬১] এবং আবু বকর রাযি. কে না পেয়ে তাঁর কন্যা আসমা রাযি. এর গণ্ডদেশে আবু জাহেল সজোরে চপেটাঘাত করে।[১৬২] তারা স্বার্থসিদ্ধি করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে পড়ে। তাঁদের অনুসন্ধানের জন্য মক্কার সম্ভাব্য সকল পথে কঠোর সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে দেয়। অনুসন্ধানের একপর্যায়ে তারা রাসূল ﷺ ও আবু বকর রাযি. যে গুহায় অবস্থান করছিলেন, সে গুহার অতি নিকটে পৌঁছে গেলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুমিনদের হেফাজত করার ব্যাপারে আপন সিদ্ধান্তে অটল। রাসূল ﷺ ও কাফেরদের মাঝে মাত্র কয়েক ফুট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁদের দেখতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা:

মুমিন সর্বদা আল্লাহর হেফাজতে থাকে। তাই কেউ চাইলেই তাঁর ক্ষতি করতে পারে না।

---

১৬০. ফাতহুল বারী: ৭/৩৩৬
১৬১. রাহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৯৬
১৬২. ইবনে হিশাম: ১/৪৮৭

মদীনার পথে

তিন দিন যাবৎ খোঁজাখুঁজির পর কুরাইশদের ক্রোধাগ্নি কিছুটা প্রশমিত হলে রাসূল ﷺ ও আবু বকর রাযি. মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পূর্বেই আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত লাইসি'র (তিনি তখনো মুশরিক থাকলেও পথ প্রদর্শক হিসেবে তার উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিলো না) সাথে মজুরির বিনিময়ে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য চুক্তি হয়েছে এবং তার নিকট দু'টি বাহনও রাখা হয়েছে। তিনি মদীনা যাওয়ার সাধারণ পথ না ধরে প্রথমে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরে যাত্রা শুরু করেন। এভাবে একপর্যায়ে তাঁরা কুবা গিয়ে উপনীত হোন।[১৬৩]

হিজরতের পথে ঘটিত কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা

এ মোবারক সফরকালে কিছু স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিলো। তার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো।

০১. এ যাত্রাকালে রাসূল ﷺ উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁর নিকট কিছু খাবার চেয়েছিলেন। কিছু না থাকায় তার অনুমতিক্রমে রাসূল ﷺ তার একটি দুধশূন্য বকরী থেকে দুধ দোহন করেছেন। সকলে তা থেকে তৃপ্তিসহকারে পান করার পর সেই বকরী থেকে পুনরায় দুধ দোহন করা হয়। এ দুধ উম্মু মা'বাদের নিকট রেখে দিয়ে তিনি সঙ্গীদের সাথে নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন।

০২. সুরাকাহ ইবনে মালিক রাসূল ﷺ এর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে তার ঘোড়ার পা মাটিতে ঢুকে পড়েছিলো। এ অবস্থায় তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট নিরাপত্তা চাইলে রাসূল ﷺ তাকে নিরাপত্তা দেন। অতঃপর সে মক্কায় এসে দেখে যে, লোকজন তাঁদের অনুসন্ধান করছে। এ দেখে সুরাকাহ বললো, তোমরা এদিকে খোঁজাখুঁজি করো না। আমি এদিকে দেখেছি। এভাবেই দিনের প্রথমাংশে পিছু ধাওয়াকারী শত্রু দিনের শেষ ভাগে জীবন রক্ষাকারী বন্ধু হয়ে গিয়েছে।[১৬৪]

---

১৬৩. ইবনে হিশাম: ১/৪৯১-৪৯২ পৃ.
১৬৪. যাদুল মাআদ: ২/৫৩

শিক্ষাঃ

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে যে কোনোভাবে হেফাজত করেন। শত্রুর মাধ্যমে হলেও।

কুবাতে আগমন

অবশেষে নানা বাধা-বিপত্তি অতিবাহিত করে রাসূল ﷺ ৮ই রবিউল আউয়াল, নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছর মোতাবেক ২৩ শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে কুবায় এসে উপনীত হোন।[১৬৫] এ সময় তাঁর বয়স বরাবর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো। মক্কা থেকে রাসূল ﷺ এর রওয়ানার সংবাদ শুনে মদীনাবাসীগণ প্রত্যহ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাঁর পথ চেয়ে থাকতেন। একদিন তারা ফিরে যাওয়ার পর এক ইয়াহুদী তার কোনো কাজে একটি ঢিবির উপর আরোহণ করলো। তখন সে রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখতে পেয়ে মদীনাবাসীদের মাঝে এ সংবাদ ঘোষণা করে দিলো। তার ঘোষণা শুনে সকলে রাসূল ﷺ কে স্বাগত জানানোর জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমবেত হলো। রাসূল ﷺ কুলসূম ইবনে হাদম এর বাড়িতে অবস্থান করলেন।[১৬৬] সে সময়টা ছিলো রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। তিনি কুবায় চার দিন অবস্থান করেন।[১৬৭] এদিকে আলী রাযি. মক্কায় রাসূল ﷺ এর নিকট রাখা মানুষের আমানত বুঝিয়ে দিয়ে তিনিও এসে কুবায় তাঁর এর সাথে মিলিত হোন। পঞ্চম দিনে রাসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশে আরোহণ করেন। অতঃপর তাঁর মামাগোষ্ঠী বনু নাজ্জারদের সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা শুরু করেন। পথিমধ্যে জুমার নামাজের সময় হলে তিনি বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে জুমার নামাজ পড়েন। সেখানে মোট একশ' লোক ছিলো।[১৬৮]

---

১৬৫. রাহমাতুল্লিল আলামীন: ১/১০২
১৬৬. যাদুল মাআদ: ২/৫৪; ইবনে হিশাম: ১/৪৯৩; রাহমাতুল্লিল আলামীন: ১/১০২
১৬৭. ইবনে হিশাম: ১/৪৯৪
১৬৮. সহীহ বুখারী: ১/৪৫৫-৪৬০ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/৫৫; ইবনে হিশাম: ১/৪৯৪; রাহমাতুল্লিল আলামীন: ১/১০২

মদীনায় প্রবেশ

জুমার নামাজ শেষে রাসূল ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐদিন থেকেই এ শহরের নাম ইয়াসরিবের পরিবর্তে মদীনাতুর রাসূল বা রাসূলের শহর নামে পরিচিতি লাভ করে। সেদিনটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দিবস। মদীনার অলিতে গলিতে সর্বত্র তাক্বদীস ও তাহমীদের গুঞ্জন ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিলো। আনসারদের ছেলে-মেয়েরা আনন্দ-উদ্বেল এর সাথে সুকণ্ঠে কবিতার এ চরণগুলি আবৃতি করছিলো–

طلع البدر علينا ** من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع
أيها المبعوث فينا ** جئت بالأمر المطاع

"সানায়াতুল অদা' থেকে আমাদের উপর পূর্নিমার চাঁদ উদিত হলো।

আহ্বানকারীগণ যতক্ষণ আল্লাহ কে ডাকবেন, আমাদের উপর দায়িত্ব হলো শুকরিয়া আদায় করা।

হে আমাদের মাঝে আগত দ্বীনপ্রচারক! আপনি এমন দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন যা অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য।"

আনসারগণ যদিও সকলে ধনী ছিলেন না; তবুও সবাই চাচ্ছিলেন যে, রাসূল ﷺ যেন তাঁর বাড়িতেই অবস্থান করেন। তাই প্রত্যেকে অনুরোধ করছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর বাড়িতে অবস্থান নেন। ফলে রাসূল ﷺ তাঁর উটনীকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। অবশেষে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. এর বাড়িতে উটনী থেমে যায়। এবং তিনিই এ সৌভাগ্য অর্জন করেন।

শিক্ষা:

০১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর নৈকট্যের আশা ও আনুগত্য এবং নেক আমলের উপর মুমিন তাঁর ভিত্তি স্থাপন করে থাকে। ফলে তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে থাকে।

০২. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব এবং ঈমানের তাগিদেই গড়ে উঠে মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক। ভ্রাতৃত্বের এ বীজ থেকেই তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর বিধান কায়েমে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে।

০৩. "সকল মুমিন এক দেহের মতো" এই অনুভূতির কারণে একজন মুমিন অপর মুমিন ভাইকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। একে অপরের সাথে সদাচরণ করে থাকে।

মদীনায় অবস্থানকাল

মদীনায় অবস্থানকালের স্তরসমূহ: রাসূল ﷺ এর মদীনায় অবস্থানকালকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

০১. প্রথম পর্যায়: এ সময় মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। হিজরতের পর থেকে ষষ্ঠ হিজরীর যুল কা'দাহ মাসের হুদায়বিয়া সন্ধি পর্যন্ত এর পরিব্যাপ্তি।

০২. দ্বিতীয় পর্যায়: এ সময় সন্ধি স্থাপিত হয়। বিভিন্ন বাদশাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করা হয়। এটি হুদায়বিয়ার সন্ধিকাল থেকে নিয়ে অষ্টম হিজরীর মক্কা বিজয় পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিলো।

০৩. তৃতীয় পর্যায়: এ সময় বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করেন। বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণ মদীনায় আগমন করেন। একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল পর্যন্ত এ পর্যায়ের সময়কাল।

মদীনায় বসবাসরত অধিবাসীগণ

মদীনায় বসবাসরত অধিবাসীদেরকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

০১. মুসলিম: যাঁরা ছিলেন রাসূল ﷺ এর একনিষ্ঠ অনুসারী নিষ্ঠাবান একদল জানবাজ সাহাবা। যাঁরা আনসার ও মুহাজির দু'ভাগে পরিচিত ছিলেন।

০২. ইয়াহুদী গোষ্ঠী: ইয়াসরিবের ইয়াহুদী গোষ্ঠী তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিলো।

ক. বনু কাইনুকা': এরা ছিলো খাযরাজের মিত্র। মদীনার মধ্যেই ছিলো এদের আবাস।

খ. বনু নাযীর: এরা খাযরাজের মিত্র। এদের আবাসস্থল ছিলো মদীনার উপান্তে।

গ. বনু কুরাইযাহ: এ গোত্র ছিলো আউসের মিত্র। এদের আবাস ছিলো মদীনার উপকণ্ঠে।

এ গোষ্ঠীটি আসমানী কিতাবের মাধ্যমে রাসূলের আগমন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু নিজেদের একগুঁয়েমির কারণে তাদের ভাগ্যে ঈমান জোটেনি। উল্টো তারা রাসূল ﷺ এর সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়।

০৩. মুশরিক শ্রেণী: এদের মধ্যে মোটামুটি দু'শ্রেণীর লোক ছিলো। একদল ধীরে ধীরে মুসলমান হয়ে যায়। অপরদল মুনাফিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রথম পর্যায়
নতুন রাষ্ট্র গঠন

একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাসূল ﷺ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নিম্নে এর বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

মাসজিদুন নাববী নির্মাণ

মদীনায় আগমনের পর রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম মাসজিদ নির্মাণ করেন। এর আগে যেখানেই সুযোগ হতো সেখানেই নামাজ আদায় করা হতো। হিজরতের সময় রাসূল ﷺ এর উষ্ট্রিটি যে জায়গায় এসে বসে ছিলো, সে জায়গাতে মাসজিদ নির্মাণ করা হয়। জায়গাটি ছিলো দু'জন অনাথ বালকের। তাদেরকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে জায়গাটি কিনে নেওয়া হয়। রাসূল ﷺ স্বয়ং নির্মাণ কাজে অংশ নেন। তিনি ইট ও পাথর বহন করছিলেন আর বলছিলেন–

اللَّهُمَّ لا عيش إلا عيش الآخرة ** فاغفر للأنصار والمهاجرة

"হে আল্লাহ! জীবন তো কেবল পরকালের জীবন। তাই আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।"

মাসজিদে নাববীর কার্যক্রম

মাসজিদে নাববীর কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো–

০১. এটি ছিলো নামাজ আদায়ের স্থান ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

০২. এখানেই রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ পরিচালনার পরামর্শ করা হতো।

০৩. এটিই ছিলো সৈন্য পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকে গযওয়া ও সারিয়াগুলো যাত্রা করতো।

০৪. এটি অনেক নিবেদিত সাহাবীর আবাসস্থল ছিলো।[১৬৯]

---

১৬৯. সহীহ বুখারী: ১/১৭০ (৪৩১ নং হাদীস)

০৫. এটি ছিলো বিভিন্ন দূত ও প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানোর স্থল।
০৬. এখানে আহতদের চিকিৎসা করা হতো।[১৭০]

শিক্ষাঃ

মুসলিমদের মাসজিদ তাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্য পরিচালনার কেন্দ্র।

আযান ব্যবস্থা

হিজরতের প্রথম দিকেই আযান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহী রাযি. স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের শব্দগুলো শুনেন। অতঃপর তিনি তা রাসূল ﷺ এর কাছে পেশ করেন। তাছাড়া উমর রাযি.ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন। আর তা রাসূল ﷺ এর কাছে পেশ করেন। তারপর সে অনুযায়ী আযান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

রাসূল ﷺ আনাস ইবনে মালিকের ঘরে মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। এ ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মূল লক্ষ্য ছিলো–

ক. তাদের মাঝে পারস্পরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলা।
খ. মৃত্যুর পর একজন আরেকজনের ওয়ারিস হওয়া।[১৭১]

তবে তা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিলো; তারপর এ আয়াত নাযিল হলো–

﴿ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾

“কিন্তু (আল্লাহর বিধানে) রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পর পরস্পরের নিকট অগ্রগণ্য।[১৭২]

---

১৭০. সহীহ বুখারী: ১/১৭৭ (৪৫১ নং হাদীস)
১৭১. সহীহ বুখারী: ৪/১৬৭১ (৪৩০৪ নং হাদীস)
১৭২. সূরা আনফাল: ৭৫

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরের একটি ঘটনা। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও সা'দ ইবনে রাবী' রাযি. এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়েছিলো। সা'দ রাযি. আব্দুর রহমান রাযি. কে বললেন, আমি আনসারদের মাঝে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদ থেকে অর্ধেক গ্রহণ করুন। তাছাড়া আমার দু'জন স্ত্রী আছে। দু'জনের মধ্যে আপনার যাকে পছন্দ হয়, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো। ইদ্দতের পর আপনি তাকে বিবাহ করবেন। এ কথা শুনে আব্দুর রহমান রাযি. তাঁর জন্য দুআ করলেন। তারপর তিনি তাঁকে বাজারের কথা জিজ্ঞেস করলেন। সা'দ রাযি. তাঁকে বনু কাইনুকা'র বাজারটি দেখিয়ে দিলেন। তিনি যখন বাজার থেকে ফিরলেন, তাঁর সাথে অতিরিক্ত কিছু পনির ও ঘি ছিলো। এরপর তিনি প্রতিদিন বাজারে যেতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একদিন রাসূল ﷺ তাঁর হাতে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখলেন। জানতে চাইলে তিনি বললেন, তিনি বিবাহ করেছেন। রাসূল ﷺ বললেন, স্ত্রীকে মোহর দিয়েছো তো? তিনি বললেন, একটি খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।[১৭৩]

শিক্ষা:

ঈমানী ভ্রাতৃত্ব রক্তের বা বংশীয় ভ্রাতৃত্বের চেয়ে অনেক মজবুত হয়ে থাকে। প্রকৃত ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবি হলো, এক ভাই অপর ভাইয়ের জন্য নিজের যে কোনো মূল্যবান জিনিস কোরবান করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

মুহাজির, আনসার ও ইয়াহুদীদের মাঝে চুক্তিপত্র

রাসূল ﷺ মুহাজির, আনসার ও ইয়াহুদীদের মাঝে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন।

০১. সকল মুহাজির ও আনসার পরস্পর ভাই ভাই।
০২. যারা শত্রুতা, অন্যায়-অত্যাচার, মুমিনদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কিংবা সীমালঙ্ঘন করবে; তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৭৩. সহীহ বুখারী: ১/৩৫৫

০৩. কোনো কাফেরের মোকাবেলায় একজন মুমিন অপর মুমিনকে হত্যা করতে পারবে না, কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কাফেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

০৪. দ্বীনের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলাকারীকে আশ্রয়দান ও সাহায্য করা মুমিনের জন্য বৈধ নয়। যে এমনটি করবে, কিয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হবে। তার থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

০৫. প্রত্যেক বিষয়ের ফায়সালা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরবে। যদি মুমিনদের মাঝে কোনো নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে অথবা কলহে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে; তাহলে এর ফায়সালাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই ফিরবে।

০৬. ইয়াহুদী ও মুসলিমগণ প্রত্যেকে নিজেদের ব্যয়ভার বহন করবে। এ চুক্তিনামায় সাক্ষরকারীদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হলে একে অপরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে।

০৭. কুরাইশ এবং তাদের সাহায্যকারীদেরকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। মদীনায় যারা আক্রমণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে সকলেই পরস্পরকে সহায়তা করবে।

মোট কথা, রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন এক জাতিতে পরিণত করেন, যে জাতি অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। মানবজাতিকে শান্তির পথ দেখায়। তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে আনার জোর প্রচেষ্টা চালায়।

শিক্ষা:

০১. রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য রাষ্ট্রে অবস্থানরত অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন চুক্তি স্থির করা যায়।

০২. কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফের-মুশরিককে সাহায্য-সহযোগিতা, আশ্রয়দান করা কিছুতেই বৈধ নয়।

অস্ত্রের ঝনঝনানি

মুসলিমগণ যখন মক্কায় ছিলেন, তখন তাঁদের উপর মুশরিকরা নির্যাতনের ষোলকলা পূর্ণ করে। কিন্তু মদীনায় আসার পর মুসলিমগণ তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে চলে যায়। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় ও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করা দেখে মুশরিকদের ক্রোধ অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট একটি ধমকি পত্র প্রেরণ করে। সেখানে উল্লেখ ছিলো, তোমরা বিপথগামী লোকদের আশ্রয় দিয়েছো। হয় তোমরা তাঁদেরকে বহিষ্কার করবে; না হয় আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করবো ও মহিলাদের মানহানি করবো।[১৭৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তখনো ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়নি। সে মদীনার কিছু অধিবাসীকে নিয়ে কুরাইশদের কথামতো কিছু মুশরিককে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্র করে। রাসূল ﷺ তা জানতে পারেন ও তাদের নিকট এসে বলেন, কুরাইশদের হুমকি তোমাদের অন্তরে রেখাপাত করেছে। কিন্তু তারা তোমাদের তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তোমরা কি নিজ পুত্র ও ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? রাসূল ﷺ এর এ বক্তব্যের ফলে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।[১৭৫] ফলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

তাছাড়া সে ইয়াহুদীদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কিন্তু রাসূল ﷺ এর সময়োচিত ও বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনার ফলে সে সফল হতে পারেনি।[১৭৬]

শিক্ষা:

> মুসলিমগণ শক্তিশালী হলে সমস্ত জালিমের জুলুম-অত্যাচার বন্ধ হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সব ধরনের ঘৃণ্য কার্যক্রম। এজন্যই কাফের-মুশরিকরা মুসলিমদের শক্তি সঞ্চয় দেখলেই সন্ত্রাসী, উগ্রবাদী, কট্টরপন্থী প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে পাগলের মতো প্রলাপ করতে থাকে।

---

১৭৪. সুনানে আবু দাউদ: বাবু খাবারিন নাযীর

১৭৫. প্রাগুক্ত

১৭৬. সহীহ বুখারী: ২/৬৫৫, ৬৫৬, ৯১৬, ৯২৪ পৃ.

মুহাজিরগণকে কুরাইশ কাফেরদের ধমক প্রদান

কুরাইশ কাফেররা মুহাজিরগণকে ধমকের সুরে চিঠি পাঠালো, "মক্কা থেকে গিয়ে তোমরা নিরাপদ রয়েছো বলে অহংকার করো না। আমরা ইয়াসরিবে চড়াও হয়ে তোমাদেরকে খতম করার শক্তি রাখি।" তারা যে শুধু ধমকি দিয়েই ক্ষান্ত হলো, তা কিন্তু নয়; বরং তারা গোপনে গোপনে তৎপর ছিলো। তাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা রাসূল ﷺ এক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে পারেন। ফলে তিনি নিরাপত্তার খাতিরে রাত জাগরণ করতেন; নতুবা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর প্রহারাধীনে ঘুমাতেন।

এক রাতে রাসূল ﷺ জাগ্রত ছিলেন। আর আশা করছিলেন, যদি সাহাবাদের কোনো ব্যক্তি এসে তাঁকে পাহারা দিতো। আয়েশা রাযি. বলেন, তারপর আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনলাম। রাসূল ﷺ বললেন, কে? জবাবে শুনলাম, আমি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস। আপনার সম্পর্কে আমার বিপদের আশঙ্কা হওয়ায় আপনাকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি। তাঁর কথা শুনে রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।[১৭৭]

শিক্ষা:

তাগুতগোষ্ঠী মুসলিমদেরকে শুধু নির্যাতন করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং তারা তাঁদের শান্তি এবং নিরাপত্তাকেও সহ্য করতে পারে না। তাই তারা বিভিন্ন হুমকি-ধমকি দিয়ে থাকে। কিন্তু মুমিনগণ তাদের এ হুমকির পরোয়া করে না; বরং আরও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের মোকাবেলা করার জন্য।

যুদ্ধের অনুমতি

এ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ দেখা দেয়। তাদের নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, কুরাইশরা কোনো মতেই তাদের বিদ্বেষপরায়ণতা ছাড়বে না। অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ

১৭৭. সহীহ বুখারী: ১/৪০৪, সহীহ মুসলিম: ২/২৮০

ফরয করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন–

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।" [১৭৮]

সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযি. এর পর দ্বিতীয় হিজরী সনে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করে দেন এবং এ সম্পর্কিত কয়েকটি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন।

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

"তোমরা আল্লাহর পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের কে ভালোবাসেন না।"[১৭৯]

শিক্ষা:

০১. নির্যাতিত মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ।

০২. কিতালের মাধ্যমেই অত্যাচারীর অত্যাচারকে সমূলে দমন করা সম্ভব।

০৩. মাজলুমদের সহায়তায় জালিমের বিরুদ্ধে কিতাল শুরু করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই মুমিনদের সাহায্য করবেন।

---

১৭৮. সূরা হাজ্ব: ৩৯
১৭৯. সূরা বাকারা: ১৯০

বদর যুদ্ধের পূর্বকার সারিয়্যাহ ও গযওয়া'সমূহ

০১. সারিয়ায়ে সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী: প্রথম হিজরীর রমজান মাস মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে রাসূল ﷺ হামযা রাযি. এর নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজিরের একটি দলকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য প্রেরণ করেন। এ অভিযানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

০২. সারিয়ায়ে রাবিগ: প্রথম হিজরীর শাওয়াল মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাসূল ﷺ উবাইদা ইবনে হারিস রাযি. এর নেতৃত্বে ৬০ জন মুহাজিরের একটি দলকে রাবিগ উপত্যকায় আবু সুফইয়ানের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠায়। তাদের সংখ্যা ছিলো ২০০ জন। উভয় দলের মাঝে সামান্য কিছু তীর বিনিময় ছাড়া এ অভিযানে বড় ধরনের কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

০৩. সারিয়ায়ে খার্‌রার: প্রথম হিজরীর যুল কা'দাহ মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাসূল ﷺ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. এর নেতৃত্বে ২০ জন যোদ্ধার একটি দলকে একটি কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য প্রেরণ করেন। এ সারিয়্যায় কোনো মোকাবেলা হয়নি।

০৪. গযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদ্দান: দ্বিতীয় হিজরীর সফর মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ৭০ জন মুহাজির যোদ্ধা নিয়ে রাসূল ﷺ এ যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো একটি কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা। কিন্তু তাদের সাথে কোনো সংঘাত হয়নি। এটি ছিলো সর্বপ্রথম সৈন্য পরিচালনা, যাতে রাসূল ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেছেন।

০৫. গযওয়ায়ে বুওয়াত্ব: দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ২০০ জন সাহাবাকে নিয়ে রাসূল ﷺ এ অভিযানে বের হোন। এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করাই ছিলো এ অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ অভিযানে কোনো সংঘাত হয়নি।

০৬. গযওয়ায়ে সাফওয়ান: দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এ গযওয়া সংঘটিত হয়। কুরয ইবনে জারির

ফিহরী একটি ছোট দল নিয়ে চারণভূমিতে আক্রমণ করে কিছু গবাদিপশু লুট করে নিয়ে যায়। তাই রাসূল ﷺ ৭০ জন সাহাবাকে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু তাদেরকে ধরা যায়নি।

০৭. গযওয়ায়ে যুল উশাইরাহ: দ্বিতীয় হিজরীর জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরা মোতাবেক ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ১৫০ কিংবা ২০০ জন মুহাজির সাহাবাকে নিয়ে রাসূল ﷺ এ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সিরিয়া অভিমুখী এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করাই এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু রাসূল ﷺ সেখানে পৌঁছার পূর্বেই তারা সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

০৮. নাখলার অভিযান: দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাস মোতাবেক ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ রাযি. এর নেতৃত্বে ১২ জন মুহাজিরের একটি দলকে কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করার জন্য প্রেরণ করেন। এ অভিযানে বাহন ছিলো প্রতি দু'জনের জন্য একটি উট। যখন মুসলিম বাহিনী নাখলায় গিয়ে উপনীত হলো, তখন কুরাইশ কাফেলা সে স্থান অতিক্রম করছিলো। সেই দিনটি হারাম মাসের মধ্যে হওয়ায় মুসলিমরা আক্রমণ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলো। অবশেষে তাঁরা কাফেলার উপর আক্রমণ করে বসলো। এতে আমর ইবনে যাযরামী তীর বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং উসমান ও হাকীম বন্দী হয়। দু'জন বন্দী ও গনীমতে মাল নিয়ে মুসলিম বাহিনী মদীনায় পৌঁছেন।[১৮০] হারাম মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় রাসূল ﷺ অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বন্দী দু'জনকে মুক্ত করে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করে দেন। গনীমতের মালে রাসূল ﷺ কোনো হস্তক্ষেপ করেননি। অপরদিকে কাফেররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে শুরু করলো যে, মুসলিমরা হারাম মাসে যুদ্ধ করে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করছে। তাদের এ অপবাদের প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন–

১৮০. এ সকল সারিয়্যাহ এবং গযওয়ার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকাদি থেকে গৃহীত হয়েছে, যাদুল মাআদ: ২/৮৩-৮৫ পৃ.; ইবনে হিশাম: ১/৫৯১-৬০৫ পৃ.; রাহমাতুল্লিল আলামীন: ১/১১৫-১১৬ , ২/২১৫-২১৬ ও ২৪৮-২৭০ পৃ.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দিন, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মাসজিদে হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।"

এ ওহী নাযিল হওয়ার ফলে কাফেরদের রটানো অপবাদের অসারতা প্রমাণিত হলো। কারণ, তারা মুসলিমদের জুলুম-নির্যাতনে সামান্যতম ইতস্ততবোধ করেনি। আর এখন তারা পবিত্র মাসগুলোর ব্যাপারে এত সচেতন হয়ে উঠলো!

শিক্ষা:

শত্রুপক্ষকে সর্বত্র অতিষ্ঠ করে রাখলে এবং তাদের আর্থিক, সামরিক ক্ষতিসাধন করলে তারা মোকাবেলা করতে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়বে। অতঃপর তাদের মাঝে সত্য গ্রহণ করার আগ্রহ জাগবে।

গযওয়ায়ে বদর আল-কুবরা

[দ্বিতীয় হিজরী ১৭ই রমজান]

যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ

মক্কা থেকে একটি কুরাইশ বণিক কাফেলা রাসূল ﷺ এর পাকড়াও থেকে বেঁচে সিরিয়া গিয়ে পৌঁছে। রাসূল ﷺ দু'জন সাহাবীকে আবু সুফইয়ানের নেতৃত্বে থাকা এ বণিক কাফেলার অপেক্ষায় থাকতে বলেন। কাফেলাটিকে ফিরতে দেখে ঐ সাহাবীদ্বয় দ্রুতগতিতে এসে রাসূল ﷺ এর কাছে খবর পৌঁছে দেন।

এ কাফেলার সাথে মক্কাবাসীদের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো। এ বিশাল পরিমাণ ধন-সম্পদ থেকে মক্কাবাসীর বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি ছিলো তাদের জন্য সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতি।

রাসূল ﷺ এ অভিযানে বের হওয়ার জন্য কারো উপর জরুরী বলে উল্লেখ করেননি। বরং এটাকে তিনি সাহাবায়ে কেরামের আগ্রহের উপর ছেড়ে দেন। কেননা এ ঘোষণার সময় মোটেও ধারণা করা হয়নি যে, এ বদরের প্রান্তরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে। এ কারণে বহু সাহাবায়ে কেরাম মদীনাতেই থেকে যান।

ঐতিহাসিক বদর[১৮১] যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই রমজান তিন শতাধিক সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল ﷺ কুরাইশ কাফেলাকে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তিন শতাধিক বলতে ৩১৩, ৩১৪ কিংবা ৩১৭ জন হতে পারে। আবু সুফইয়ান এ সংবাদ জেনে মক্কা যাওয়ার চিরাচরিত পথ বাদ দিয়ে বদর অভিমুখী পথকে বাম দিকে ছেড়ে উপকূলের পথ ধরে নিরাপদে চলে যায়। কুরাইশ কাফেলার উপর মুসলিম বাহিনী আক্রমণ চালাতে পারে, এ সংবাদ আগেই মক্কার কুরাইশদের

---

১৮১. বদর একটি কূপের নাম। এটি মদীনা থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। বদর নামে একটি গ্রামও সেখানে আছে।

কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিলো বণিক কাফেলার সর্দার আবু সুফইয়ান। এ সংবাদ শোনার পর কুরাইশরা সর্বমোট ১৩০০ জন সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে রওয়ানা শুরু করে। তাদের কাছে একশ' ঘোড়া ও ছয়শ' লৌহবর্ম ছিলো। আর উটের সংখ্যা এত বেশি ছিলো যে, তার কোনো হিসাব ছিলো না। অপরপক্ষে মুসলিম বাহিনীর মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিলো। উট ছিলো সত্তরটি। ওদিকে আবু সুফইয়ান নিরাপদে চলে যাওয়ার পর কুরাইশদের কাছে সংবাদ পাঠায়, তারা এখন নিরাপদ; কুরাইশ বাহিনী যেন ফিরে যায়। কাফেলা নিরাপদে আছে– এ সংবাদ জানার পর কুরাইশ বাহিনীর বহু সদস্যই ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে; কিন্তু আবু জাহেলের কঠোরতার কারণে তারা মক্কায় ফিরে যেতে পারেনি। সে বড় বড় নেতাদেরকে বিভিন্ন কথা বলে থেকে যাওয়ার জন্য বাধ্য করে। সে দম্ভ করে বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম! আমরা এখান থেকে ফিরে যাবো না। বরং আমরা বদরে উপস্থিত হয়ে সেখানে তিন দিন অবস্থান করবো। এ তিন দিন যাবৎ উট যবেহ করবো, পানাহার করবো, আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠবো। এর ফলে সমগ্র আরববাসী আমাদের শক্তি-দাপট সম্পর্কে জানতে পারবে। আর এভাবে চিরকালের জন্য তাদের উপর আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতিফলন ঘটবে। তারপরও বনু যুহরা ও বনু হাশিম ফিরে যায়; ফলে আবু জাহেলের সৈন্য সংখ্যা প্রায় ১০০০ জনে ঠেকে।

শিক্ষা:

তাগুতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা এবং সুযোগ পেলেই তাতে আক্রমণ করা আবশ্যক।

অবস্থার পর্যালোচনা

মদীনার পাশ দিয়ে যদি মক্কা থেকে সিরিয়ায় গমনের জন্য কুরাইশ কাফেলাকে নির্বিঘ্নে চলতে দেওয়া হয়; তবে তা মুসলমানদের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়াশীল হবে। এর ফলে কুরাইশদের সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বেড়ে যাবে। অপরদিকে মুসলমানগণ এমনিতে বসে থাকলে তাদের শক্তি হ্রাস পাবে। তাদের জন্য আঞ্চলিক সুযোগ-সুবিধা

কমে আসবে। ফলে ইসলামী দাওয়াতকে একটি নিষ্প্রাণ আদর্শ মনে করে ইসলামের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা লোকদের মনে স্থান পেতে শুরু করবে। শত্রুরা ইসলামের ক্ষতিসাধনে উঠেপড়ে লাগবে। যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে কিতালের জন্য সামান্য পরিমাণও অলসতা হতো; তবে এসব কিছুর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিলো।

সাহাবায়ে কেরামগণের সঙ্গে সামরিক পরামর্শ

রাসূল ﷺ কুরাইশ বাহিনীর আগমনের সংবাদ অবগত হয়ে পরামর্শের ডাক দেন। আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি. দু'জনেই অতি চমৎকার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁরা এবং উপস্থিত অন্যান্য সাহাবাগণ নিজেদের জান-মাল রাসূল ﷺ এর খেদমতে পেশ করে যুদ্ধের পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উমায়ের ইবনে ওয়াক্কাস রাযি. তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন বলে রাসূল ﷺ তাঁকে জিহাদে অংশ নিতে বারণ করেন। কিন্তু তিনি কাঁদতে থাকেন। ফলে রাসূল ﷺ তাঁকে অনুমতি দেন।[১৮২] মিকদাদ রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ডানে-বামে এবং সামনে পেছনে থেকে যুদ্ধ করবো।[১৮৩]

আনসারদের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে মুআয রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি আদেশ করলে আমরা সাগরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত আছি।[১৮৪]

রাসূল ﷺ তাঁদের এমন বীরত্বপূর্ণ কথা শুনে খুশি হলেন এবং তাঁদের সকলের জন্য দুআ করলেন।

শিক্ষা:

জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সাহাবায়ে কেরাম সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। মুমিন কখনো জিহাদের অপব্যাখ্যা বা জিহাদের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না। একমাত্র মুনাফিকরাই জিহাদ বিরোধী কথা বলে থাকে।

---

১৮২. কানযুল উম্মাল: ৫/২৭০
১৮৩. সহীহ বুখারী
১৮৪. সহীহ মুসলিম

আল্লাহর সাহায্যে রহমতের বৃষ্টি

কুরাইশরা বদর প্রান্তরে এসে এমন জায়গায় অবস্থান করলো, যা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য উপযোগী ছিলো। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছে বালুকাময় শুকনো জায়গা পেলো, যেখানে চলাফেরা করা ছিলো দুষ্কর। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফলে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হলো। মরু বালু জমে গেলো। পানিরও ব্যবস্থা হয়ে গেলো। অপরদিকে কাফেরদের অবস্থান স্থল এমন কর্দমাক্ত হয়ে গেলো যে, তারা চলাফেরাও করতে পারছিলো না।

লড়াইয়ের সূচনা

যখন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হলো, তখন রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন। এরপর তিনি সাহাবাদের কাতার ঠিক করে দিলেন। ফলে তাঁরা সুদৃঢ় প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন।

আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আসাদ মাখযূমী যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলো, আমি এদের (মুসলিম বাহিনীর) হাউযের পানি পান করবো অথবা তা ভেঙে ফেলবো, আর না হয় এর জন্য জীবন দিয়ে দেবো। হামযা রাযি. হাউযের পাড়ে তরবারির দ্বারাই এ নরাধমের আত্মঅহমিকার ফল দেখিয়ে দিলেন। এটাই ছিলো বদরের প্রথম হত্যা।

এদিকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে উতবাহ, শায়বাহ ও তাদের পিতা ওয়ালীদ এগিয়ে এলো। আর চিৎকার করে বলছিলো, কে আসবি আয়, আমাদের তরবারির খেলা দেখে যাও। মুসলিমদের পক্ষ থেকে তিনজন আনসারী সাহাবী এগিয়ে আসলে এ মুশরিকরা তাদের সাথে নয় বরং মক্কার মুসলিমদের সাথে লড়াই করার দম্ভ প্রকাশ করলো। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! মদীনার এ কৃষকদের সাথে লড়াই করা আমাদের জন্য সম্মানজনক নয়। আমাদের জন্য যোগ্য যোদ্ধা পাঠাও।

রাসূল ﷺ এ তিন আনসারী সাহাবীকে ফিরে আসতে বললেন এবং নিজের পরম আত্মীয়দের মধ্য থেকে হামযা রাযি., আলী রাযি. ও উবাইদা ইবনে হারিস রাযি. কে এগিয়ে যেতে বললেন। আলী রাযি. ওয়ালীদকে এবং হামযা

রাযি. শায়বাহকে হত্যা করলেন। আর উবাইদা রাযি. ছিলেন সবার চাইতে বৃদ্ধ। তিনি ও উতবা পরস্পরকে মারাত্মক জখম করেন। পরে হামযা রাযি. ও আলী রাযি. এগিয়ে এসে শায়বাহ ও ওয়ালীদের মতো তাকেও ধরাশায়ী করে ফেলেন।

সাহাবায়ে কেরামদের আত্মোত্যাগ

যখন উভয় বাহিনীর পরস্পর লড়াই শুরু হলো, দেখা গেলো নিজেদের অনেক স্নেহভাজন কলিজার টুকরা তরবারির নিচে এসে পড়েছে। তবুও সাহাবায়ে কেরাম কোনো কিছুর পরোয়া করেননি। না কোনো ভয়কে তাঁরা পরোয়া করেছেন। আর না কোনো স্নেহ-বন্ধনকে তাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন।

আবু বকর রাযি. এর ছেলে ময়দানে আসলে স্বয়ং আবু বকর রাযি. তাঁর তরবারিকে উত্থিত করেন। উতবা সামনে আসলে তার ছেলে আবু হুযাইফা রাযি. তরবারি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। উমর রাযি. এর মামা ময়দানে এলে ফারূকী তলোয়ার তার উপযুক্ত ফায়সালা করে দেয়।[১৮৫]

শিক্ষা:

> দ্বীনের বিরুদ্ধে যদি আপন সন্তান বা কোনো রক্তের আত্মীয় অবস্থান নেয়; তবুও মুমিন তাকে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আবু জাহেলের পতন

আবু জাহেলের ইসলাম বিদ্বেষ ও তার দুষ্কর্ম সর্বজনবিদিত ছিলো। আনসারদের মধ্য থেকে দু'জন বীরকেশরী সিংহ শাবক মুআয ও মুআওয়াজ।[১৮৬] তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আবু জাহেলকে দেখামাত্র তাকে তাঁরা হত্যা করবেন আর না হয় নিজেরা শহীদ হয়ে যাবেন। তাঁরা আবু জাহেলকে চিনতেন না। তাই আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. নিকট এ নরাধমের পরিচয় জানতে চাইলেন। আব্দুর রহমান রাযি. এতক্ষণ চিন্তা করছিলেন, যদি শক্তিশালী সঙ্গী পাওয়া যেতো; তবে তাঁদের সাথে মিলে আবু জাহেলকে হত্যা করা যেতো।

---

১৮৫. সীরাতে ইবনে হিশাম ও ইসতিয়াব আব্দুল বার
১৮৬. সহীহ বুখারী: ১/৪৪৪, ২/৫৬৮; মিশকাত: ২/৩৫২

কিন্তু তাঁর সাথে দু'জন কিশোরকে দেখে তিনি আর অগ্রসর হলেন না। এখন দেখি তাঁরাই আবু জাহেলকে চিনতে চাচ্ছে। যাই হোক, আব্দুর রহমান রাযি. তাঁদেরকে দেখিয়ে দিলেন, এ লোক আবু জাহেল। পরক্ষণেই তাঁরা দু'জন আবু জাহেলের উপর বাজ পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেখতে দেখতে আবু জাহেলকে তাঁরা ধরাশায়ী করে ফেললেন।

এদিকে আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা মুআয ইবনে আমর ইবনে জামুহ রাযি. কে আঘাত করলে তাঁর হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর এ হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিলো। তাই নিজ পায়ের নিচে চাপা দিয়ে তিনি নিজের এ ঝুলে থাকা হাতটিকে একেবারে আলাদা করে ফেলেন। আর পুরোদমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষে রাসূল ﷺ কোনো একজনকে আবু জাহেলের অবস্থা দেখে আসতে বললেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. গিয়ে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পান। তিনি তার মস্তক কেটে এনে রাসূলের পদতলে পেশ করেন। বদর প্রান্তরে আবু জাহেলের ভোজন উৎসব আর সমস্ত দম্ভ-দাপট ধুলায় মিশে গেলো।

যুদ্ধে ঘটিত মোজেযাসমূহ

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে রাসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশে এক মুঠো কঙ্কর শত্রুবাহিনীর উপর নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন আর তাঁরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যার্থে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এছাড়া আরও বহুভাবে মুসলিম বাহিনী মহান রবের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হোন। যেমন, উক্কাশাহ ইবনে মিহসানের তরবারি ভেঙে গেলে তিনি রাসূল ﷺ এর কাছে আসলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে একটি কাঠের টুকরো দিলেন। তিনি হাতে নিয়ে নাড়ানো মাত্রই তা তরবারিতে পরিণত হয়ে যায়।

এছাড়াও রাসূল ﷺ সকালে যখন মুসলিমদেরকে দাঁড়ানোর জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, এখানে অমুকের লাশ পড়বে আর এখানে অমুকের। রাসূল ﷺ যেভাবে বলেছেন, পরে সেসব স্থানে তাদের লাশ সেভাবেই পড়ে ছিলো।

শিক্ষা:

শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য মুমিনদের সাথে ফেরেশতাগণও শরীক হয়ে থাকেন (যদি মুমিন বান্দাগণ ঈমানের উপর অটল থাকেন)। এর ফলে মুমিনদের শক্তি, সাহস প্রাণোৎসর্গের আকাঙ্খা আরও বেড়ে যায়।

একটি চেতনাদীপ্ত ঘটনা

মুশরিকদের মৃত দেহগুলোকে রাসূল ﷺ এর নির্দেশ মতে টেনে এনে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো। যখন এভাবে উতবা ইবনে রবীআহকে টেনে আনা হলো। রাসূল ﷺ তখন আবু হুযাইফা ইবনে উতবা রাযি. এর দিকে তাকালেন তাঁর চেহারায় দুঃখ দেখে বললেন, তোমার পিতার অবস্থা দেখে তোমার অন্তরে অনুভূতি জেগেছে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! তার হত্যার ব্যাপারে আমার মনে কোনো সহানুভূতি জাগেনি। বরং আমি জানতাম, তিনি বিবেকবান ও দূরদর্শী লোক। তার এ গুণগুলো তাকে ইসলাম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কিন্তু তার পরিণাম দেখে আমার মনে দুঃখ জেগেছে। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন।

শিক্ষা:

এমন-ই ছিলো সাহাবাগণের ঈমান– বাবা ইসলামের শত্রু তাই তার মৃত্যুতে ব্যথিত হোননি; শুধু আফসোস করেছেন এ কারণে যে, বাবা তার বিবেক আর দূরদর্শিতা দ্বারা ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করতে পারেনি।

যুদ্ধের ফলাফল

যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় নেতা নিহত হলে তাদের মনোবল ভেঙে যায়; ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পলায়ন করতে থাকে। মুসলিমগণ কুরাইশ কাফেরদের ধাওয়া করেন। তাদের কাউকে হত্যা করেন আর কাউকে বন্দী করেন। যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। অপরপক্ষে

মুসলমানদের মাঝে ১৪ জন শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

শিক্ষাঃ

০১. যুদ্ধ জয়ের জন্য সংখ্যা বিবেচ্য নয়। আল্লাহ তাআলা চাইলে অল্প সংখ্যক ধৈর্যশীল মুমিন বহু সংখ্যক কাফেরের উপর বিজয় লাভ করেন।

০২. যুদ্ধে শত্রুদের সহজেই মনোবল ভেঙে যায়, এমন আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। কাফের-মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যা করতে পারলেই তাদের লাখো-হাজার চেলা-চামুণ্ডা ভয়ে পলায়ন শুরু করবে। আর এজন্যই বর্তমানে মুজাহিদগণ কাফেরদের বিশ্বমোড়লদের ধ্বংস করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন।

বন্দীদের সম্পর্কে ফায়সালা

বন্দীদের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে রাসূল ﷺ সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। আবু বকর রাযি. তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। রাসূল ﷺ এরও মনের ইচ্ছা ছিলো এরকম। আর উমর রাযি. তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে অভিমত পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আর যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম, তারা সাহাবাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দেওয়ার শর্তে মুক্তি পাবে।

বন্দীদের অবস্থা ও তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়

কয়েদীদের মধ্যে রাসূল ﷺ এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। বাঁধার কারণে তিনি কাতরাচ্ছিলেন। তার কাতর ধ্বনি রাসূল ﷺ এর কানে প্রবেশ করলে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে আপনার ঘুম ভেঙে গেলো? তিনি বললেন, যেখানে আমার সম্মানিত চাচার কাতর ধ্বনি আসছে। সেখানে আমি কীভাবে ঘুমাই।[১৮৭] কিন্তু ইসলাম অনুমতি দিচ্ছিলো না যে, তাঁর চাচাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দিতে। বরং

১৮৭. কানযুল উম্মাল: ৫/২৭২

তাঁর চাচার কাছ থেকে সাধারণ মুক্তিপণের তুলনায় আরও বেশি অর্থ নেওয়া হয়। যেহেতু ধনী বন্দীদের জন্য চার হাজারেরও বেশি দিরহাম মুক্তিপণ প্রদান করতে হয়। তাই তাকেও অধিক মুক্তিপণ আদায় করতে হয়েছিলো।

রাসূল ﷺ এর চাচার মুক্তিপণ মাফ করে দেওয়ার জন্য আনসারগণ আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু ইসলামে আত্মীয়-অনাত্মীয় হুকুমের দিক থেকে একই। তাই তাঁদের এ আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে রাসূল ﷺ এর জামাতা আবুল আসও যুদ্ধবন্দী হয়ে আসেন। তার কাছে মুক্তিপণ আদায় করার মতো অর্থ ছিলো না। তাই তিনি তার স্ত্রী; যিনি রাসূল ﷺ এর কন্যা ছিলেন, তাঁকে অর্থ জোগাড় করে পাঠাতে বললেন। তিনি তাঁর মা খাদীজা রাযি. এর দেওয়া হারটি মুক্তিপণ হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন।

এ হারটি দেখার পরে অনিচ্ছাকৃতভাবেই রাসূল ﷺ এর চোখে অশ্রু চলে আসে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা সম্মত হলে যায়নাবের কাছে তাঁর মায়ের দেওয়া হারটি ফেরত পাঠাই। সাহাবাগণ সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। আবুল আসকে বললেন, যায়নাবকে যেন মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। শর্ত অনুযায়ী তিনি যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তিনি আবার পরবর্তী বছর সিরিয়া থেকে আসার সময় ধৃত হোন। তখনো এভাবে পুনরায় মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর মক্কায় এসে সকলের পাওনা চুকিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।[১৮৮]

শিক্ষা:

> মুসলিমদের পারস্পরিক বন্ধন স্থাপিত হয় ঈমানের ভিত্তিতে। ঈমানদারের কাতারে না থাকলে রক্তের আত্মীয়ের ক্ষেত্রেও কোনো ছাড় নেই।

---

১৮৮. তারীখে তবারী
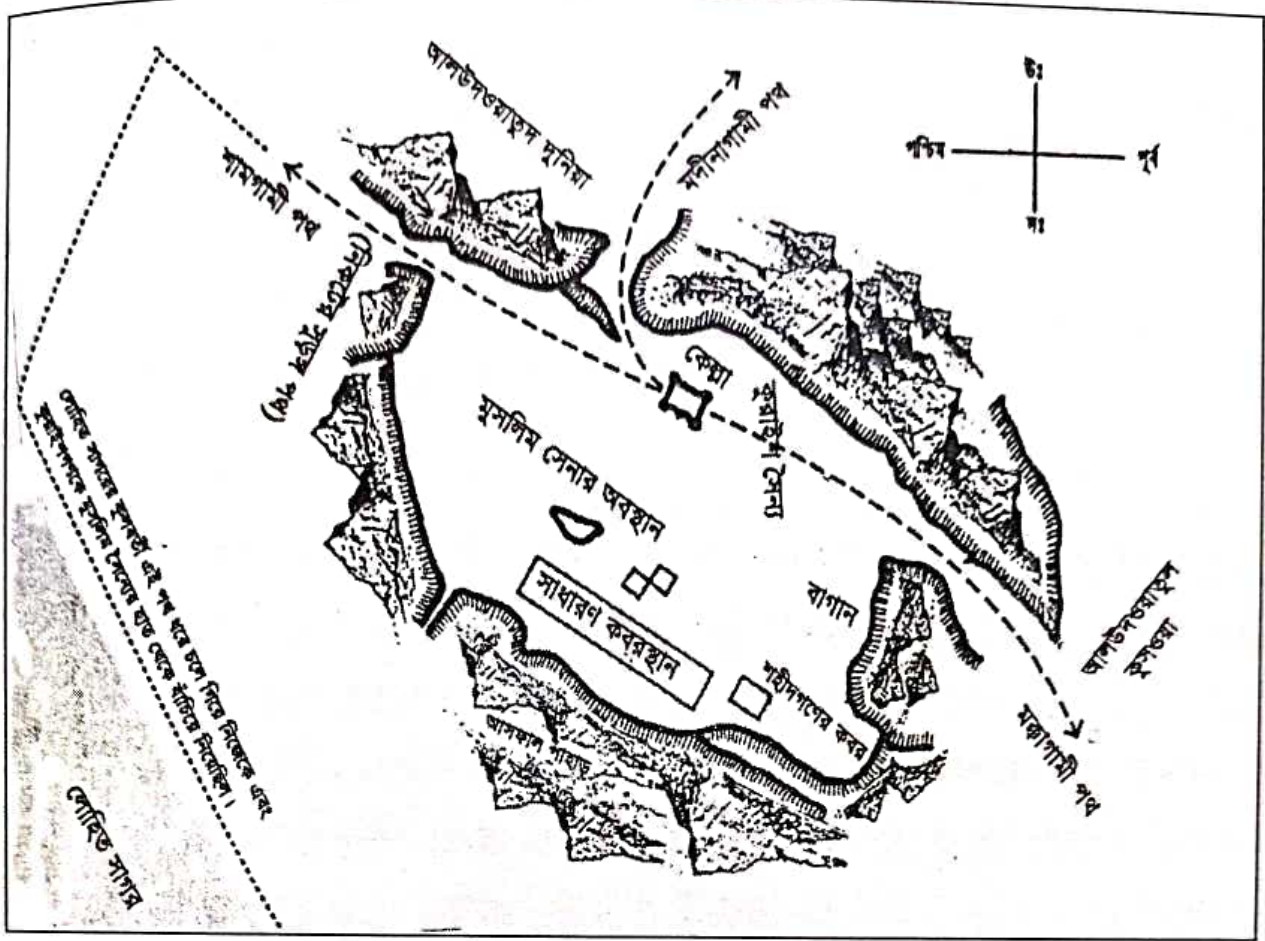
চিত্র: গযওয়ায়ে বদর আল-কুবরা

এই বছরের বিবিধ ঘটনাবলী

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে রমজানের রোজা এবং সাদাকাতুল ফিতর ফরয হয়। এ বছর যাকাতের বিভিন্ন নিসাবের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়। দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ঈদ উদযাপন তো ছিলো বদরের বিজয়ের পরবর্তী সময়ে। সুবহানাল্লাহ! কতই না আনন্দের ছিলো বিজয়ী মুমিনদের সে ঈদ উদযাপন!

বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের তৎপরতা

০১. গযওয়ায়ে বনু সুলাইম (কুদর নামক স্থানে): দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে বদর থেকে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাত দিন পর মুসলিমদের নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, বনু সুলাইম গোত্র মদীনায় আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। তাই তাদের আক্রমণের আগেই রাসূল ﷺ ২০০ জন উষ্ট্রারোহীকে নিয়ে তাদের নিজেদের এলাকায় তাদেরকে ধাওয়া করেন। এতে মুসলিম বাহিনী ৫০০ টি উট গনীমত হিসেবে লাভ করেন।[১৮৯]

---

১৮৯. ইবনে হিশাম: ২/৪৩-৪৪ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/৯০; মুখতাসারুস সীরাহ: ২৩৬ পৃ.

০২. রাসূল ﷺ কে হত্যার ষড়যন্ত্র: বদর যুদ্ধের পর উমায়ের ইবনে ওহাব জুমাহী সফওয়ানের সাথে একটি গোপন চুক্তি করে। সে রাসূল ﷺ কে হত্যা করবে। আর সফওয়ান তার সকল ঋণ পরিশোধ করে দেবে। কিন্তু রাসূল ﷺ কে হত্যা করতে আসলে রাসূল ﷺ তার এ গোপন বাসনার কথা বলে দেন। ফলে সে বললো, এ কথা তো আমি আর সফওয়ান ছাড়া কেউ জানে না। তারপর রাসূলের মোজেযায় মুগ্ধ হয়ে উমায়ের ইবনে ওহাব জুমাহী ইসলাম কবুল করেন।[১৯০]

০৩. গযওয়ায়ে বনু কাইনুকা': ইয়াহুদীদের ইতিহাস বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে পরিপূর্ণ। তারা খুব তাড়াতাড়িই তাদের পূর্ব স্বভাবের দিকে ফিরে গেলো। বদর প্রান্তরে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর তাদের হিংসুটে মনোভাব ও বিরুদ্ধাচরণ আরও চরম আকার ধারণ করলো। তাই মুসলিমদের যাঁরাই তাদের বাজারে যেতো, তাঁর সাথে তারা বিদ্রুপ আচরণ করতো। এভাবে যখন তাদের ঔদ্ধত্য বেড়েই চললো, রাসূল ﷺ স্বয়ং তাদের বাজারে উপস্থিত হলেন। তাদেরকে ডেকে উপদেশ প্রদান করলেন। কিন্তু তাদের অন্যায় আচরণ দিনে দিনে আরও বাড়তেই থাকে।

এমনকি একদা জনৈকা মুসলিম মহিলা বনু কাইনুকা'র বাজারে গেলেন। এরপর তিনি এক ইয়াহুদী স্বর্ণকারের দোকানে আসেন। তখন কয়েকজন ইয়াহুদী তাঁর মুখের কাপড় খোলার চেষ্টা চালায়; কিন্তু তিনি মুখের কাপড় খুলতে অস্বীকার করেন। এ পিশাচ স্বর্ণকার মহিলাটির অজান্তে তাঁর কাপড়ের এক প্রান্তে পিঠের উপর গিঁট দিয়ে দেয়। অতঃপর তিনি যখন উঠতে গেলেন, তখন বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। মহিলাটিকে এ অবস্থায় দেখে নরপিশাচরা হাসতে শুরু করলো। ঐ মহিলা লজ্জায়-ক্ষোভে মৃতপ্রায় হয়ে আর্তনাদ শুরু করেন। ঘটনাটি জানার পর একজন মুসলিম ঐ স্বর্ণকারকে হত্যা করে ফেলেন। ইয়াহুদীরাও ঐ মুসলিমকে শহীদ করে দেয়। এরপরে বনু কাইনুকা' ও মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়।[১৯১]

---

১৯০. ইবনে হিশাম: ১/৬৬১-৬৬৩ পৃ.
১৯১. ইবনে হিশাম: ২/৪৭

অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও নির্বাসন

ইয়াহুদীরা মুসলিমদেরকে আসতে দেখে দুর্গ অভ্যন্তরে লুকিয়ে পড়ে। রাসূল ﷺ পনেরো দিন যাবৎ দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি-সন্ত্রস্তভাব সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা আত্মসমর্পণ করে বললো, রাসূল ﷺ তাদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তারা তা মেনে নেবে। রাসূল ﷺ তাদের সকলকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার গোত্র খাযরাজের মিত্র বনু কাইনুকা'র জন্য রাসূল ﷺ এর কাছে বলতে লাগলো, যেন তাদের প্রতি দয়া করা হয়। তার বারবার বলার পর রাসূল ﷺ তাদেরকে ছাড় দিতে রাজি হোন। তাকে বলেন যে, তারা যেন মদীনায় আর না থাকে; বরং সে যেন তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনার পর তারা সিরিয়ায় চলে যায়। আর কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই তারা অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায়।[১৯২]

০৪. গযওয়ায়ে সাভীক: বদর যুদ্ধের দু'মাস পর দ্বিতীয় হিজরীর যুল হিজ্জাহ মাসে আবু সুফইয়ান মদীনায় আক্রমণ করার জন্য মদীনার নিকটে চলে আসে। রাসূল ﷺ এ সংবাদ পেয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু তারা তাদের বিভিন্ন আসবাবপত্র রেখে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার কারণে তাদের নাগাল পাওয়া যায়নি।

০৫. গযওয়ায়ে যু-আমর: তৃতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূল ﷺ এর নেতৃত্বে এটাই সবচেয়ে বড় গযওয়া। রাসূল ﷺ এর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, বনু সা'লাবাহ ও মুহারিব গোত্র মদীনায় আক্রমণের জন্য বিশাল সৈন্য জমায়েত করছে। এ সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ ৪০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে তাদের ধাওয়া করেন। রাসূল ﷺ এর রওয়ানার খবর পেয়ে তারা পালিয়ে যায়। তিনি সেখানে পূর্ণ সফর মাস অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন।[১৯৩]

০৬. কা'ব ইবনে আশরাফ কে হত্যা: এ ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠিন বিদ্বেষ পোষণ করতো। সে রাসূল ﷺ কে কষ্ট দিতো এবং

---

১৯২. ইবনে হিশাম: ২/৪৭-৪৯ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/৭১ ও ৯১ পৃ.

১৯৩. ইবনে হিশাম: ২/৪৬; যাদুল মাআদ

তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের হুমকি দিতো। বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় ও কুরাইশদের পরাজয়ের কথা শুনে সে রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের নিন্দা করতে থাকে। প্রশংসা করতে থাকে ইসলামের শত্রুদের। সে রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের উত্তেজিত করতে তাদের নিকট গমন করে বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করে। মদীনায় ফিরে এসে সাহাবায়ে কেরামগণের স্ত্রীদের বিরুদ্ধেও নানা বাজে কবিতা ও কটুক্তির মাধ্যমে মুসলিমদের কষ্ট দিতে থাকে। তার এ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল ﷺ বললেন, কে আছে; যে কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারবে? সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) কে কষ্ট দিয়েছে।

এ কথা শুনে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি., আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি., আবু নায়িলাহ রাযি., হারিস ইবনে আউস রাযি. এবং আবু আবস ইবনে জাবর রাযি. প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এই ক্ষুদ্র বাহিনীর নেতা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি.। তাঁরা সুকৌশলে কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি. তাকে হত্যা করেন। তার হত্যার পর ইয়াহুদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণের সাহস হারিয়ে ফেলে এবং অঙ্গীকার পূরণের স্বীকৃতি দান করে।

০৭. গযওয়ায়ে বুহরান: তৃতীয় হিজরীর রবিউল আখের মাসে রাসূল ﷺ ৩০০ জন সৈন্যের একটি দল নিয়ে বুহরান নামক এলাকায় গমন করেন। তিনি সেখানে রবিউল আখের ও জুমাদাল উলা এই দু'মাস অবস্থান করেন। সেখানে তাঁদের কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি।[১৯৪]

০৮. সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসাহ: তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে উহুদ যুদ্ধের পূর্বে রাসূল ﷺ ১০০ জন অশ্বারোহীর একটি বাহিনীকে যায়েদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেন। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনী কুরাইশ কাফেলার উপর আক্রমণে সফল হয়।

---

১৯৪. ইবনে হিশাম: ২/৫০-৫১ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/৯১

শিক্ষাঃ

০১. কাফেরদের শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য মুমিনদের সর্বদা তৎপর থাকতে হবে।

০২. কাফেরদের সর্বক্ষেত্রে দুর্বল করে রাখার জন্য তাদের উপর অতর্কিতে হামলা করা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র সুন্নাহ।

০৩. যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে কটুক্তি করবে, দুনিয়াতে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তাদের পরিণতি হবে কা'ব ইবনে আশরাফের মতোই।

০৪. একজন মুমিনা বোনের সাথে অমুসলিমরা বিদ্রুপ আচরণ করবে, আত্মমর্যাদাবান কোনো মুমিন তা সহ্য করতে পারে না।

গযওয়ায়ে উহুদ

[তৃতীয় হিজরী ১১ই শাওয়াল]

বদর যুদ্ধ ছিলো কুরাইশ মুশরিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক ঘটনা। তাদের সামনে তখন দু'টি পথ খোলা ছিলো। প্রথমত, তারা তাদের সকল দম্ভ-অহংকার ত্যাগ করে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার পথ বেছে নেবে। আর না হয় মুসলিমদের উপর পুনরায় আঘাত করে তাঁদের শক্তিকে এমনভাবে চূর্ণ করে দেবে; যেন পুনরায় তারা মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতে না পারে। মুশরিকরা তখন দ্বিতীয় পথটিই বেছে নেয়।

কুরাইশদের প্রস্তুতি

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় অনেক লোক নিহত হয়। এ দুঃখে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলো। এমনকি তারা এর জন্য শোক প্রকাশেরও অনুমতি দেয়নি। তারা বন্দীদের মুক্তিপণ আদায়ে তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করে দিয়েছিলো। কারণ এতে তাদের শোকের প্রাবল্য বোঝা যেতে পারে। অধিকন্তু, বদর যুদ্ধের পর তারা সকলে সিদ্ধান্ত নিলো যে, তারা মুসলিমদের সাথে এক কঠিন যুদ্ধ করে নিজেদের কলিজাকে ঠাণ্ডা করবে। তারা কালক্ষেপণ না করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। বদর যুদ্ধের সময় আবু সুফইয়ান মক্কার যে ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণ থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়, সেই কাফেলার সকল ধন-সম্পদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তারা আটকে রেখেছিলো। এজন্য তারা মালের মালিকদেরকে বুঝিয়ে নিলো যে, এবার তারা প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

“নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধা দান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুত এখন তারা আরও ব্যয় করবে। তারপর তা-ই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।”[১৯৫]

শিক্ষা:

০১. কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করে; কিন্তু এ অর্থ ব্যয় এক সময় তাদের পরিতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এর ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের অর্থ ব্যবস্থায় ধস নেমে আসে। যেমন আফগান যুদ্ধে আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক ধস নেমেছে; যা তারা নিজেরাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

০২. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের বিশাল সামরিক বাজেট মূলত তাদেরই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার আলামত। কারণ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে একদিকে তারা উপহারস্বরূপ পায় নিজেদের মৃত সৈন্যদের কফিন; আর এদের পেছনে বিশাল অর্থ ব্যয়ের নিস্ফল পরিণতি তো আছেই। অপরদিকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র গনীমত হিসেবে মুসলিমদের অধিকারে চলে যায়।

কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা

এবার কুরাইশ মুশরিক বাহিনী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তারা তিন হাজারেরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে। এ বাহিনীতে ছিলো ৭০০ লৌহবর্ম, ২০০ ঘোড়া এবং ৩০০০ উট। তারা ১৫ জন মহিলাকে তাদের সঙ্গে নেয়; যাদের কাজ ছিলো, যুদ্ধের ময়দানে তাদের যোদ্ধাদেরকে উত্তেজিত করা। আর কেউ পলায়ন করতে চাইলে তাকে ভর্ৎসনা দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অটল রাখা।[১৯৬]

---

১৯৫. সূরা আনফাল: ৩৬

১৯৬. যাদুল মাআদ: ২/৯২; ফাতহুল বারী: ৭/৩৪৬

এদিকে আব্বাস রাযি. যিনি তখন মুসলমান হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করেননি। তিনি কুরাইশদের এ প্রস্তুতির কথা একজন বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে মদীনায় প্রেরণ করেন। রাসূল ﷺ তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন। উবাই ইবনে কা'ব রাযি. পত্রখানা রাসূল ﷺ কে পাঠ করে শোনালেন। তিনি এর কথা গোপন রাখতে বলেন। তারপর তিনি মদীনায় এসে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সলা-পরামর্শ করেন।

শিক্ষা:

যুদ্ধ জয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সর্বাবস্থায় গোপনীয়তা অবলম্বন করা।

আকস্মিক যুদ্ধাবস্থা মোকাবেলায় মুসলিমদের প্রস্তুতি

এরপর মদীনায় যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রণসাজে সজ্জিত হতে থাকেন। এমনকি নামাজের সময়েও তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে রাখতেন না। রাসূল ﷺ কুরাইশদের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা জানার পর দু'জন সাহাবীকে কুরাইশদের খবর আনার জন্য পাঠালেন। তাঁরা এসে জানালেন, কুরাইশরা মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে।

শিক্ষা:

০১. অস্ত্র সঙ্গে রাখা রাসূল ﷺ এর সুন্নত। এটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যা নামাজের সময়ও ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

০২. যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য গোয়েন্দা ব্যবহার করা জরুরী।

মুসলিমদের পরামর্শ সভা

কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ দিলেন, আমরা মদীনায় থেকে যুদ্ধ করবো। তারা যখন শহরে প্রবেশ করবে, তখন আমরা তাদের প্রতিহত করবো। আর মহিলারা ছাদ থেকে তাদের উপর ইট-পাটকেল ছুড়বে।

সাহাবাদের এ পরামর্শের প্রতি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সমর্থন জানায়। কিন্তু সে মুসলিমদের কল্যাণার্থে এ সমর্থন করেনি; বরং যুদ্ধ করা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই এ সমর্থন করেছে। অপরদিকে অন্যান্য সাহাবাগণ পরামর্শ দিলেন, আমরা মদীনা থেকে বের হয়ে তাদের প্রতিরোধ করবো। শত্রুপক্ষকে দেখাতে চাই– আমরা দুর্বল নই, কাপুরুষ নই।

রাসূল ﷺ এর পিতৃতুল্য বীর সৈনিক হামযা রাযি. এতক্ষণ চুপ ছিলেন। এবার তিনি বললেন, এটাই তো কথার মতো কথা। আমরা সত্যের সৈনিক। সত্যের জন্য প্রাণ বিলিয়ে দেওয়াই আমাদের পার্থিব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। জীবন-মরণ তাঁরই হাতে। তারপর তিনি শপথ করে বললেন, মদীনার বাহিরে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ না করে আমি খাবার স্পর্শ করবো না।[১৯৭] রাসূল ﷺ অবশেষে মদীনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

শিক্ষাঃ

শাহাদাতের মর্যাদা লাভই একজন মুমিনের পরমাকাঙ্খা। এজন্য মুমিন সদা-সর্বদা ময়দানে ছুটে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়।

মুসলিম বাহিনীর রণযাত্রা

ভোরে রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে ১০০০ জনের একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হোন। তাদের মধ্যে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সমমনা মুনাফিকরা মাঝপথ থেকে ফিরে আসে; যাদের সংখ্যা তিনশ'র মতো ছিলো। যদিও তার মনের ভেতরে মুনাফিকী ছিলো; কিন্তু সে তো তা আর প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে না। সে অযুহাত পেশ করলো যে, অযথা কেন জীবন দিতে যাবো? রাসূল ﷺ তার কথা না মেনে অন্যদের কথা মেনে নিয়েছেন। মূলত, তখন মুসলিম বাহিনীর মাঝে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই ছিলো তার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাতে সাধারণ সৈন্যরা রাসূল

১৯৭. সীরাতে হালাবিয়্যা: ২/১৪

ﷺ এর সঙ্গ ত্যাগ করে। মুসলিমদের মনোবল ভেঙে যায়। পক্ষান্তরে এ দৃশ্য দেখে শত্রুদের সাহস বেড়ে যাবে। সুতরাং তার ও তার সঙ্গীদের সরে পড়ার উদ্দেশ্য ছিলো রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিশ্চিহ্ন করারই অপপ্রয়াস। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার মুনাফিক বাহিনী নিয়ে সরে পড়ায় উহুদ প্রান্তরে ৭০০ জন আল্লাহর সৈনিক বাকি থাকে। যাদের মধ্যে ১০০ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত। আর ৫০ জন ছিলেন ঘোড়সওয়ার।[১৯৮]

শিক্ষা:

০১. প্রত্যেক যুগেই মুনাফিকরা চায়, মুজাহিদদের কাতারগুলোকে ভেঙে দিতে। বর্তমানেও মুজাহিদ বেশে অনেক মুনাফিক মুজাহিদদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এমন কাজ করে যাচ্ছে; যাতে জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে জনসাধারণের কাছে অপছন্দনীয় করা যায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পাতা ফাঁদে দ্বীনের সৈনিকগণ পা দেন না।

০২. যুদ্ধের মাধ্যমে মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে জিহাদের স্পৃহা

রাসূল ﷺ যখন শায়খান নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেন এবং ছোটদেরকে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু জিহাদের এ কল্যাণ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হতে চাইছিলেন না। যখন রাফি' ইবনে খাদীজকে বলা হলো, তোমার বয়স কম; তুমি ফিরে যাও। তখন তিনি পায়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ালেন। যেন তাঁকে লম্বা দেখায়। তিনি সুদক্ষ তীরন্দাজ হওয়ায় তাঁকে সঙ্গে নেওয়া হয়। অপরদিকে সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযি. বললেন, আমি রাফি'কে কুস্তিতে পরাস্ত করতে পারি। রাসূল ﷺ কে এ সংবাদ দেওয়া হলে, তিনি দু'জনের মধ্যে কুস্তি লাগিয়ে দেন। সত্যি সত্যিই সামুরাহ রাফি'কে পরাজিত করেন। সুতরাং তাঁকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।[১৯৯]

---

১৯৮. যাদুল মাআদ: ২/৯২

১৯৯. তারীখে তবারী: ৩য় খণ্ড

শিক্ষাঃ

০১. সাহাবায়ে কেরামগণের মাঝে অল্প বয়সী কিশোররা পর্যন্ত জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য নিজেকে স্বেচ্ছায় সানন্দে পেশ করে দিতেন। অথচ আজকের এ অবস্থায় যখন সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে আইন, তখন পরিণত বয়সের এমনকি অনেক বিদ্ধান শ্রেণীর লোকও পর্যন্ত নানান বাহানা আর অজুহাত পেশ করে নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে জিহাদ বিমুখী করে চলছে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

০২. নামাজ শিক্ষা দেওয়ার মতোই সন্তানদের জিহাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং জিহাদের ময়দানে নিয়ে যাওয়া রাসূল ﷺ প্রদত্ত শিক্ষার অংশ।

পত্নীর বক্ষ ছেড়ে তরবারির ধারের উপর

হানযালা রাযি. নব বিবাহিত ছিলেন। যখন জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিলো, তখন তিনি স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গনরত ছিলেন। ঘোষণার সাথে সাথে তিনি জিহাদে যোগ দেন ও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধেই তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

শিক্ষাঃ

সাহাবায়ে কেরামদের নিকট দ্বীনের কাজ সবচেয়ে বড় ছিলো। তাই তো স্ত্রীর উষ্ণ আলিঙ্গন ছেড়ে জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

মুসলিমদের সেনা বিন্যাস

উহুদ প্রান্তরে পৌঁছে রাসূল ﷺ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেনাবাহিনীকে কয়েকটি সারিতে বিভক্ত করেন। সুনিপুণ তীরন্দাজের ৫০ জনের একটি দলকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এর নেতৃত্বে মুসলিমদের পেছনে থাকা উহুদ পাহাড়ের একটি গিরিপথের উপর পাহারায় নিযুক্ত করেন। সেদিক থেকে তাঁদের উপর আক্রমণ আসার জোর সম্ভাবনা ছিলো। তাঁদেরকে তিনি

নির্দেশ দিলেন, জয় হোক বা পরাজয় হোক[২০০] কিংবা আমরা মৃত্যুমুখে পতিত[২০১] হলেও তোমরা এখান থেকে সরে পড়বে না।

শিক্ষা:

০১. পরিস্থিতি অনুকূলে হোক বা প্রতিকূলে হোক, উভয় অবস্থাতেই আমীরের আনুগত্য করা আবশ্যক।
০২. সবগুলো দিক খেয়াল করে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা বিন্যাস করা একজন আমীরের সবচেয়ে গুরু দায়িত্ব।

যুদ্ধের ঘটনাবলী

কুরাইশদের পক্ষ থেকে তাদের পতাকাবাহী বীর তালহা ইবনে আবু তালহা এগিয়ে আসলে যুবায়ের রাযি. অগ্রসর হোন। তিনি তাকে এক মুহূর্তের মাঝে ধরাশয়ী করে ফেলেন। এরপর একের পর এক কুরাইশদের পতাকাবাহী মারা যেতে লাগলো। এভাবে কুরাইশদের পতাকাবাহী দলের প্রায় সকলেই মৃত্যুবরণ করলো। অবশেষে তাদের পতাকা তোলার মতো আর কেউই বাকি রইলো না।

এদিকে আবু দুজানা রাযি. লাল পাগড়ি পরে রাসূল ﷺ এর তরবারি উঠিয়ে নেন এবং তাঁর হক্ব আদায় করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি বহু দূর এগিয়ে যান। যে মুশরিকের সাথেই তাঁর দেখা হয়েছে, তিনি তাকে হত্যা করে সম্মুখ অগ্রসর হতেন। এভাবে তিনি একের পর এক কুরাইশদের সারিগুলোকে উলট-পালট করে দিচ্ছিলেন। আর যখন তিনি লাল পাগড়ি পরছিলেন, তখন আনসারগণ বলে উঠেন, আজ আবু দুজানাহ মৃত্যুর পাগড়ি পরেছে। ওদিকে মুশরিকদের পক্ষের এক লোক মুসলিমদের যাকেই আহত দেখতো, তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। এভাবে এক সময় দু'জনই মুখোমুখী হলো। উভয়ে একের উপর এক হামলা করলো। ঐ মুশরিকের তলোয়ার আবু দুজানার রাযি. ঢালে আটকে গেলো। আবু দুজানা তাকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।[২০২]

---

২০০. ইবনে হিশাম: ২/৬৫৩ ও ৬৬৬ পৃ.
২০১. মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, হাকিম ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে, ফাতহুল বারী: ৭/৩৫০
২০২. ইবনে হিশাম: ২/৬৮-৬৯ পৃ.

এদিকে হামযা রাযি. বীর বিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন। কুরাইশদের বড় বড় বীর তাঁর সামনে টিকতে পারছিলো না। কিন্তু এক সময় তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। তবে তাঁকে সামনাসামনি শহীদ করা হয়নি; বরং তাঁকে তারা কাপুরুষের মতো শহীদ করেছিলো। যুবায়ের ইবনে মুতইম এর আদেশে ওয়াহশী নিজের গোলামিত্ব মোচনের জন্য লুকিয়ে হামযা রাযি. কে হামলা করে। ওয়াহশী বর্শা মেরে তাঁকে শহীদ করে ফেলে।

তীরন্দাজদের বাহিনীটিও সমানভাবে লড়ে যান। খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনীর ঘোড়সওয়ার দল মুসলিমদের বাম বাহু ভেঙে দেওয়ার জন্য তিনবার পেছন থেকে হামলা করে। কিন্তু তীরন্দাজ বাহিনী তাদেরকে ঘায়েল করে; ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে যায়।[২০৩]

শিক্ষা:

> মুমিনগণ সর্বদা শাহাদাতের নেশায় কাফেরদের সারি ভেদ করে তাদেরকে কচুকাটা করতে থাকে। অবশেষে শাহাদাতের সফলতা তাঁদেরকে আলিঙ্গন করে জান্নাতে নিয়ে যায়।

মুশরিকদের পরাজয়

কিছুক্ষণ ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলার পর কুরাইশ বাহিনীর সারিগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ইবনে ইসহাক বলেন, মুসলিম যোদ্ধাগণ মুশরিকদেরকে তরবারি দিয়ে এমনভাবে কাটতে লাগলেন যে, তারা নিজেদের শিবির থেকে পালিয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে তারা পরাজিত হয়েছিলো। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, হিন্দা ও তার সহযোগীরাও পালাতে থাকলো। এমনকি তাদের ধরার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতাই ছিলো না।[২০৪] এ সুযোগে মুসলিম যোদ্ধাগণ মুশরিকদের উপর তরবারি চালাতে চালাতে তাদের গনীমত সংগ্রহ করছিলেন ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন।

---

২০৩. ফাতহুল বারী: ৭/৩৪৬
২০৪. ইবনে হিশাম: ২/৭৭

তীরন্দাজগণ এতক্ষণ তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু এ আশাতীত বিজয় দেখে তারা নিজেদের কর্তব্য পালন হয়েছে মনে করে সরে আসলেন ও গনীমতের মাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন।

এদিকে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এবার ফাঁক পেয়ে তারা সে অরক্ষিত স্থান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। আব্দুল্লাহ রাযি. তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে তাদের মোকাবেলা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। খালিদ বাহিনী মুসলিমদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে, অপরদিকে মুশরিকদের একজন তাদের পতাকা উঠিয়ে নেয়। ফলে তারা সেই পতাকার নিচে একত্রিত হতে লাগলো। এবার মুসলিমগণ দু'দিকের আক্রমণের মুখে পড়ে গেলো।

শিক্ষা:

কতক লোকের আনুগত্য ভঙ্গ করার কারণে পুরো জামাআতের উপর বিপদ নেমে আসে এবং আল্লাহ তাআলা সাহায্য উঠিয়ে নেন।

রাসূল ﷺ এর বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

যখন খালিদের নেতৃত্বে থাকা মুশরিকরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে, তখন ৯ জন সাহাবী রাসূল ﷺ এর পাশে ছিলেন। এ অবস্থায় রাসূল ﷺ এর সামনে দু'টি পথ খোলা ছিলো। হয় তিনি ৯ জন সাহাবীর বেষ্টনীতে থেকে নিরাপদে পাহাড়ের উপরে উঠে যাবেন আর সাহাবীদের তাঁদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেবেন। না হয় তিনি নিজ সাহাবীদেরকে ডাক দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হলে মুসলিম বাহিনীর জন্য উহুদ পাহাড়ে উঠার ব্যবস্থা করবেন। তখন রাসূল ﷺ দ্বিতীয় পন্থাটি গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর আহ্বান মুসলিমদের আগে কাফেররা শুনে যাবে; ফলে তারা তাঁকে শহীদ করার জন্য ধেয়ে আসবে। কিন্তু তিনি নিজের পরোয়া করলেন না। উচ্চস্বরে সাহাবায়ে কেরামকে ডাক দিলেন–

هلموا إلي، أنا رسول الله "আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল।" যার ফলে কাফেরদের একটি বাহিনী মুসলিমদের আগেই রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথে

থাকা সাহাবায়ে কেরামকে ঘিরে ফেলে।

শিক্ষা:

আমির নিজ জীবন বিপন্ন করে হলেও সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করেন। অর্থাৎ নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া রাসূলের শিক্ষা।

মুসলিমদের বিক্ষিপ্ত অবস্থা

মুসলিমগণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা মুশরিকদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যান আর একে অপরকে চিনতে অক্ষম হয়ে পড়েন। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, উহুদ যুদ্ধে প্রথমত কুরাইশরা পরাজিত হয়। এরপর (যখন মুসলিমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে) ইবলিস ডাক দিয়ে বলে, ওরে আল্লাহর বান্দারা! পেছন দিকে আক্রমণ করো। ফলে মুসলিমদের সামনের সারির সাথে যেখানে মুশরিকরা মিশ্রিত হয়েছিলো তাদের সাথে যুদ্ধ বেধে যায়। হুযাইফা রাযি. দেখেন যে, তাঁর পিতার উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইনি যে আমার পিতা। কিন্তু তারা বিরত হলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবা শহীদ হয়ে গেলেন। হুযাইফা রাযি. বললেন, আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করে দিন।[২০৫]

মোট কথা, তখন বহু লোক চিন্তিত অবস্থায় ছিলেন। তারা কোন দিকে যাবেন বুঝতে পারছিলেন না। এমন সময় একজন লোক ঘোষণা দিলো, মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হয়েছেন। তখন অনেকে এ ঘোষণা শুনে তাঁদের কর্তব্য ভুলে যান। কেউ কেউ এ চিন্তাও করলো যে, মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে মিলিত হয়ে তাকে বলবে, যেন আবু সুফইয়ানের সাথে তাদের নিরাপত্তার জন্য আবেদন করা হয়।

কিছু সময় পর তাঁদের পাশ দিয়ে আনাস ইবনে নাযর রাযি. যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের দেখে বললেন, রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর বেঁচে থেকে কী লাভ?

---

২০৫. সহীহ বুখারী: ১/৫৩৯, ২/৫৮১; ফাতহুল বারী: ৭/৩৫১, ৩৬২, ৩৬৩ পৃ.; বুখারী ছাড়া অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছিলেন হুযাইফা রাযি. পিতার দিয়াত দিতে; কিন্তু তিনি বললেন, আমি মুসলিম জাতিকে তা সাদাকা করে দিলাম। এ কারণে হুযায়ফা রাযি. এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মুখতাসারুস সীরাহ: ২৪৬

অতঃপর তিনি সামনে এগিয়ে যান।[২০৬] অনুরূপ সাবিত ইবনে দাহ্‌দাহ রাযি. নিজ কওমকে ডেকে বললেন, যদি মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হোন; তবে জেনে রাখো! আল্লাহ জীবিত আছেন। তিনি তোমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করবেন। তাঁর কথায় একদল মুসলিম তাঁর সাথে এগিয়ে যান। তিনি এঁদের সহায়তায় খালিদ বাহিনীর উপর হামলা করেন।[২০৭] একজন মুহাজির সাহাবী রক্তে রঞ্জিত একজন আনসারী সাহাবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুহাজির তাঁকে বলেন, হে ভাই! আপনি তো জানেন, মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হয়েছেন। তখন ঐ আনসারী সাহাবী বললেন, যদি মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হোন; তবে জেনে রাখুন, তিনি আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন। এখন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে, ঐ দ্বীনের হেফাজতের জন্য যুদ্ধ করা।[২০৮]

শিক্ষা:

০১. জিহাদ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল নয়। আমির বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

০২. বিরুদ্ধবাদীদের রটনায় কান না দিয়ে অটলভাবেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

রাসূল ﷺ এর আশপাশে রক্তক্ষয়ী লড়াই

রাসূল ﷺ ৭ জন আনসার ও ২ জন মুহাজির সাহাবীসহ পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। যখন কাফেররা তাঁর নিকটবর্তী হলো। তিনি বললেন, কে আছে; যে আমার নিকট থেকে তাদেরকে সরিয়ে দেবে? এর বিনিময়ে তাঁর জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁর কথা শুনে এক এক করে আনসারী সাহাবীগণ অগ্রসর হলেন আর যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

এর ফলে রাসূল ﷺ এর পাশে তখন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিলেন না।[২০৯] মুশরিকরা এ

২০৬. যাদুল মাআদ: ২/৯৩ ও ৯৬ পৃ.; সহীহ বুখারী: ২/৫৭৯
২০৭. সীরাতে হালাবিয়্যাহ: ২/২২
২০৮. যাদুল মাআদ: ২/৯৬
২০৯. সহীহ বুখারী: ১/৫১৭ ও ২/৫৮১

সময় রাসূল ﷺ এর উপর আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে; ফলে তিনি পার্শ্বদেশের ভরে পড়ে যান। তাঁর ডান দিকের রুবাঈ দাঁত ভেঙে যায়। তিনি তাঁর নিচের ঠোঁটে আঘাতপ্রাপ্ত হোন। আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী তাঁর ললাটে আঘাত করে। নরাধম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ তাঁর কাঁধের উপর আঘাত করলে তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পান। পরেরবার আঘাত করলে তাঁর চোখের নিচের হাঁড়ে লেগে যায়। এর কারণে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া চেহারার মধ্যে ঢুকে যায়। রাসূল ﷺ তখন তাদের জন্য বদদুআ করেন। একটু পর তিনি তাদের জন্য দুআ করে বলে উঠেন– رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون "হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করে দিন! তারা জানে না।"[২১০]

সেদিন মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে হত্যা করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সা'দ ও তালহা রাযি. অসাধারণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হতে দেননি। তাঁরা দু'জনই ছিলেন আরবের সুদক্ষ তীরন্দাজ। তাঁরা তীর মেরে শত্রুদেরকে রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে দূরে রাখেন। রাসূল ﷺ নিজ তূণ থেকে তীর নিয়ে সা'দ রাযি. এর জন্য ছড়িয়ে দেন। তাঁকে বলতে থাকেন– ارم فداك أبي وأمي "তীর ছুঁড়তে থাকো, তোমার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোন।" সা'দ রাযি. এর কোরবানী ও কর্মদক্ষতা থেকে অনুমান করা যায় যে, রাসূল ﷺ একমাত্র তাঁর জন্যই নিজের পিতা-মাতাকে উৎসর্গিত হওয়ার কথা বলেছিলেন।[২১১]

শিক্ষা:

০১. মুসলিমদের কোরবানীর বিনিময়েই উড্ডীয়মান থাকে দ্বীনের পতাকা।

০২. রাসূল ﷺ এর প্রতি মুমিনের ভালোবাসার পরিচয় হচ্ছে, তাঁর সম্মান রক্ষার্থে নিজ জীবনের সকল মায়া ভুলে যাবে। প্রয়োজনে হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করবে।

----

২১০. ফাতহুল বারী: ৭/৩৭৩
২১১. সহীহ বুখারী: ১/৪০৭, ২/৫৮০-৫৮১ পৃ.

সাহাবাদের একত্রিত হওয়ার সূচনা

এ সকল ঘটনা সহসায় ঘটে যায়। অপরদিকে অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবা রাযি. প্রথম সারিতে থাকায় রাসূল ﷺ থেকে দূরেই ছিলেন। তাঁরা রাসূল ﷺ এর দিকে দ্রুত আসতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে রাসূল ﷺ আহত হয়ে পড়েছেন। তখন আনসার সাহাবীদের মধ্যে ৬ জন শহীদ হয়ে গেছেন। সপ্তমজন আহত হয়ে পড়ে আছেন। সা'দ ও তালহা রাযি. প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধের সারি থেকে প্রথম যিনি রাসূল ﷺ এর কাছে ফিরে আসেন, তিনি হলেন আবু বকর রাযি. ।

আবু বকর রাযি. বলেন, আমার সাথে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি. আসেন। তিনি এমনভাবে দৌড়াচ্ছিলেন; যেন কোনো পাখি উড়ে আসছে।[২১২]

আবু বকর রাযি. রাসূল ﷺ এর চেহারা থেকে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া খুলতে গেলে আবু উবাইদা রাযি. তাঁকে এ সৌভাগ্যময় কাজ করতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি দাঁত দিয়ে তা উঠিয়ে ফেলেন। এতে দু'বারের চেষ্টায় তাঁর দু'টি দাঁত ভেঙে যায়।[২১৩]

তালহা রাযি. সেদিন আপন বক্ষকে রাসূল ﷺ এর জন্য ঢাল বানিয়ে নেন। তিনি সেদিন দু'টি বা তিনটি ধনুক ভেঙেছিলেন। রাসূল ﷺ একটি গর্তে পড়ে যান। তখন তালহা রাযি. নিজেকে ঢাল বানিয়ে তীরগুলোকে নিজ বক্ষে নিচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ যখন যুদ্ধের অবস্থা দেখার জন্য মাথা উঠাতেন তালহা রাযি. বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আপনি মাথা উঠাবেন না। আমার দেহ আপনার ঢাল হোক।[২১৪] আবু দুজানাহ রাযি. এ সময় রাসূল ﷺ এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজের পিঠকে রাসূল ﷺ এর জন্য ঢাল বানিয়ে দিলেন। তার উপর তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো; অথচ তিনি ছিলেন অনড়। হাতিব ইবনে আবী বালতাআহ রাযি. রাসূল ﷺ কে আঘাতকারী উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে হত্যা করেন। সা'দ রাযি. চাচ্ছিলেন, তিনি তাকে নিজ হাতে হত্যা করবেন। কারণ সে ছিলো সা'দ

---

২১২. ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন।
২১৩. সহীহ ইবনে হিব্বান, তাবারানী, সুনানে দারাকুতনী, কানযুল উম্মাল: ৫/২৭৪
২১৪. সহীহ বুখারী: ২/৫৯১

রাযি. এর ভাই। সাহল রাযি. তখন রাসূল ﷺ এর পাশে থেকে মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন। রাসূল ﷺ নিজেও তীর চালাচ্ছিলেন। তিনি এত অধিক পরিমাণ তীর চালিয়েছেন যে, ধনুকের এক প্রান্ত ভেঙে যায়।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. যুদ্ধ করতে করতে মুখে আঘাত পান, তার দাঁত ভেঙে যায়, গায়ে বিশটিরও অধিক আঘাত লাগে, পায়ে জখম হয়; ফলে তিনি খোঁড়া হয়ে যান। আবু সাঈদ রাযি. এর পিতা মালিক ইবনে সিনান রাযি. রাসূল ﷺ এর গণ্ডদেশের রক্ত চুষে নেন। রাসূল ﷺ বললেন, তা থুথু করে ফেলে দাও। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি থুথু ফেলবো না। তারপর তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

উম্মে উমারাহ নুসাইবাহ বিনতে কা'ব রাযি. নামক এক মহিলা সাহাবী সে সময় অসীম বীরত্ব দেখান। তিনি অন্যান্য মহিলাদের সাথে মুজাহিদদের সেবা করার জন্য এসেছিলেন। তিনি যখন শুনলেন, মুসলিমগণ পরাজিত হয়েছেন আর কুরাইশরা রাসূল ﷺ এর উপর আক্রমণ করেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের মশক ও হাতের জলপাত্র ফেলে সিংহীর ন্যায় মুশরিকদের উপর তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করতে লাগলেন। ইবনে কামিয়া তাঁর উপর খুব জোরে আঘাত করে বসে; ফলে তিনি গভীর জখমি হয়ে পড়েন। তিনিও ইবনে কামিয়ার উপর আঘাত হানেন; কিন্তু সে নরাধম দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করেছিলো, এ কারণে বেঁচে যায়। শত্রুদের বর্শার আঘাতে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যান। তারপরও তিনি সমভাবে লড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁর এ যুদ্ধের বর্ণনাকালে বলেছেন, আমি সেদিন ডানে বামে যেদিকেই তাকাই সেদিকেই উম্মে উমারাহকে আমাকে রক্ষার জন্য লড়াইরত দেখতে পাই।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পতাকা মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. এর হাতে ছিলো। শত্রুদের তীর ও তরবারির আঘাতে একপর্যায়ে তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে। তখন ইবনে কামিয়া তাঁর ডান হাতের উপর আঘাত হানলে তাঁর সে হাতটি কেটে যায়। তিনি পতাকাকে বাম হাতে নেন; কিন্তু সে এ হাতেও আঘাত করলে এটিও কেটে পড়ে যায়। সাথে সাথে একটি তীর এসে তাঁর ঈমান, জ্ঞান ও বীরত্বপূর্ণ বক্ষকে ভেদ করে চলে যায়। ফলে

তিনি শহীদ হয়ে যান। যেহেতু রাসূল ﷺ এর আকৃতির সাথে তাঁর মিল ছিলো; তাই ইবনে কামিয়া ঘোষণা করতে থাকলো, সে রাসূল ﷺ কে হত্যা করেছে।[২১৫]

শহীদ হওয়ার খবর ও তার প্রতিক্রিয়া

রাসূল ﷺ এর শাহাদাতের মিথ্যা খবর শুনে মুসলিমগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। দু'একজন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে মদীনায় চলে যায়। অপর দল মুনাফিক সর্দারের মধ্যস্থতায় কুরাইশদের থেকে নিরাপত্তা লাভের কথা ভাবে। অপর আরেক দল তখনও প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে মুশরিকদের কতিপয় তো রাসূল ﷺ এর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ শুনে নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে বলে আক্রমণ বন্ধ করে দেয়। তখন তারা শহীদদের মুসলা করতে শুরু করে।

শিক্ষাঃ

> মুসলিমদের হীনবল করতে কুফফাররা নানা অপবাদ রটায়। তাই বিচলিত না হয়ে পূর্ণ উদ্যমে তাদের মোকাবেলা করতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর পুনরায় আধিপত্য লাভ

মুসআব রাযি. এর শাহাদাতের পর রাসূল ﷺ আলী রাযি. এর হাতে পতাকা দেন। তখন উপস্থিত সাহাবাগণ অতুলনীয় বীরত্বের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, সামনে গিয়ে আগত সাহাবাদের দিকে পথ তৈরি করতে পারবেন। তিনি সামনে এগুতে থাকলেন। সর্বপ্রথম তাঁকে কা'ব ইবনে মালিক রাযি. চিনতে পারলেন। তিনি খুশিতে চিৎকার করে বলে উঠেন, হে মুসলিমগণ! তোমরা আনন্দিত হও। এই যে রাসূল ﷺ। রাসূল ﷺ তাঁকে ইশারায় চুপ থাকতে বলেন; যেন মুশরিকরা টের না পায়। কিন্তু ততক্ষণে মুসলিমদের কানে কা'ব রাযি. এর এ আওয়াজ পৌঁছে যায়। তাই তাঁরা রাসূল ﷺ এর আশ্রয়ে চলে আসতে শুরু করেন। আর ধীরে ধীরে ৩০ জন সাহাবী একত্রিত হয়ে যান।

---

২১৫. ইবনে হিশামঃ ১/৭১-৮৩ পৃ.; যাদুল মাআদঃ ২/৯৭

যখন তাঁরা সমবেত হয়ে যান রাসূল ﷺ তখন পাহাড়ের ঘাঁটির দিকে যেতে লাগলেন। যেন মুশরিকরা মুসলিমদেরকে ঘিরে ফেলার যে চক এঁকে ছিলো, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই তারা মুসলিমদেরকে পাহাড়ের দিকে যেতে বাধা দিতে থাকে। কিন্তু মুসলিম বীরদের সামনে তাদের কোনো শক্তি ও বুদ্ধিই কাজে আসলো না।

আল্লাহর আসমানী কুদরতে এরকম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলার সময়ই মুসলিম যোদ্ধাগণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, এটি ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্রাম ও প্রশান্তি। আবু তালহা রাযি. বলেন, তন্দ্রাচ্ছন্নদের মাঝে আমিও ছিলাম। এমনকি আমার হাত থেকে কয়েকবার তরাবারি পড়ে যায়। তরবারি একবার পড়ে গেলে আমি তা ধরে নিই। আবার পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নিই।[২১৬] মোট কথা, রাসূল ﷺ পাহাড়ের ঘাঁটিতে এসে পৌঁছেন আর অন্যদের জন্য আসার রাস্তা করে দেন। অবশিষ্ট সৈন্যরা যখন তাঁর কাছে এসে পৌঁছান, তখন খালিদ বাহিনী অকৃতকার্য হয়ে যায়।

শিক্ষা:

হক্ব-বাতিলের লড়াইয়ে আল্লাহর নীতি হলো, কখনো মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করেন, আবার কখনো শত্রুপক্ষ বাহ্যিক বিজয় দেখে। তবে জয়-পরাজয় উভয় অবস্থাতেই মুমিনদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়। প্রকৃতপক্ষে মুমিন মুজাহিদগণ সর্বদাই তাঁদের সত্য আদর্শের উপর অবিচল থাকেন; যদিও বাহ্যিকভাবে তাঁরা কঠিন কঠিন মুহূর্তের মধ্যেও পতিত হোন।

উবাই ইবনে খালাফের হত্যা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ যখন ঘাঁটিতে পৌঁছে যান, তখন উবাই ইবনে খালাফ এগিয়ে গিয়ে বলে, কোথায় মুহাম্মাদ? আজ হয় তিনি থাকবেন, না হয় আমি। সাহাবাগণ তাকে হত্যার অনুমতি চাইলে তাদেরকে নিবৃত্ত করে রাসূল ﷺ তাকে আসতে দিতে বলেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র বর্শা

২১৬. সহীহ বুখারী: ২/৫৮২

চেয়ে তা নিয়ে নাড়া দেন। তারপর তিনি তার মুখোমুখী হোন। তিনি তার শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মধ্যস্থলে গলার পাশে সামান্য জায়গা খোলা দেখে সেটা লক্ষ্য করে বর্শা মারেন। ফলে সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। তার ঘাড়ে তেমন কোনো আঁচড় লাগেনি। সে মুশরিকদের মধ্যে ফিরে গিয়ে বললো, মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে হত্যা করে ফেলেছে। তারা তাকে বললো, তোমার তো তেমন আঘাত লাগেনি। উত্তরে সে বললো, তিনি মক্কায় বলেছেন, আমাকে হত্যা করবেন। তিনি যদি আমাকে শুধু থুথু দিতেন; তবুও আমার জীবন শেষ হয়ে যেতো।[২১৭] বর্ণিত আছে, সে তখন বলদের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে বলছিলো, যদি এ ব্যথা যুল মাজাযের সমস্ত অধিবাসীর মাঝে ভাগ করে দেওয়া হতো; তবে তারা সবাই মারা যেতো।[২১৮]

শিক্ষা:

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন এবং তাদের উপর আক্রমণ চালানো রাসূল ﷺ এর আখলাক ও আদর্শ।

রাসূল ﷺ এর পাহাড়ে আরোহণ

পাহাড়ে উঠার সময় রাসূল ﷺ এর সামনে একটি টিলা পড়ে। তিনি তাতে উঠতে চেষ্টা করেও সক্ষম হলেন না। কেননা তিনি দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন; ফলে তাঁর শরীর ভারী ছিলো। অপরদিকে তিনি ছিলেন কঠিন আঘাতপ্রাপ্ত। তখন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযি. নিচে বসে পড়েন এবং তাঁকে আরোহণ করিয়ে টিলার উপর পৌঁছে দেন। রাসূল ﷺ তখন বললেন– أَوْجَبَ طَلْحَةُ "তালহা (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে।"[২১৯]

মুশরিকদের শেষ প্রচেষ্টা

রাসূল ﷺ যখন ঘাঁটির মধ্যে পৌঁছে যান, তখন মুশরিকরা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। তখন আবু সুফইয়ান ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে

২১৭. ইবনে হিশাম: ২/৮৪; যাদুল মাআদ: ০৭
২১৮. মুখতাসারুস সীরাহ: ২৪০
২১৯. ইবনে হিশাম:২/৮৬

একটি দল পাহাড়ে উপর উঠে পড়ে। রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন। তখন উমর রাযি. ও একটি মুহাজির দল যুদ্ধ করে তাদেরকে পাহাড় থেকে নিচে নামিয়ে দেন।[২২০]

শহীদগণকে মুসলাকরণ

রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর মুশরিকরা তা বিশ্বাস করেই চলে যাওয়ার পথ ধরলো। তখন তাদের কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ শহীদদের মুসলা করে তথা নাক-কান ইত্যাদি কেটে ফেলে। হিন্দা বিনতে উতবা হামযা রাযি. এর কলিজা ফেড়ে তা মুখে দিয়ে চিবাতে থাকে। সে তা গিলে ফেলার ইচ্ছে করে; কিন্তু গিলতে পারেনি বলে থুথু করে ফেলে দেয়। সে কাটা নাক-কান দিয়ে গোছা ও হার বানিয়ে নেয়।[২২১]

শিক্ষা:

শাহাদাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের প্রতি সর্বোচ্চ মর্যাদা। আর যে শহীদগণকে মুসলা করা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তাঁদের মর্যাদা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

আবু সুফইয়ানের আনন্দ প্রকাশ ও উমর রাযি. এর সাথে কথোপকথন

মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করলে আবু সুফইয়ান কে দেখা যায় উহুদ পাহাড়ের উপর। সে উচ্চস্বরে বললো, মুহাম্মাদ ﷺ, আবু বকর, উমর আছে কি? রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে উত্তর দিতে নিষেধ করেছিলেন। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করার পর সে বললো, যাক, তাহলে এদের থেকে অবশেষে নিস্তার পাওয়া গেছে। তখন উমর রাযি. এর গায়রত জেগে উঠলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করার উৎস এখনো বাকি রেখেছেন।

দ্বিতীয়বার বদরে লড়াই করার ঘোষণা

ইবনে ইসহাক বলেন, যখন আবু সুফইয়ান ও তার সাথীরা ফিরে যাচ্ছিলো সে মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললো, আগামী বছর বদরে আবার যুদ্ধ করার

---

২২০. প্রাগুক্ত

২২১. ইবনে হিশাম: ২/৯০

প্রতিজ্ঞা থাকলো। রাসূল ﷺ একজন সাহাবীকে উত্তর দিতে বললেন, ঠিক আছে। এটারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।[২২২] তারপর রাসূল ﷺ আলী রাযি. কে পাঠিয়ে দিলেন এ খবর জানার জন্য যে, তারা কী সত্যিই ফিরে গেলো, না মদীনা আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছে? আলী রাযি. এসে জানালেন, তারা চলে গেছে।[২২৩]

শহীদ ও আহতদের খোঁজ

মুশরিক বাহিনীর ফিরে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ শহীদ ও আহতদের খোঁজ করার জন্য আদেশ দেন। মুসলিমগণ আহতদের মধ্যে উসাইরিমকে দেখতে পান। যার মূল নাম হলো আমর ইবনে সাবিত। তিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায়। মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে আসার সময়ও তিনি মদীনায় থাকা কালে ঈমান আনেননি। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, তোমাকে কোন জিনিস এখানে নিয়ে এলো? তোমার কওম চেতনা না ইসলামের আকর্ষণ? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করেছি। সে জন্যই আমি এখানে। এ কথা বলার পর তিনি চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েন। রাসূল ﷺ এর সামনে এ ঘটনা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, هو من أهل الجنة "সে জান্নাতবাসী।" আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, অথচ তিনি এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করেননি। [কেননা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেই জিহাদে শরীক হয়ে যান। ততক্ষণে কোনো নামাজের ওয়াক্তই আসেনি।][২২৪]

আহতদের মধ্যে আরেকজনের নাম কুযমান। তাকে সাহাবাগণ বনু যাফারের মহল্লায় নিয়ে যান। সে মূলত একাই সাত-আটজন মুশরিককে হত্যা করেছিলো। তাকে যখন সাহাবায়ে কেরাম এ জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছিলেন। সে বললো, আমি এসব শুধু আমার কওমের মর্যাদার জন্য করেছি। এরপর জখমের যন্ত্রণায় সে নিজেকে জবাই করে হত্যা করে। এরপর রাসূল ﷺ এর কাছে তার আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, إنه من أهل النار "নিশ্চয়ই সে জাহান্নামী।"[২২৫]

---

২২২. ইবনে হিশাম: ২/৯৪

২২৩. ইবনে হিশাম: ২/৯৪; ফাতহুল বারী: ৭/৩৪৭: এখানে সা'দ রাযি. কে পাঠানোর কথা আছে।

২২৪. যাদুল মাআদ: ২/৯৪; ইবনে হিশাম: ২/৯০

২২৫. যাদুল মাআদ: ২/৯৭-৯৮ পৃ.; ইবনে হিশাম: ২/৮৮

শিক্ষাঃ

০১. "ঈমান তাজা করে তারপর জিহাদে যাবো" "দাওরায়ে হাদীস পড়া শেষ করে কিংবা ইলমের গভীর জ্ঞান অর্জন করে তারপর জিহাদে অংশ গ্রহন করবো" ইসলামে এমন বক্তব্যের কোনো সুযোগ নেই। বরং জিহাদে গেলেই ঈমান তাজা হয়। জিহাদে শরীক থেকেই ইলম শেখা যায়। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন স্বয়ং সে সকল সাহাবায়ে কেরাম; যাঁরা ঈমান আনার পর এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সময়ও পাননি। ইলম শেখারও সুযোগ পাননি; কিন্তু ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন।

০২. কুযমানের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে জাতীয়তাবাদের কোনো স্থান নেই। আর এ জন্যই রাসূল ﷺ এর কিয়াদতে ও সাহাবাদের মোবারক জামাতে শরীক থেকেও কুযমান জাহান্নামী হলো।

শহীদদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা

রাসূল ﷺ শহীদগণকে তাঁদের শাহাদাতের স্থানে কবর দিতে আদেশ দিলেন। তিনি দু'তিনজনকে একটি কবরে রাখতেন। দু'দুজনকে একই কাপড়ে কাফন দিতেন।[২২৬]

হানযালা রাযি. এর দেহ অদৃশ্য ছিলো। তারপর দেখা গেলো এক জায়গায় তাঁর দেহ যমীন থেকে উপরে রয়েছে; তাঁর শরীর থেকে তখন টপটপ করে পানি পড়ছিলো। এ দেখে রাসূল ﷺ বললেন, ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো, ব্যাপারটি কী ছিলো? জিজ্ঞেস করার পর তাঁর স্ত্রী প্রকৃত ঘটনাটি জানালেন। আর এখান থেকেই হানযালা রাযি. এর নাম গাসীলুল মালাইকা হয়ে যায়।[২২৭]

প্রকৃতপক্ষে শহীদগণের দৃশ্য ছিলো অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। হামযা রাযি. এর জন্য কালো একটি চাদরের টুকরা ব্যতীত আর কাফনের কাপড় পাওয়া যায়নি। তা দিয়ে মাথা আবৃত করলে পা খোলা থেকে যেতো আর পা আবৃত

২২৬. যাদুল মাআদ: ২/৯৮; সহীহ বুখারী: ২/৫৮৪ পৃ.
২২৭. যাদুল মাআদ: ২/৯৪

করলে মাথা খোলা থেকে যেতো। অবশেষে মাথা ঢেকে পায়ের উপর ইযখার ঘাস চাপিয়ে দেওয়া হয়।[২২৮] মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. এর মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকতো আর পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকতো। এ অবস্থায় রাসূল ﷺ আগের মতো ইযখার ঘাস দিয়ে তাঁর পা ঢেকে দিতে বললেন।[২২৯]

শিক্ষাঃ

> সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাঁদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাই তো তাঁদের কাফনের জন্য পরিপূর্ণ কাপড় পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কারণ তাঁরা নিজেদের জান-মাল দু'টোই আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

সাহাবাগণ মদীনায় ফেরার পথে বনু দীনার গোত্রের এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; যার স্বামী, ভাই, পিতা উহুদ প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁকে এ সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বলে উঠেন, রাসূল ﷺ এর কী খবর? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, তুমি যেমন চাও তিনি তেমন আছেন। মহিলাটি বললেন, আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। সাহাবাগণ তাঁকে দেখিয়ে দিলে তিনি বলে উঠলেন,

كل مصيبة بعدك جَلَلٌ

"আপনাকে পেলে সকল মুসীবতই নগণ্য।"[২৩০]

তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সন্ধার আগে রাসূল ﷺ মদীনায় পৌঁছেন। তিনি তাঁর তরবারিটি ফাতিমা রাযি. কে দিয়ে বললেন, এর রক্ত ধুয়ে দাও। আজ এটি আমার নিকট খুবই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আলী রাযি.ও একই কথা বলেন।[২৩১]

---

২২৮. মুসনাদে আহমাদঃ ১/১৪০
২২৯. সহীহ বুখারীঃ ২/৫৭৯ ও ৫৮৪
২৩০. ইবনে হিশামঃ ৯৯
২৩১. ইবনে হিশামঃ ১০০

শিক্ষাঃ

সুবহানাল্লাহ! এমন-ই তো হবে রাসূল ﷺ এর প্রতি মুমিনগণের ভালোবাসা। নিজের জীবন, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু থেকে রাসূল ﷺ এর প্রতি অধিক ভালোবাসা ঈমানের দাবি।

শহীদ ও কাফেরদের নিহতের সংখ্যা

মুসলিমদের শহীদদের সংখ্যা ছিলো ৭০ জন। মুশরিকদের নিহতের সংখ্যা ছিলো ২২ জন মতান্তরে ৩৭ জন।[২৩২]

গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে কুরাইশের মুশরিক বাহিনীর পাল্লা ভারী থাকলেও তারা কোনো উপকার লাভ করতে পারেনি। তাই তারা লজ্জিত হয়ে ফিরে এসে আক্রমণ করার আশঙ্কা ছিলো। তাই তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। সেজন্য রাসূল ﷺ তৃতীয় হিজরীর ৮ই শাওয়াল তথা উহুদ যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন রবিবার ঘোষণা দেন, শত্রুদের মোকাবেলার জন্য বের হতে হবে। আর এতে শুধু তাঁরাই অংশগ্রহণ করবে; যাঁরা উহুদে অংশগ্রহণ করেছিলো। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যাওয়ার অনুমতি চায়। রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দেননি।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মদীনা থেকে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদে শিবির স্থাপন করা হয়। এদিকে মা'বাদ ইবনে আবু মা'বাদ খুযায়ী রাসূল ﷺ এর কাছে এসে ইসলাম কবুল করেন। মুশরিকরা তার ব্যাপারে জানতো না। তাই রাসূল ﷺ তাঁকে আবু সুফইয়ানের কাছে পাঠালেন; যেন কুরাইশদের কে তিনি হতোদ্যম করে দেন।

মুশরিকরা তখন মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে রাওহা নামক স্থানে ছিলো। তারা পরস্পরকে ভর্ৎসনা করতে থাকলো। তারপর তারা পুনরায় মদীনা আক্রমণের চক আঁকলো। এবার তারা মুসলিমদেরকে মূলোৎপাটন করে ফেলবে। তারা এখনো শিবির ছেড়ে বের হয়নি এমন সময় মা'বাদ এসে উপস্থিত। তাঁকে আবু সুফইয়ান মুসলিমদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি

২৩২. ইবনে হিশামঃ ২/১২২-১২৯ পৃ.; ফাতহুল বারীঃ ৭/৩৫

বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বিপুল আয়োজনে এগিয়ে আসছে। এবার মদীনার সকল মুসলিমই এতে যোগ দিয়েছে। এ শুনে আবু সুফইয়ান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তারা মক্কায় ফিরে যাওয়া ব্যতীত কোনো পথ দেখলো না।

আবু সুফইয়ান মক্কায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। মুসলিম বাহিনী যেন তাদের পিছু না নেয়; তাই সে একটি বণিক দলকে বিনিময় দেওয়ার শর্তে এ কথা বলতে বলে যে, আবু সুফইয়ানের বাহিনী পুনরায় মদীনা আক্রমণের জন্য আসছে। তারা এ কথা মুসলিমদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে যায়।[২৩৩] হামরাউল আসাদকে ভিন্ন করে উল্লেখ করলেও তা মূলত উহুদ যুদ্ধের অংশ।

শিক্ষা:

> যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালীন এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে; যেন শত্রুবাহিনী ভীত হয়ে পড়ে।

উহুদ যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কারা বিজয়ী হয়েছিলো?

এ যুদ্ধটি পর্যালোচনা করলে একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, এ যুদ্ধে মুসলিমদের জয় হয়েছে না পরাজয় হয়েছে? এ যুদ্ধে মুশরিকরা কিছু করতে পেরেছিলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ যুদ্ধে মুশরিকরা বিজয়ী হয়নি। প্রথমত, মুশরিক বাহিনী মুসলিম বাহিনীর শিবির দখল করতে পারেনি। মুসলিমগণ ময়দান ছেড়ে মদীনার দিকে পালিয়ে যায়নি। বরং তাঁরা নেতৃত্বের কেন্দ্রে একত্রিত হয়। দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের এমন অবস্থাও হয়নি যে, মুশরিক বাহিনী তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে। মুসলিম বাহিনীর কোনো সদস্যই তাদের হাতে বন্দী হোননি। তৃতীয়ত, কাফেররা মুসলিমদের থেকে কোনো গনীমতও লাভ করতে পারেনি। চতুর্থত, মুসলিম বাহিনী তাঁদের শিবিরে অবস্থান করেছেন। কিন্তু কুরাইশরা তৃতীয় দফায় যুদ্ধের জন্য সেখানে অবস্থান করেনি। সর্বোপরি, জয়লাভকারীর

২৩৩. উহুদ ও হামরাউল আসাদ অভিযানের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, যাদুল মাআদ: ২/৯১-১০৮ পৃ.; ইবনে হিশাম: ২/৬০-১২৯ পৃ.; ফাতহুল বারী: ৭/৩৪৫-৩৭৭ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ২৪২-২৫৭ পৃ.

একটি নীতি হলো যুদ্ধের ময়দানে এক বা দু'দিন পর্যন্ত অবস্থান করা। তারা তা না করে খুব দ্রুতই প্রত্যাবর্তন করে। পরে মুশরিক বাহিনী নারী ও সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও তারা মদীনায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। অথচ এটা ছিলো স্পষ্ট বিজয়ের অন্যতম লক্ষণ।

সবকিছু পর্যালোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এ যুদ্ধে মুসলিমদের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে মুশরিকরা জয় লাভ করতে পারেনি।
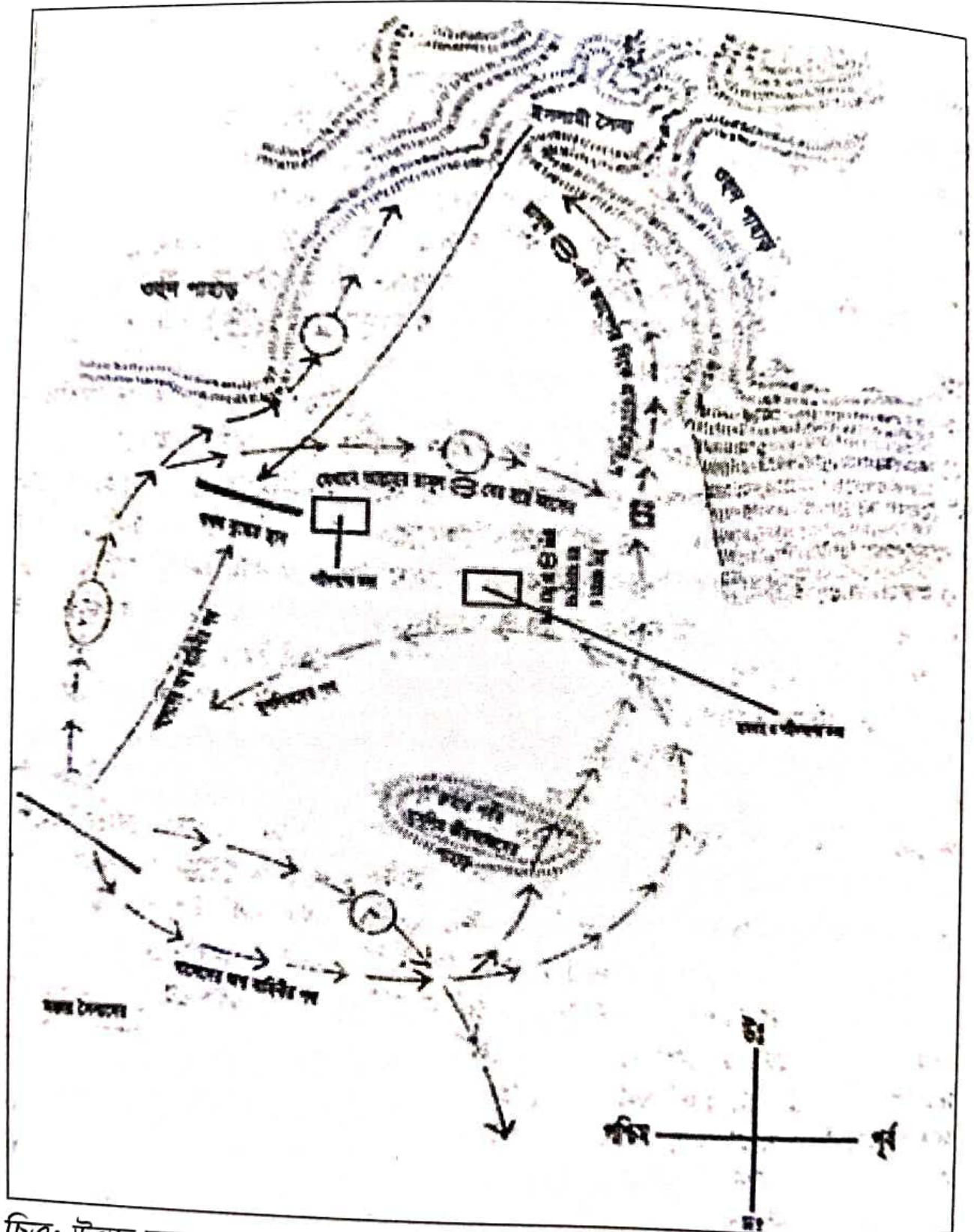
চিত্র: উহুদ যুদ্ধ

এ যুদ্ধে মহান রবের উদ্দেশ্য ও রহস্য

০১. মুনাফিকদেরকে মুসলিমদের থেকে আলাদা করা।

০২. মুসলিমগণ নিজেদের আমালের দ্বারা মর্যাদার যে স্থানে পৌঁছতে সক্ষম

হয় না; তাঁদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করে সে স্থানে পৌঁছানো।

০৩. শাহাদাতের মর্যাদা দানের জন্য।

০৪. মুমিনদেরকে গুনাহ মুক্ত করার জন্য।[২৩৪]

শিক্ষা:

> বিপদাপদ ও পরীক্ষায় নিপতিত করে আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাগণকে এমন মর্যাদায় ভূষিত করেন; যা তারা সুখ-সাচ্ছন্দে থেকে অন্যান্য ইবাদতের দ্বারা অর্জন করতে সক্ষম হয় না।

উহুদ ও আহযাব যুদ্ধের মধ্যবর্তী অভিযানসমূহ

০১. আবু সালামাহ্ রাযি এর অভিযান: উহুদ যুদ্ধের পর প্রথম মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো বনু আসাদ ইবনে খুযাইমাহ গোত্র। তাদের মদীনায় আক্রমণের সংবাদ অবগত হলে রাসূল ﷺ আবু সালামাহ রাযি. এর নেতৃত্বে ১৫০ সদস্যবিশিষ্ট একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করার ফলে তারা পরাজয় বরণ করে। পরে মুসলিম বাহিনী গনীমত নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযান হয়েছিলো চতুর্থ হিজরীর মুহাররম মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর।

০২. আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি. এর অভিযান: চতুর্থ হিজরীর মুহাররম মাসের পাঁচ তারিখে এ সংবাদ আসে যে, খালিদ ইবনে সুফইয়ান মুসলিমদের আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছে। তখন রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস কে প্রেরণ করেন। তিনি ১৮ দিন মদীনার বাহিরে অবস্থান করে খালিদের মাথা নিয়ে মদীনায় আগমন করেন এবং মাথাটি রাসূল ﷺ এর সামনে পেশ করেন।

০৩. রাযী'র ঘটনা: চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আযাল এবং ক্বারাহ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি তাদের মাঝে কিছু কিছু ইসলামের চর্চা রয়েছে, এ কথা বলে রাসূল ﷺ এর নিকট কিছু মুয়াল্লিমের আবদার করে। বুখারীর বর্ণনা মতে

২৩৪. ফাতহুল বারী: ৭/৩৪৭

রাসূল ﷺ ১০ জন সাহাবীকে পাঠালেন। কিন্তু তারা রাযী' নামক ঝর্ণার নিকট গেলে বনু লাহইয়ানকে তাদের উপর লেলিয়ে দেয়। এ গোত্রের লোকেরা ৭ জন সাহাবীকে শহীদ করে এবং ৩ জনকে বন্দী করে। এ ৩ জনের মধ্যে একজনকে তারা পথে শহীদ করে ফেলে আর খুবাইব রাযি. কে মক্কায় মর্মান্তিকভাবে শহীদ করা হয় এবং যায়েদ ইবনে দাসিন্নাহ রাযি. কে সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ ক্রয় করে শহীদ করে দেয়।

০৪. বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা: রাযী'র ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মাসেই বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিলো। আবু বারা আমির ইবনে মালিক একদা রাসূল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হলো। রাসূল ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে গ্রহণও করেনি, তা থেকে ফিরেও আসেনি। সে নাজদবাসীর নিকট দাওয়াতের জন্য রাসূল ﷺ এর নিকট কয়েকজন সাহাবীকে পাঠানোর আবদার করলে রাসূল ﷺ বললেন, আমি নাজদবাসীদের থেকে সাহাবীদের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি। আবু বারা বললো, তাঁরা আমার আশ্রয়ে থাকবে। তাই ৪০ জন মতান্তরে ৭০ জনের বিজ্ঞ ক্বারী এবং শীর্ষস্থানীয় একটি দলকে রাসূল ﷺ তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা মাউনা কূপের নিকট পৌঁছলে রাসূল ﷺ এর পত্রসহ হারাম ইবনে মিলহানকে আমির ইবনে তুফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। সে তাঁকে হত্যা করে এবং অবশিষ্ট সাহাবীদের মোকাবেলা করার জন্য উসাইয়া, রে'ল ও যাকাওয়ান গোত্রকে একত্রিত করে। সাহাবীগণ রাযি. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং একজন ব্যতীত সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। পাশেই উট চরাচ্ছিলেন অন্য দু'জন সাহাবী। তাঁদের একজন যুদ্ধ করে শহীদ হোন। অপরজন বন্দী হোন। তিনি ঘটনাক্রমে মুক্তি পেয়ে মদীনায় এ মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পৌঁছান। রাসূল ﷺ এ ঘটনা শুনে এতই কষ্ট পান যে, তিনি এক মাস যাবৎ আল্লাহর সমীপে তাদের জন্য বদদুআ করতে থাকেন। [উল্লেখ্য, রাসূল ﷺ অনেক স্থানে কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করে গেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করেননি। উল্টো তাদের হিদায়াতের জন্য দুআ করেছেন। আবার এরকমও হয়েছে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রতি বদদুআ করেছেন। এমন কয়েকটি উদাহরণ–

(ক.) রাসূল ﷺ এর কন্যা রুকাইয়া রাযি. ও উম্মে কুলসুম রাযি. ছিলেন যথাক্রমে আবু লাহাবের ছেলে উতবা ও উতাইবার স্ত্রী। সূরা লাহাব নাযিল

হওয়ার পর আবু লাহাব রাসূল ﷺ এর দু'কন্যাকে তালাক দেওয়া ব্যতীত তার ছেলেদের সাথে কথা না বলার শপথ করে। তাই তারা তাঁদেরকে তালাক দিয়ে দেয়। সাথে সাথে উতাইবা রাসূল ﷺ এর শানে কদর্যপূর্ণ কথা বলে। তখন রাসূল ﷺ তার বিরুদ্ধে বদদুআ করে বলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আপনার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর তার বিরুদ্ধে ন্যস্ত করুন।" সে এভাবেই পরে মারা যায়।[২৩৫]

(খ.) খন্দকের যুদ্ধের সময় কাফেরদের কারণে রাসূল ﷺ এর আসর নামাজ কাযা হয়ে যায়। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছিলেন– "আল্লাহ তাদের কবর ও ঘরকে আগুন দ্বারা ভরে দিন। তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামাজ থেকে বিরত রেখেছে; এমনকি সূর্য পর্যন্ত অস্ত গেছে।"

(গ.) বীরে মাউনার ঘটনায় রাসূল ﷺ এক মাস যাবৎ ফজরের নামাজে কুনুতে নাযিলাহ পড়ে বদদুআ করেছেন।

(ঘ.) নবম হিজরীর পহেলা সফর আব্দুল্লাহ ইবনে আউসাজাহ রাযি. এর নেতৃত্বে কয়েকজন সাহাবীকে বনু হারিসাহকে দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়। তারা দাওয়াত কবুল না করলে রাসূল ﷺ তাদের বুদ্ধি অকার্যকর হওয়ার জন্য বদদুআ করেন।]

০৫. বনু নাযীর যুদ্ধঃ বনু কিলাব গোত্রের যেই দু'ব্যক্তিকে আমির ইবনে উমাইয়া যামরী ভুলক্রমে হত্যা করেছিলেন, তাদের শোনিতপাতের খেসারত সম্পর্কে কথোপকথনের জন্য রাসূল ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে বনু নাযীর গোত্রে যান। তাদের সাথে অঙ্গীকার থাকার কারণে সাহায্য করা তাদের কর্তব্য ছিলো। তারা এ বলে আশ্বাস দিলো যে, আমরা আপনার কথামতোই কাজ করবো। রাসূল ﷺ তখন একটি দেয়ালের সাথে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এ সুযোগে তারা ছাদের উপর থেকে রাসূল ﷺ এর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু জিবরাঈল আ. রাসূল ﷺ কে তা জানিয়ে দিলে তিনি সেখান থেকে সরে যান। মদীনায় এসে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি. কে এ বলে তাদের কাছে পাঠান যে, তারা

---

২৩৫. বিস্তারিত: উসুদুল গাবাহ।

যেন দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যায়। তাই তারা অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। কিন্তু মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর উসকানির কারণে তারা মদীনা না ছেড়ে সেখানেই রয়ে যায় এবং রাসূল ﷺ এর নিকট এ বার্তা পাঠায় যে, তারা কিছুতেই তাদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করবে না। তিনি যা করতে চান তা করতে পারেন। এ পরিস্থিতিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছিলো মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারণ তাঁরা খুব নাজুক সময় অতিবাহিত করছিলেন। অবশেষে রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে বনু নাযীরকে অবরোধ করলেন। অপরদিকে তাদের হালীফ বনু কুরাইযাহ ও গাত্বাফান গোত্র তাদের সাহায্য করেনি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেনি। তাই তাদেরকে ৬ মতান্তরে ১৫ রাত্রি অবরোধ করে রাখার পর তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। তারা রাসূলের নিকট এ প্রস্তাব করে যে, তারা মদীনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। রাসূল ﷺ তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই মর্মে যে, তারা অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যাদি উটের পিঠে করে নিয়ে যেতে পারবে এবং তাদের পরিবারকেও সাথে নিয়ে যেতে পারবে। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যক ইয়াহুদী এবং তাদের প্রধানগণ যেমন হুয়াই ইবনে আখতাব এবং সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইক খায়বার অভিমুখে চলে যায়। কেউ যায় সিরিয়ার দিকে। তারা ৬০০ উটের উপর সবকিছু বোঝাই করে নিয়ে যায়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো চতুর্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে।

০৬. নাজদ যুদ্ধঃ বনু নাযীর যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে রাসূল ﷺ সেই সব ওয়াদাভঙ্গকারী বেদুইনদের শায়েস্তা করার চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তিনি সংবাদপ্রাপ্ত হোন যে, বনু মুহারিব ও বনু সা'লাবাহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেদুইনদের থেকে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এমন সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ নাজদ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। যেন তারা মুসলিমদের সাথে পূর্বের ন্যায় কোনো হঠকারিতা করার সাহস না পায়। এদিকে বেদুইনদের মধ্য হতে যারা লুণ্ঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, মুসলিমদের আকস্মিক আক্রমণে তারা পলায়ন করে। মুসলিমগণ তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করার পর নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। জীবনী লেখকগণ এ সময়ে নাজদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। সময়টি ছিলো চতুর্থ হিজরীর রবিউল আখের বা জুমাদাল উলা মাস। এ সময়ে সংগঠিত হওয়া যুদ্ধের নাম নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

০৭. দ্বিতীয় বদর যুদ্ধঃ বেদুইনদেরকে শায়েস্তা করার পর রাসূল ﷺ আবু সুফইয়ানের সাথে ওয়াদাকৃত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাই চতুর্থ হিজরীর শাবান মোতাবেক ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ১৫০০ জন সাহাবী ও ১০ টি ঘোড়াসহ রাসূল ﷺ বিঘোষিত বদর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে আবু সুফইয়ানের অপেক্ষা করছিলেন। তারা ৫০ জন ঘোড়সওয়ারসহ ২০০০ সৈন্য নিয়ে মাররুয-যাহরান নামক স্থানে মাজান্নাহ নামক প্রসিদ্ধ ঝর্ণার নিকট শিবির স্থাপন করে। কিন্তু তারা রওয়ানা হওয়ার পর যুদ্ধের জন্য অনীহাবোধ করতে থাকে। আবু সুফইয়ানও সম্পূর্ণভাবে মনোবল হারিয়ে ফেলে। সে মক্কা প্রত্যাবর্তনের জন্য বিভিন্ন ছল-চাতুরী করতে থাকে। সফর অব্যাহত রাখা বা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কেউ মত দেয়নি। এদিকে রাসূল ﷺ ৮ দিন বদর প্রান্তরে অবস্থান করে অত্যন্ত শান শওকতের সাথে মদীনায় ফিরে আসেন। এ যুদ্ধ গযওয়ায়ে বদরে মাওয়ুদ বা বদরে আখের বা বদরে সুগরা নামেও পরিচিত।

০৮. গযওয়ায়ে দুমাতুল জান্দালঃ দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে পূর্ণ ছয় মাস রাসূল ﷺ প্রশান্তির সাথে মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি অবগত হলেন, সিরিয়ার নিকটবর্তী দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানের আশপাশে বসবাসরত গোত্রগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমনকারী লোকজনদের উপর চড়াও হয়ে তাদের মালামাল লুটপাট করে। এ সংবাদও আসে যে, তারা মদীনায় আক্রমণের জন্য এক বিশাল সৈন্য জমায়েত করছে। তাই রাসূল ﷺ পঞ্চম হিজরীর ২৫ শে রবিউল আউয়াল মাসে ১০০০ জন সৈন্যের সমন্বয়ে একটি বাহিনী নিয়ে সে স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। সেখানে মুসলিম বাহিনী কয়েক দিন অবস্থান করে কাউকে না পেয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শিক্ষাঃ

কাফের-মুশরিকদের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, তাদের দুর্বল করে রাখাই ইসলামের শিক্ষা।

গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দক যুদ্ধ)

[পঞ্চম হিজরী শাওয়াল মাস]

এক বছর যাবৎ সামরিক অভিযানের প্রেক্ষাপটে আরব উপদ্বীপে শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু যে সকল ইয়াহুদীকে নিজেদের দুষ্কর্ম ও চক্রান্তের কারণে নানা প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা গ্রহণ করতে হয়েছিলো। তখনো তাদের চেতনা উদয় হয়নি। তাদের বিশ্বাস ঘাতকতা ও নানাবিধ কাজের অশুভ পরিণামের পরেও তাদের কোনো শিক্ষাই হয়নি। মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে তাদের অন্তর জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিলো। তাই তারা নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা শেষবারের মতো মুসলিমদের উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিলো; যেন তাঁদেরকে সমূলে নির্মূল করতে পারে। তাই বনু নাযীর গোত্রের ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মক্কার কুরাইশদের কাছে আসে রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হতে। তারা যুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়। এরপর তারা বনু গাত্বাফানের নিকট গিয়ে তাদেরকেও তাদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। এভাবে ইয়াহুদীরা বড় বড় গোত্র ও দলগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে।

তারা সকলে একটি নির্ধারিত সময় অনুযায়ী মদীনার দিকে রওয়ানা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে মদীনার পাশে ১০০০০ সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী এসে উপস্থিত হয়। এ সংখ্যা মদীনার নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ ও যুবকদের সমষ্টিগত সংখ্যার চেয়েও বেশি।

তবে মদীনার নেতৃত্ব ছিলো অত্যন্ত সজাগ। কাফেরদের বিশাল বাহিনী যখন যাত্রা করে, তখন মদীনার সংবাদ সংগ্রহকারীগণ রাসূল ﷺ এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেন। রাসূল ﷺ সংবাদ শুনে পরামর্শের জন্য বৈঠকের আহ্বান করেন। সবার সম্মতিক্রমে সালমান ফারসী রাযি. এর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেটি হলো পরিখা খনন করে শত্রুদের প্রতিরোধ করা। এ কৌশলটি আরবদের কাছে অপরিচিত ছিলো। প্রস্তাব গৃহীত হলে রাসূল ﷺ সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করেন। যেহেতু উত্তর দিক থেকে শত্রু আসার সম্ভাবনা বেশি ছিলো, তাই সেদিকে খন্দক খোড়া হলো। এতে প্রতি দশজনের ভাগে চল্লিশ

হাত পরিখা খননের দায়িত্ব পড়ে। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং নিজেও পুরোদমে কাজে অংশগ্রহণ করেন।

আনাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, খন্দক খননের সময় রাসূল ﷺ পাঠ করলেন–

اللّٰهُمَّ إن العيش عيش الآخرة ** فاغفـر للأنصـار والمهـاجرة

"হে আল্লাহ! পরকালীন জীবন হচ্ছে প্রকৃত জীবন। অতএব আপনি মুহাজির ও আনসারগণকে ক্ষমা করে দিন।"

আনসার ও মুহাজিরগণ প্রত্যুত্তরে বললেন:

نحـن الذيـن بايعـوا محمـداً ** على الجهـاد ما بقيـنا أبداً

"আমরা সেই জাতি; যাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ এর হাতে জিহাদের জন্য বাইআত করেছি। আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকবো ততক্ষণ এর উপর আছি।"[২৩৬]

সে সময় সাহাবায়ে কেরামদের কষ্টের কথা এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়– আবু তালহা রাযি. বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ এর নিকট আমরা ক্ষুধার অভিযোগ করলাম। নিজ নিজ পেটের আবরণ উন্মোচন করে পেটের সঙ্গে রাখা পাথর দেখালাম। রাসূল ﷺ নিজ পেটের আবরণ উন্মোচন করে দেখালেন যে, তাঁর পেটে দু'টি পাথর বাঁধা আছে।[২৩৭]

জাবির রাযি. রাসূল ﷺ এর উপাস থাকার কথা শুনে একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন। তাঁর স্ত্রী এক সা' যব পিসে আটা তৈরি করলেন। তারপর রাসূল ﷺ সহ কয়েকজন বড় বড় সাহাবাকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ খননরত সকল সাহাবী (১০০০ জন) কে সাথে নিয়ে খাবার খেতে

---

২৩৬. সহীহ বুখারী: ১/৩৯৭; ২/৫৮৮
২৩৭. সুনানে তিরমিযী, মিশকাত: ২/৪৪৮

গেলেন। সকলে খাওয়া সত্ত্বেও পাত্রের মধ্যে প্রথমে যে পরিমাণ খাবার ছিলো, সে পরিমাণই অবশিষ্ট রয়ে যায়।[২৩৮]

বারা রাযি. বর্ণনা করেছেন, খন্দক খনন করার সময় এক স্থানে একটি অতি শক্ত পাথর পড়ে। পাথরটিকে আঘাত করলে উল্টো কোদাল ফিরে আসে। রাসূল ﷺ কে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি জানতে পেরে সেখানে আসেন। বিসমিল্লাহ বলে কোদাল দিয়ে আঘাত করলে পাথরটির এক একটি অংশ ভাঙতে থাকলো। আর তিনি সিরিয়া, পারস্য ও ইয়ামান রাজ্য বিজয়ের সুসংবাদ দেন।[২৩৯] এভাবে কাফেরদের আসার পূর্বেই পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খন্দক তৈরির কাজ সম্পন্ন হলো।

শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য রাসূল ﷺ ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ অগ্রসর হলেন। তাঁরা সালআ পর্বতকে পেছনে রেখে শিবির স্থাপন করেন। যার সামনে ছিলো খন্দক; যা মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান ছিলো। যখন শত্রু বাহিনী আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হলো, তারা দেখলো তাদের সামনে বিশাল প্রশস্ত পরিখা। তাই তাদেরকে থমকে দাঁড়াতে হয়। কারণ তারা এ জিনিস আগে দেখেনি। তারা এসেছিলো যুদ্ধ করতে, এখন পরিখা দেখে বাধ্য হলো অবরোধ করতে। তারা চক্কর দিয়ে দিয়ে পরিখার কোথায় দুর্বল স্থান আছে; তা সনাক্ত করার কাজে লেগে যায়। এদিকে সাহাবায়ে কেরামগণ তীর চালিয়ে তাদেরকে পরিখা থেকে দূরে রাখছিলেন; যেন তারা লাফ দিয়ে বা ভরাট করে পরিখা পার না হতে পারে।

এ ব্যবস্থা ছিলো শত্রুপক্ষের অভ্যাসের বিপরীত। তারা তা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না। এক সময় আমর ইবনে আবদে উদ্দ, ইকরামা ইবনে আবী জাহেল ও যারার ইবনে খাত্তাব একটি সংকীর্ণ রাস্তা পার হয়ে খন্দকের এ পাশে চলে এলো। আলী রাযি. এবং কয়েকজন সাহাবী তাদেরকে প্রতিরোধ করলেন। আমর ছিলো কুরাইশদের অন্যতম বীর। আলী রাযি. ও তার মাঝে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলছিলো। অবশেষে আলী রাযি. তাকে প্রবল

---

২৩৮. সহীহ বুখারী: ২/৫৮৮-৫৮৯ পৃ.
২৩৯. ইবনে ইসহাক: ২/২১৯

আঘাত করে হত্যা করেন; ফলে তার সাথে আসা মুশরিকরা ভয়ে পালিয়ে যায়। তারা এতই ভীত ছিলো যে, ইকরামা বর্শা ফেলে চলে যায়।

শত্রুপক্ষ ক্রমাগতভাবে চেষ্টা করছিলো রাস্তা তৈরি করে এদিকে আসতে; কিন্তু মুসলিমগণ তাদের সে প্রচেষ্টা বিফল করে দেয়। অব্যাহত মোকাবেলার কারণে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামগণ নামাজ আদায় করতে পারেননি। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর বুতহান নামক স্থানে রাসূল ﷺ আসরের নামাজ ও মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করতে না পারায় রাসূল ﷺ খুবই মর্মাহত হোন। আর তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেন।[২৪০]

মুসনাদে আহমাদ ও মুসনাদে শাফেয়ীতে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করা থেকে বিরত রাখে। তিনি একত্রে এ নামাজ আদায় করেন। ইমাম নাববী রহ. কয়েকটি মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে বলেন, খন্দক যুদ্ধের কয়েক দিন পর্যন্ত এ সমস্যা চালু ছিলো। তাই কোনো দিন এরকম আবার অপর দিন ভিন্ন রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো।[২৪১]

মুসলিমদের পক্ষ থেকে অনবরত প্রতিরোধের কারণে কাফের-মুশরিকরা খন্দক পার হতে পারেনি। ফলে সামনাসামনি লড়াইয়ের সুযোগ হয়নি। তীর নিক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। মুসলিমদের মধ্য থেকে ৬ জন শহীদ হোন। মুশরিকদের ১০ জন নিহত হয়। এর মধ্যে এক বা দু'টি হত্যা তরবারির মাধ্যমে হয়েছিলো।

এদিকে বনু নাযীরের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব বনু কুরাইযার নেতা কা'ব ইবনে আসাদ কুরাযীর কাছে যায় তাদেরকে সাহায্যের প্রস্তাব দিতে। বনু কুরাইযাহ মুসলিমদের সাথে চুক্তির আওতায় ছিলো। কা'ব তার সাথে কথা বলতে রাজি হচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সে কথা বলতে বাধ্য হলো। সে রাজি হচ্ছিলো না। হুয়াই অনবরত তার চুলের খোপা ও কাঁধের মধ্যে মোচড় দিতে দিতে ফুসলাতে লাগলো। এভাবে সে রাজি হয়ে গেলো। এর সাথে সাথে

---

২৪০. সহীহ বুখারী: ২/৫৯০

২৪১. মুখতাসারুস সীরাহ: ২৮৭; ইমাম নাববীর শরহে মুসলিম: ১/২২৭

মুসলিমদের সাথে তাদের কৃত চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। তারা এবার মুসলিমদের পক্ষে কাজ করার পরিবর্তে তাঁদের বিরুদ্ধে শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করে।[২৪২]

ইবনে ইসহাক সূত্রে জানা যায়, সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ও হাসসান ইবনে সাবেত রাযি. মহিলা ও শিশুদের সাথে ফারে নামক দুর্গে অবস্থানরত ছিলেন। সেখানে আর কোনো পুরুষ সৈন্য ছিলো না। সাফিয়্যাহ রাযি. দুর্গের আশপাশে ইয়াহুদীদের আনাগোনা দেখেন। তিনি হাসসান রাযি. কে তার প্রতিরোধ করতে বললে তিনি বলেন, আপনি জানেন, আমি এ কাজের লোক নই। তাই সাফিয়্যাহ রাযি. দুর্গের বাহিরে গিয়ে একটি কাঠ দিয়ে ইয়াহুদীটিকে হত্যা করে ফেলেন। ফলে ইয়াহুদীরা ভাবতে শুরু করলো, দুর্গের অভ্যন্তরে পুরুষ সৈন্য আছে; ফলে তারা আর এদিকে ঘেষলো না।[২৪৩]

এদিকে রাসূল ﷺ বনু কুরাইযার অঙ্গীকার ভঙ্গের খবর পেয়ে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কয়েকজন সাহাবীকে পাঠালেন। তাঁদেরকে বললেন, যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে; তবে চুপে এসে তাঁকে ইশারায় জানাতে। যেন মুসলিমদের মনোবল অটুট থাকে। আর যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ না করে; তবে তা সবার সামনে প্রকাশ করতে বললেন।

তাঁরা সেখানে গিয়ে তাদেরকে বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পান। তারা প্রকাশ্যে রাসূল ﷺ এর প্রতি অবমাননামূলক কথা বলতে থাকলো। গালিগালাজ করতে লাগলো। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ এর কাছে এসে ইঙ্গিতে তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তাদের চুক্তি ভঙ্গের ফলে মদীনার পেছন ভাগ অনিরাপদ হয়ে পড়ে। এদিকে মুনাফিকরাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

রাসূল ﷺ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সেনাবাহিনীর একটি অংশকে মদীনার নিরাপত্তার জন্য প্রেরণ করলেন। রাসূল ﷺ চাইছিলেন শত্রুদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে; তাই তিনি বনু গাত্বাফানের দু'জন নেতাকে মদীনার এক তৃ তীয়াংশ ফসলের বিনিময়ে তাদের সাথে চুক্তি করতে চাইলেন। আনসারগণ জিজ্ঞেস করলেন এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। তাহলে আমরা তা

---

২৪২. ইবনে হিশাম: ২/২২০-২২১ পৃ.
২৪৩. ইবনে হিশাম: ২/২২৮

সানন্দে মেনে নেবো। আর যদি আপনি তা আমাদের জন্য করে থাকেন; তবে তার কোনো দরকার আমাদের নেই। রাসূল ﷺ বললেন, তা তোমাদের জন্যই ছিলো।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে এমন এক ব্যবস্থা করলেন; যাতে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ ঘটে যায়। ফলে তাদের সৈন্যদের মন ভেঙে পড়ে। আর তা হলো, বনু গাত্বাফানের নুয়াইম ইবনে মাসউদ ইবনে আমির আশজাঈ রাসূল ﷺ এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তা জানতো না। তাই এখন তিনি তাঁর করণীয় সম্পর্কে জানতে চান। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি একা। তোমার পক্ষে কোনো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়; তবে তুমি শত্রুদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে পারো। কেননা যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল।

নুয়াইম রাযি. বনু কুরাইযার কাছে গিয়ে বললেন, আপনাদের এখানে থাকতে হবে। আর কুরাইশরা এখান থেকে চলে যাবে। যদি বিজয় হোন, তবে তো উভয়েই সুবিধা লাভ করতে পারবে। আর যদি পরাজিত হোন, তবে কুরাইশরা তো চলে যাবে; কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ) এর হাত থেকে আপনারা রেহাই পাবেন না। নুয়াইমের কাছে এসব শুনে তারা বললো, তবে এখন কী করণীয়? আপনারা কুরাইশদেরকে গিয়ে বলুন, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের কাছে তোমাদের কতক ব্যক্তিকে জিম্মায় রাখবে; আমরা তোমাদের সাথে থাকবো না।

এদিকে নুয়াইম রাযি. কুরাইশদের কাছে গিয়ে বললো, কুরাইযার ইয়াহুদীগণ চুক্তি ভঙ্গ করে লজ্জিত। তাই তারা চাচ্ছে আপনাদের কিছু ব্যক্তিকে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর হাতে সমর্পণ করবে। এর মাধ্যমে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘাটতি পূরণ করবে। কাজেই তাদেরকে এ দাবির উপর মোটেই সমর্থন দেওয়া যাবে না। এরপর নুয়াইম রাযি. বনু গাত্বাফানের কাছে গিয়েও অনুরূপ কথা বলে।

কুরাইশরা যখন ইয়াহুদীদের কাছে হামলা করার ব্যাপারে কথা বললো, তখন তারা তাদের দাবি জানালো। কুরাইশরা দেখলো নুয়াইমের কথাই তো সত্যি। ফলে তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানায়, ওদিকে ইয়াহুদীরাও বললো, নুয়াইম তো সত্যি কথাই বলেছে। ফলে তাদের মাঝে থাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

ভেঙে যায়। তাদের একতায় চিড় ধরে; ফলে তাদের সাহস ও মনোবল দু'টোই পুরিয়ে যায়।

রাসূল ﷺ ও মুসলিমগণ তখন আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন। আল্লাহ মুসলিমদের দুআ কবুল করে মুশরিকদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দেন। তারপর তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ুর তুফান প্রেরণ করেন। এ তুফান তাদের সবকিছুকে তছনছ করে দেয়। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠান; যাঁরা তাদের অবস্থানকে নড়চড় করে দেয়। তারপর সকল বাহিনী সেখান থেকে পলায়ন করে।

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী খন্দক যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। আনুমানিক এক মাস তা স্থায়ী ছিলো। এ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ ছিলো না; বরং তা ছিলো স্নায়ু যুদ্ধ । এতে কোনো প্রকার সংঘর্ষ না হলেও তা ছিলো ইসলামের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলশ্রুতিতে মুশরিকদের মনোবল ভেঙে যায়। সবার সামনে এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, আরবের কোনো শক্তির পক্ষেই মুসলিমদেরকে দমানোর শক্তি নেই। কারণ আহযাব যুদ্ধের চেয়ে অধিক শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করা তাদের জন্য সম্ভব ছিলো না। এ জন্য রাসূল ﷺ বলেন-

الآن نغزوهم، ولا يغزونا، نحن نسير إليهم

"এখন থেকে আমরাই তাদের উপর আক্রমণ করবো। তারা আমাদের উপর আক্রমণ করবে না। এখন আমাদের সৈন্যরাই তাদের দিকে যাবে।"[২৪৪]

শিক্ষা:

০১. ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আল্লাহর শত্রুরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ। এক্ষেত্রে কারো মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তাই মুমিনের উচিত দ্বীনের সকল দুশমনের সাথে (কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-খৃষ্টান) একই আচরণ

২৪৪. সহীহ বুখারী

করা। কারণ, ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সকলে একই জাতির মতো। যদিও তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ভেদাভেদ রয়েছে।

০২. কাফের-মুশরিকরা মুমিনদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। পরীক্ষার ধাপগুলো অতিবাহিত করার পরেই মুমিনের ঈমান দৃঢ় হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়।

০৩. মুনাফিক বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা সকলের জন্যই সমস্যা দাঁড় করিয়েছে। এমনকি রাসূল ﷺ কেও তারা নানাভাবে বিপদে ফেলতে চেয়েছে। তাই রাসূল ﷺ এর সুন্নাত অনুযায়ী তাদের ব্যাপারে মুমিনদের অধিক সতর্ক হওয়া উচিত।

০৪. আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসাই তাঁর নুসরাত অর্জনের মাধ্যম।

০৫. যুদ্ধে এমনভাবে কৌশল স্থির করতে হবে; যাতে শত্রুদের একতার মাঝে চিড় ধরে যায়।

গযওয়ায়ে বনু কুরাইযাহ

খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর রাসূল ﷺ যোহরের সময় গোসল করছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল আ. আগমন করলেন। বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? ফেরেশতাগণ কিন্তু এখনও অস্ত্র খোলেননি। আমিও শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে সরাসরি এখানে এসেছি। চলুন, বনু কুরাইযার অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকুন। আমি আগে গিয়ে তাদের দুর্গসমূহে কম্পন সৃষ্টি করি।

রাসূল ﷺ একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন বনু কুরাইযায় যাওয়ার কথা। আলী রাযি. এর হাতে পতাকা দিয়ে রাসূল ﷺ তাঁকে প্রেরণ করলেন। যখন তিনি বনু কুরাইযার নিকটবর্তী হলেন, তাদেরকে রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে কটু কথা বলতে শুনলেন। এদিকে মুসলিম বাহিনী বনু কুরাইযার ভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। তারা দুর্গসমূহের চারপাশে ঘেরাও দিয়ে দিলেন।

বনু কুরাইযার সামনে তখন একটি পথ খোলা ছিলো; তা হলো আত্মসমর্পণ করা। তারা মুসলিমদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে চাইলো। এই প্রেক্ষিতে তারা রাসূল ﷺ এর কাছে আবেদন করলো, আবু লুবাবা রাযি. কে প্রেরণ করার জন্য। আবু লুবাবা তাদের কাছে গেলে বনু কুরাইযার পুরুষরা তাঁর কাছে দৌড়ে এলো। মহিলারা ও শিশুরা করুণভাবে কাঁদছিলো। এ দেখে তাঁর মাঝে আবেগের উদ্রেক ঘটে। তারা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ সম্পর্কে জানতে চায়। তারা কি তা করবে, নাকি করবে না? আবু লুবাবা রাযি. হ্যাঁ বললেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করলেন, যার অর্থ ছিলো হত্যা। তখনই আবু লুবাবা উপলব্ধি করলেন যে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত হয়েছে। তাই তিনি রাসূল ﷺ এর কাছে না গিয়ে সরাসরি মাসজিদে নাববীতে চলে যান। নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেন। শপথ করলেন যে, রাসূল ﷺ না খোলা পর্যন্ত তিনি এ অবস্থাতেই থাকবেন। আর তিনি বনু কুরাইযার ভূমিতে কভু পা ফেলবেন না। রাসূল ﷺ তা শুনে বললেন, যদি সে আমার কাছে আসতো; তবে আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিতাম। কিন্তু সে এ কাজ করায় আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করা পর্যন্ত আমি তাঁর বাঁধন খুলতে পারবো না।

এদিকে আবু লুবাবার ইশারা সত্ত্বেও তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, তারা আত্মসমর্পণ করবে। অথচ তাদের কাছে দীর্ঘকাল দুর্গে অবস্থান করার মতো রসদ ছিলো। তাদের সহ্য করার মতো সামর্থ্য ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তাদের উদ্যম ঐ সময় শেষ হলো, যখন আলী রাযি. ও যুবায়ের রাযি. তাদের দুর্গ তোরণের দিকে এগিয়ে গেলেন। আলী রাযি. শপথ করে বললেন, আমি হয় সে অমৃত সুধা পান করবো; যা হামযা পান করেছেন আর নয়তো আমি এ দুর্গ জয় করবো।

আলী রাযি. এর সংকল্পের কথা শুনে তারা আত্মসমর্পণ করলো। তাদের পুরুষদেরকে আলাদা করে বন্দী করে রাখা হলো। মহিলা ও শিশুদেরকে আলাদা করে রাখা হলো। আওস গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা তাদের প্রতি সেরূপ আচরণ করতে অনুরোধ করলেন, যে রকম বনু কাইনুকা'র সাথে করা হয়েছিলো। রাসূল ﷺ বললেন, আপনাদের জন্য কি এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, আপনাদেরই একজন তাদের বিচার করবে? তারা বললো, জি হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ সা'দ ইবনে মুআয রাযি. কে বিচারের দায়িত্বভার দিলেন। তিনি আহত ছিলেন তাই মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে ডেকে পাঠালেন রাসূল ﷺ। তারপর সা'দ রাযি. এসে রাসূলের আদেশক্রমে তাদের বিচার করলেন, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক আর মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে রাখা হোক। সম্পদসমূহ বণ্টন করে দেওয়া হোক। রাসূল ﷺ বললেন, আপনি ঠিক তেমনই বিচার করলেন। আল্লাহ তাআলা'র যেমন ফায়সালা ছিলো।

তারপর তাদের সকল বালেগ পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়। আর এক মহিলাকে খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ রাযি. কে আক্রমণ করে শহীদ করার অপরাধে হত্যা করা হয়।

এদিকে আবু লুবাবা রাযি. ছয় রাতের মতো বাঁধা অবস্থায় সময় অতিবাহিত করেন। প্রত্যেকবার সালাতের সময় তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। আবার নামাজ শেষে তিনি নিজেকে বেঁধে নিতেন। তারপর ভোরের সময় তাঁর তাওবা কবুল করা হয়। সে সময় রাসূল ﷺ উম্মে সালামাহ্‌র রাযি. ঘরে ছিলেন। তিনি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে সুসংবাদ শুনালেন। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর বাঁধন খুলতে এগিয়ে আসেন; কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ ছাড়া অপর কারো হাতে বাঁধন খুলতে অস্বীকার করেন। পরে ফজরের জন্য বের হলে রাসূল ﷺ তাঁর বাঁধন খুলে দেন।

এ যুদ্ধ যুল কা'দাহ মাসে সংঘটিত হয়।[২৪৫]

শিক্ষা:

০১. মুমিনদের সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা জরুরি।

০২. মুমিনগণ এ পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করেন না।

০৩. দ্বীনের জন্য মুমিনকে আত্মোৎসর্গী হতে হবে। এ কাজে কোনো ত্রুটি করা যাবে না।

০৪. শত্রুদের কাছে কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। যদি

---

২৪৫. যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য ইবনে হিশাম: ২/২৩৬-২৩৭ পৃ.; সহীহ বুখারী: ২/৫৯১; যাদুল মাআদ: ২য় খণ্ড

কারো দ্বারা ভুলবশত কোনো তথ্য শত্রুপক্ষের কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়; তাহলে তা দ্রুত আমীর কিংবা দায়িত্বশীলদের জানাতে হবে।
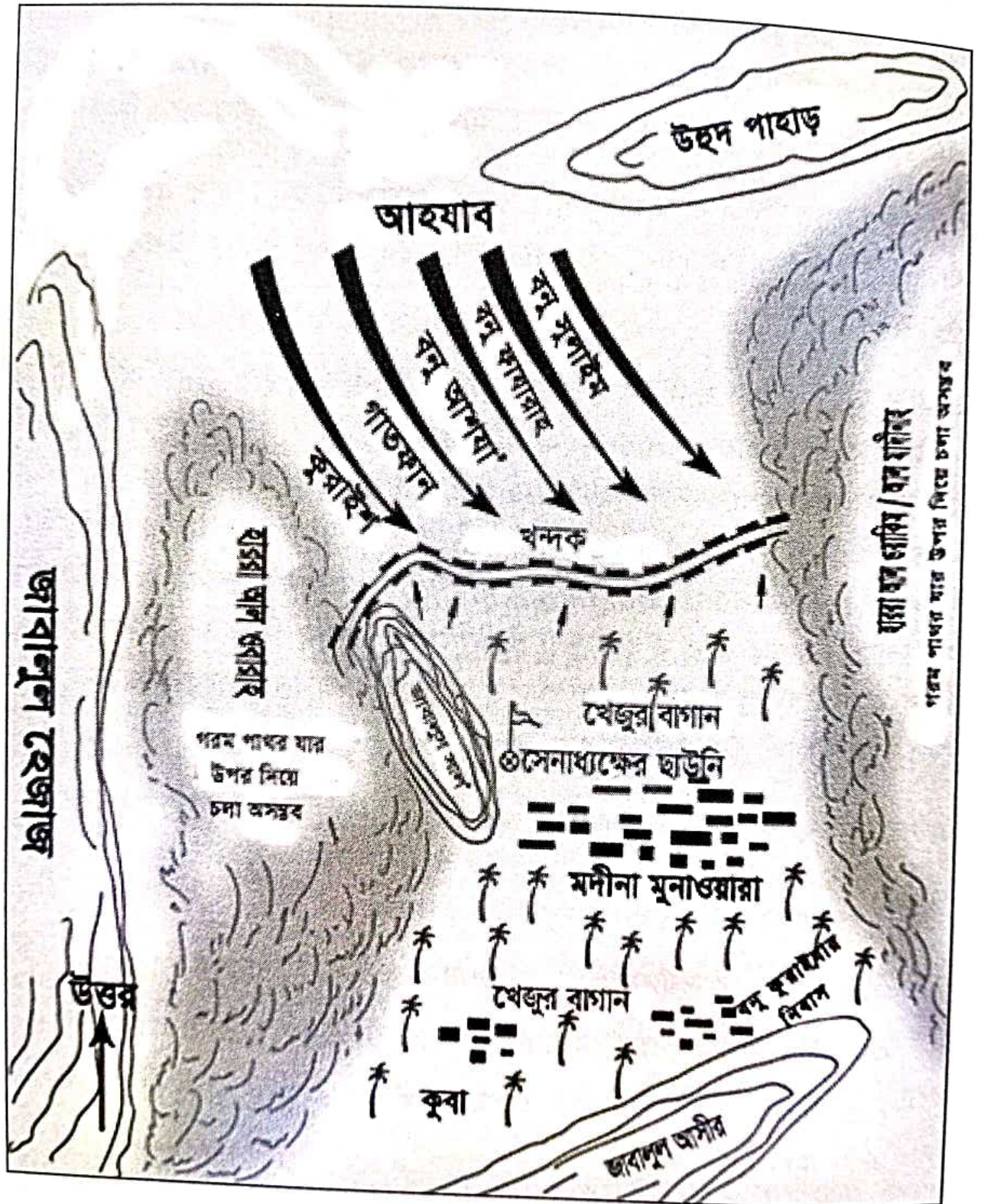
চিত্র: খন্দক ও কুরাইযার নিবাস

আহযাব যুদ্ধের পর ঘটিত ঘটনাবলী

০১. সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইকের হত্যা: তার উপনাম ছিলো আবু রাফে'। সে ইসলামের প্রতি কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করতো। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে উসকানি দিতো। তাদেরকে ধন-সম্পদ ও রসদ সরবরাহ করে সাহায্য করতো। রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেওয়ার জন্য সর্বদা সে উদ্বাহু হয়ে থাকতো।[২৪৬]

রাসূল ﷺ তাকে হত্যার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাযি. কে দলনেতা করে খাযরাজ গোত্রের ৫ জন সাহাবীকে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাযি. তার ঘরের ভেতরে ঢুকে তাকে হত্যা করেন। এ বাহিনীটির সফল অভিযান অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম হিজরীর যুল কা'দাহ মাসে বা যুল হিজ্জাহ মাসে।[২৪৭]

আহযাব ও বনু কুরাইযাহ'র যুদ্ধ শেষ হলে রাসূল ﷺ শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টকারী গোত্রগুলো ও বেদুইনদের বিরুদ্ধে সংশোধনী অভিযান পরিচালনা করেন।

০২. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ্'র অভিযান: অভিযান প্রেরিত হয় নাজদের অভ্যন্তরে বাকারাত অঞ্চলে যারিয়ার পাশের স্থান কারতা নামক স্থানে। ৩০ জন মর্দে মুমিনের এ কাফেলা ষষ্ঠ হিজরীর ১০ই মুহাররম তাঁদের লক্ষ্যস্থল বনু বাক্‌র ইবনে কিলাব গোত্রের একটি শাখার উপর অতর্কিতে হামলা করেন। তারা হতাশ হয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিমগণ গনীমত নিয়ে মদীনায় চলে আসেন। সাথে বন্দী অবস্থায় ছিলো বনু হানীফার সরদার ছুমামাহ ইবনে উসাল হানাফীহ। সে মুসাইলামাতুল কাযযাব এর নির্দেশে রাসূল ﷺ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো।[২৪৮] তাঁরা তাকে এনে মাসজিদে নাববীর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন।

রাসূল ﷺ তার কাছে এসে প্রশ্ন করেছিলেন–

ما ذا عندك يا ثمامة؟ "তোমার কাছে কী আছে? হে ছুমামাহ!" উত্তরে সে বললো–

---

২৪৬. ফাতহুল বারী: ৭/৩৪৩
২৪৭. রহমাতুল্লিল আলামীন: ২/২২৩
২৪৮. সীরাতে হালাবিয়্যা: ২/২৯৭

عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فَسَلْ تعط منه ماشئت

"আমার নিকট কল্যাণ (ধন-সম্পদ) আছে। আমাকে হত্যা করলে প্রকৃতপক্ষেই একজন খুনিকে হত্যা করা হবে। আর ছেড়ে দিলে একজন গুনগ্রাহীর প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। আর যদি ধন-সম্পদ চান; তাহলে যা চাইবেন তাই পাবেন।"

রাসূল ﷺ দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিনে তাকে একই প্রশ্ন করলে, সে প্রথম দিনের মতো একই উত্তর দেয়। রাসূল ﷺ বললেন, أطلقوا ثمامة "ছুমামাহকে ছেড়ে দাও।" একটু পর তিনি পাশের বাগান থেকে গোসল সেরে এসে ইসলাম কবুল করেন। তিনি বলেন, আমাকে এমন সময় গ্রেফতার করা হয়েছে, যখন আমি উমরার নিয়ত করেছিলাম। এরপর রাসূল ﷺ তাঁকে উমরাহ পালন করতে আদেশ করলেন।

তিনি উমরাহ করতে গেলে কুরাইশরা বললো, তুমিও বেদ্বীন হয়ে গেলে? উত্তরে তিনি বললেন, না; বরং আমি মুহাম্মাদ ﷺ এর হাতে বাইআত হয়েছি। তিনি আরও বলেন, তোমাদের জন্য ইয়ামান থেকে একদানা শস্যও আসবে না, যতক্ষণ না রাসূল ﷺ তার অনুমতি দেন।

সত্যি সত্যি তিনি মক্কা অভিমুখী খাদ্য চালান বন্ধ করে দেন। পরে কুরাইশরা আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে রাসূল ﷺ এর কাছে অনুরোধ জানালে তিনি চালান চালু করার নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর ছুমামাহ রাযি. তা আবার চালু করে দেন।[২৪৯]

০৩. গযওয়ায়ে বনু লাহ্‌ইয়ান : এ গোত্রের লোকেরা প্রতারণা করে রাযী' নামক স্থানে ১০ জন সাহাবাকে আটক করে ৮ জনকে হত্যা করে ফেলে আর বাকি ২ জনকে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। তারাও এ ২ জনকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ ষষ্ঠ

২৪৯. যাদুল মাআদ: ২/১১৯; মুখতাসারুস সিরাহ: ২৯২-২৯৩.পৃ.

হিজরীর রবিউল আউয়াল বা জুমাদাল উলা মাসে ২০০ জন সাহাবীকে নিয়ে রাযী'র দিকে রওয়ানা হোন। এদিকে বনু লাহ্ইয়ান মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে পর্বত অতিক্রম করে পলায়ন করে। রাসূল ﷺ সেখানে দু'দিন অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি।

০৪. **গাম্রের অভিযানঃ** ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মতান্তরে রবিউল আখের মাসে উক্কাশাহ রাযি. এর নেতৃত্বে ৪০ জন সাহাবীকে গামরের দিকে প্রেরণ করেন। এটি বনু আসাদের ঝর্ণার নাম। মুসলিম বাহিনীর অভিযানের কথা শুনে তারা পালিয়ে যায়। এতে মুসলিম বাহিনী ২০০ টি উট গনীমত হিসেবে লাভ করেন।

০৫. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ'র নেতৃত্বে যুল-কাস্সাহতে প্রথম অভিযানঃ একই মাসে ১০ সদস্যের একটি সেনা দল বনু সা'লাবাহ নামক অঞ্চলে যুল-কাসসাহ অভিমুখে প্রেরিত হয়। শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১০০ জন। তারা আত্মগোপনে ছিলো। মুসলিমগণ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন তারা হামলা করে সকলকে শহীদ করে দেয়। শুধু মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি. মারাত্মকভাবে জখম হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

০৬. যুল-কাস্সাহতে আবু উবাইদা রাযি. এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযানঃ শাহাদাতপ্রাপ্ত সাহাবাদের প্রতিশোধ নিতে এবং বনু সা'লাবাহকে শায়েস্তা করতে রবিউল আখের মাসে রাসূল ﷺ একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে আক্রমণ করেন। তবে বনু সা'লাবাহ দ্রুত গতিতে পর্বতের উপর দিয়ে পলায়ন করে। শুধু একজনকে বন্দী করা সম্ভব হয়। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

০৭. **জামূম অভিযানঃ** ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আখের মাসে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. এর নেতৃত্বে জামূম অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এখানে বনু সুলাইমের উপর হামলা করা হয়। সেখানে তাদের বহু লোক বন্দী হয়। অনেক গবাদিপশু হস্তগত হয়।

০৮. **ঈস অভিযানঃ** ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. এর নেতৃত্বে ১৭০ জন ঘোড়সওয়ার মুজাহিদকে ঈস অভিমুখে একটি

অভিযানে প্রেরণ করা হয়। এ অভিযানে কুরাইশদের ব্যবসায়িক কাফেলার কিছু মালামাল হাতে আসে। যে কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন রাসূল ﷺ এর জামাতা আবুল আস। কাফেলার মাল জব্দ হলে তিনি গ্রেফতার এড়ানো ও মাল ফেরত পাওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে ছুটেন। যায়নাব রাযি. এর মধ্যস্থতায় তিনি রাসূল ﷺ এর কাছে সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। রাসূল ﷺ সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর আবুল আস মক্কায় গমন করে কুরাইশদের সম্পদ বুঝিয়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেন। পূর্বের বিবাহের ভিত্তিতে রাসূল ﷺ যায়নাব রাযি. কে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন।[২৫০] তাছাড়া অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নতুন করে বিবাহের পর তাঁর কাছে সমর্পণ করেন।[২৫১]

০৯. তারিফ বা তারিক অভিযান: ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. এর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি বাহিনী তারিফ অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। এটি ছিলো সা'লাবাহ গোত্রের অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু মুসলিমদের অগ্রযাত্রার কথা শুনে বেদুইনার পালিয়ে যায়।

১০. ওয়াদিল কুরা অভিযান: ষষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. এর নেতৃত্বে ১২ জন সাহাবীর একটি বাহিনী ওয়াদিল কুরা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া। কিন্তু তারা মুসলিমদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে বসে; ফলে ৯ জন সাহাবী শহীদ হোন। যায়েদ রাযি. সহ আরও দু'জন সাহাবী বেঁচে যান।[২৫২]

১১. খাবাত অভিযান: হুদায়বিয়া সন্ধির আগে কুরাইশ কাফেলার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য ৩০০ ঘোড়সওয়ারের একটি বাহিনী আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি. এর নেতৃত্বে এ অভিযানে প্রেরণ করা হয়।

---

২৫০. সূনানে আবু দাউদ, আওনুল মা'বূদ শরহে আবু দাউদসহ। স্ত্রীর পরে মুসলিম হলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রত্যাবর্তন অধ্যায়।

২৫১. তুহফাতুল আহওয়াযী: ২/১৯৫, ১৯৬ পৃ.

২৫২. এ সকল অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যাবে, রহমাতুল্লিল আলামীন: ২/২৬৬; যাদুল মাআদ: ২/১২০-১২২ পৃ.; তালকীহুল ফুহুম আহলিল আসরের টীকা: ২৮ ও ২৯ পৃ.

শিক্ষাঃ

শত্রুদের সম্পর্কে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদরেকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতে হবে। যেন তারা স্থির হতে না পারে।

গযওয়ায়ে বনু মুসতালিক বা মুরাইসী

পঞ্চম বা ষষ্ঠ[২৫৩] হিজরীর শা'বান মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল ﷺ অবগত হলেন যে, বনু মুসতালিকের সর্দার হারিস ইবনে আবী যিরার মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অপর বেদুইন গোত্রগুলো নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি খবরের নিশ্চয়তা পেতে বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব রাযি. কে হারিসের সাথে কথোপকথনের জন্য পাঠান। বুরাইদাহ রাযি. ফিরে এসে রাসূল ﷺ কে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন।

খবরের সত্যতা নিশ্চিত হলে রাসূল ﷺ শা'বান এর দুই তারিখে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে রওয়ানা করেন। এ সময় মুসলিম বাহিনীর সাথে মুনাফিকদের একটি দলও ছিলো; যারা এ প্রথমবারের মতো মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে শামিল হয়। হারিস মুসলিম বাহিনীর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য একজন গোয়েন্দা পাঠায়। মুসলিমগণ তাকে গ্রেফতার করার পর হত্যা করে। হারিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যখন শুনলো মুসলিম বাহিনী এগিয়ে আসছেন, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ও তাদের বেদুইন মিত্ররা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রাসূল ﷺ যখন মুরাইসী নামক ঝর্ণা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন, তখন তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলো।

রাসূল ﷺ মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে নিলেন। কিছুক্ষণ উভয় দলের মাঝে তীর নিক্ষেপ চলতে থাকে। এরপর রাসূল ﷺ আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। মুসলিম বাহিনী সহজে তাদেরকে পরাজিত করেন।

মুসলিমদের একজন শাহাদাতবরণ করেন। মুশরিকদের কয়েকজন নিহত হলো। তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হলো।

---

২৫৩. ইবনে ইসহাকের মতে ৬ষ্ঠ হিজরী। যাদুল মাআদঃ ২/১১৫

কিন্তু ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন, বনু মুসতালিকের সাথে কোনো যুদ্ধ হয়নি। বরং তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয়। তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে আটক করা হয় ও চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে গনীমত হিসেবে নিয়ে নেওয়া হয়।[২৫৪]

ধৃত মহিলাদের মধ্যে জুওয়াইরিয়া রাযি.ও ছিলেন। তিনি হারিস ইবনে আবী যিরারের কন্যা ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন। এ বিবাহের ফলে সাহাবাগণ বনু মুসতালিক গোত্রের একশ' পরিবারের লোকজনকে মুক্ত করে দেন। আর বলতে থাকেন, এরা রাসূল ﷺ এর শ্বশুর বংশের লোক। এরপর তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২৫৫]

শিক্ষা:

> মুমিনের কাজ হলো, দ্বীনের দাওয়াতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া এবং দাওয়াত পাওয়ার পর যদি কেউ তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়; তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করা।

এ যুদ্ধে মুনাফিকদের কার্যকলাপ

এ যুদ্ধের পর মুনাফিকরা তাদের হীন চরিত্রের প্রতিফলন ঘটায়। তাদের প্রাপ্ত দু'টি সুযোগের বিবরণ–

০১. মদীনা থেকে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের বহিষ্কার প্রসঙ্গ: মুরাইসী ঝর্ণার নিকট উমর রাযি. এর কর্মচারী জাহ্‌জাহ গিফারী ও আনসারদের সিনান নামক এক ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া হয়। তারা উভয়ে নিজেদের পক্ষে মুহাজির ও আনসারদের ডাকতে থাকে। রাসূল ﷺ এসব অবগত হয়ে তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের মাঝে জীবিত অবস্থায় আছি; অথচ তোমরা জাহেলী যুগের মতো আচরণ করছো। তোমরা এসব পরিহার করো।

যখন এ ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই শুনলো, তখন সে বললো, তোমরা যা করছো তাহলো এরকম যে, নিজের কুকুর কে লালন-পালন করে হৃষ্টপুষ্ট

২৫৪. সহীহ বুখারী: ইতক অধ্যায়: ১/৩৪৫; ফাতহুল বারী: ৭/৪৩১
২৫৫. যাদুল মাআদ: ২/১১২-১১৩ পৃ.; ইবনে হিশাম: ২/২৮৯, ২৯০, ২৯৪, ২৯৫ পৃ.

করছো; যেন সে তোমাদেরকে ফেঁড়ে ফেলে। শোনো, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে মদীনা থেকে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদেরকে বের করে দেবো।

যখন রাসূল ﷺ এর কাছে এ ঘটনা উপস্থাপন করা হলো, তখন উমর রাযি. তাকে হত্যা করার অনুমতি চান। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। পরে ইবনে উবাই জানতে পারে যে, তার আচরণের কথা রাসূল ﷺ এর কাছে বলা হয়েছে। সে রাসূল ﷺ এর কাছে এসে এসব বিষয় অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে সূরা মুনাফিকূন নাযিল হয়।

রাসূল ﷺ সবাইকে মদীনার দিকে রওয়ানা হতে বললেন। মদীনার প্রবেশ পথে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র সাহাবী আব্দুল্লাহ তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তার মুনাফিক পিতাকে মদীনায় ঢুকতে দেবেন না, যতক্ষণ না রাসূল ﷺ অনুমতি দেন। পরে রাসূল ﷺ প্রবেশের অনুমতি দিলে সে প্রবেশ করে। আব্দুল্লাহ রাযি. রাসূল ﷺ এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার মুনাফিক পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চান; কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দেননি।[২৫৬]

০২. মিথ্যা অপবাদঃ বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সময় আয়েশা রাযি. রাসূল ﷺ এর সাথে ছিলেন। ফিরে আসার সময় এক জায়গায় শিবির স্থাপন করা হয়। আয়েশা রাযি. নিজ প্রয়োজনে শিবিরের বাহিরে যান। সেখানে তাঁর হারটি হারিয়ে যায়। তিনি শিবিরে ফিরে এসে বুঝতে পারেন তাঁর হারটি হারিয়ে গেছে, তাই তিনি হারের খোঁজে বের হোন।

এমন সময় রাসূল ﷺ যাত্রার আদেশ দেন। সাহাবাগণ আয়েশা রাযি. এর হাওদা কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। এমনিতে আয়েশা রাযি. হালকা ওজনের ছিলেন। তার উপর চারজনে সম্মিলিতভাবে হাওদা উঠানোর কারণে তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, তিনি কি ভেতরে আছেন নাকি নেই।

হারটি পেয়ে আয়েশা রাযি. শিবিরের জায়গায় এসে দেখেন সবাই চলে গেছে। তিনি ভাবলেন যে, তাঁরা তাঁকে না পেয়ে আবার এদিকে আসতে পারে; তাই তিনি সেখানে বসে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ ও আপন কাজে সদা তৎপর। তিনি আয়েশা রাযি. চোখে ঘুম জড়িয়ে দিলেন। অতঃপর

---

২৫৬. ইবনে হিশামঃ ২/২৯০-২৯২ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহঃ ২৭৭ পৃ.

সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাযি. এর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি জাগ্রত হলেন। তিনি বলছিলেন, ইন্নালিল্লাহ! রাসূল ﷺ এর স্ত্রী?

সফওয়ান রাযি. এর একটু বেশি ঘুমানো অভ্যাস ছিলো; তাই তিনি পেছনে পড়ে যান। আয়েশা রাযি. কে এ অবস্থায় দেখে তিনি তাঁকে চিনে ফেলেন; কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। তারপর সফওয়ান রাযি. ইন্নালিল্লাহ পড়তে পড়তে তাঁর সওয়ারি বসিয়ে দেন। আয়েশা রাযি. উঠে পড়লে তিনি লাগাম টানতে টানতে হাঁটতে থাকেন। তার মুখে সর্বক্ষণ উচ্চারিত হচ্ছিলো, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...

সফওয়ান রাযি. ইন্নালিল্লাহ ছাড়া আর কিছুই বলেননি। যখন তাঁরা কাফেলার সাথে মিলিত হোন। তখন খরতপ্ত দুপুর। মুসলিম বাহিনী তখন শিবির স্থাপন করে বিশ্রাম করছিলো। আয়েশা রাযি. কে আসতে দেখে লোকজন নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী এ ঘটনার ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলো। মুমিনগণ তাঁদের অন্তরের পরিচ্ছন্নতার কারণে এ সামান্য ব্যাপারটিকে সহজভাবেই নিলেন। আর যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা একে রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে একটি মোক্ষম অপপ্রচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলো। তাদের মধ্যে আছে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। তারা মদীনায় এসে জোরালোভাবে অপপ্রচার চালাতে থাকলো।

রাসূল ﷺ এ অপপ্রচারের জবাব ওহীর মাধ্যমে দেবেন আশা করছিলেন। কিন্তু ওহী আসতে বিলম্বিত হওয়ায় তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন আয়েশা রাযি. এর থেকে পৃথক থাকার ব্যাপারে। আলী রাযি. তাঁকে পৃথক হয়ে অন্য মহিলাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলেন। উসামা রাযি. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে শত্রুদের কথায় কান না দিয়ে আয়েশা রাযি. কে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার পরামর্শ দিলেন।

এদিকে আয়েশা রাযি. মদীনায় আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক নাগাড়ে একমাস অসুস্থ থাকেন। তিনি এ অপবাদের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। কিন্তু এ সময় রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে যে আদর-যত্ন আশা করছিলেন; তা তিনি না পাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন। সুস্থ হওয়ার পর প্রস্রাবের উদ্দেশ্যে এক রাতে উম্মে মিসতাহের সাথে নিকটের

একটি মাঠে গমন করেন। হাঁটার সময় উম্মে মিসতাহ কাপড় জড়িয়ে পড়ে যান। তখন তিনি নিজ সন্তান মিসতাহকে গালমন্দ করছিলেন। আয়েশা রাযি. তাকে গালি দিতে নিষেধ করলে, তিনি গালি দেওয়ার কারণ হিসেবে তাঁর উপর যে অপবাদ রটানো হয়েছে; তাতে মিসতাহ এর লিপ্ত হওয়ার কথা বললেন।

এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আয়েশা রাযি. তাঁর পিতা-মাতার নিকট যেতে চাইলেন। রাসূলের অনুমতিতে তিনি পিতা-মাতার কাছে গিয়ে সংবাদের সত্যতা জেনে কাঁদতে লাগলেন। তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাঁদতেই থাকলেন। দু'রাত ও একদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো; কিন্তু সে সময় এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর কান্না থামেনি। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ঘুমাননি; যেন কান্নার চোটে তাঁর অন্তর ফেটে যাবে।

সেই সময় রাসূল ﷺ আগমন করেন ও একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এতে তিনি বলেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু জঘন্য কথা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও; তবে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি তুমি কোনো পাপ কাজ করে থাকো; তাহলে তাওবা করো। আল্লাহ তা কবুল করে নেবেন।

বক্তব্য শোনার পর আয়েশা রাযি. এর অশ্রুধারা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো। আয়েশা রাযি. তাঁর অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে বললেন, যদি আমি নিজেকে পবিত্র হিসেবে বলি; তবে আপনাদের অন্তর তা মেনে নেবে না। কারণ আপনারা অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়েছেন। তাই তিনি বললেন, এ জন্য আমার ও আপনাদের জন্য সে উদাহরণই যুতসই; যা ইউসুফ আ. এর পিতা তাঁর ভাইদের বলেছিলেন–

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾

"ধৈর্যধারণই উত্তম। আর তোমরা যা বলছো তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।"[২৫৭]

২৫৭. সূরা ইউসুফ: ১৮

এরপর তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। এরপর রাসূল ﷺ এর উপর আয়েশা রাযি. এর পবিত্রতা বর্ণনা করে সূরা নূরের ১১-২০ আয়াত পর্যন্ত নাযিল হলো। ওহী নাযিল শেষ হলে রাসূল ﷺ মুচকি হাসলেন। তারপর তিনি তাঁকে অপবাদ থেকে মুক্তির সুসংবাদ শোনালেন। আয়েশা রাযি. এর পিতা-মাতা তাঁকে রাসূল ﷺ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে বলেন। আয়েশা রাযি. স্বীয় সতীত্ব ও রাসূলে কারীম ﷺ এর ভালোবাসার উপর ভরসা করে গর্বের সঙ্গে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করবো।

এরপর মিথ্যা অপবাদের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মিসতাহ ইবনে আসাসাহ রাযি., হাসসান ইবনে সাবেত রাযি., হামনাহ বিনতে জাহ্‌শ রাযি. এর উপর আশি দোররা কার্যকর করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। কারণ তাকে দুনিয়ায় শাস্তি দিলে তার আখিরাতের শাস্তি হালকা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বা এমন কোনো ব্যাপার নিহিত ছিলো।[২৫৮]

এভাবে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর মদীনার আবহাওয়া যখন গুমট অবস্থা থেকে মুক্তি পেলো। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এতই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলো যে, সে আর দ্বিতীয়বারের মতো মাথা উঠানোর সাহস পেলো না। ইবনে ইসহাক বলেন, এরপর যখনই সে গোণ্ডগোল পাকানোর মতলবে দাঁড়াতো তার লোকেরাই তাকে বসিয়ে দিতো। রাসূল ﷺ তখন উমর রাযি. কে বললেন, যদি সেদিন তাকে হত্যা করা হতো; তবে তার সঙ্গীরা বিরূপ ধারণা পোষণ করতো। আজ তাদেরকে আদেশ দিলে তারাই তাকে হত্যা করবে। উমর রাযি. বললেন, রাসূল ﷺ এর কাজ আমাদের কাজের তুলনায় অনেক বেশি বরকতপূর্ণ।[২৫৯]

শিক্ষা:

০১. মুনাফিকরা সর্বদা মুমিনদের কাতারগুলোকে বিভক্ত করে দিতে চায়। তাই তারা মুমিনদের মাঝে দ্বন্দ্ব বাঁধানোর চেষ্টা করতে থাকে, তাঁদের মাঝে কলুষতা ছড়াতে চায়।

---

২৫৮. সহীহ বুখারী: ১/৩৬৪, ২/৬৯৬-৬৯৮ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/১১৩-১১৫ পৃ.; ইবনে হিশাম: ২/২৯৭-৩০০ পৃ.

২৫৯. ইবনে হিশাম: ২/২৯৩

০২. মুনাফিকদের জঘন্যতম একটি স্বভাব হলো আমীর এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট লোকদের দুর্নাম রটানো; যেন আমীর ও অনুসারীদের মাঝে ফাটল ধরাতে পারে এবং তাঁদের দৃঢ়তার ভিতকে দুর্বল করে দিতে পারে।

০৩. শত্রুরা গোপনে-প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং যুদ্ধের ছক আঁকে। তাই আল্লাহর সৈনিকদের সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

০৪. আল্লাহ তাআলা প্রকৃত ঈমানদারদেরকে রক্ষা করে থাকেন। তাঁদেরকে সকল প্রকার অপবাদ ও ফেতনা থেকে হেফাজত করেন।

০৫. মুসলমান শব্দের গূঢ়তত্ত্ব হলো আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা এবং কাফের-মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

গযওয়ায়ে বনু মুসতালিকের পর সামরিক অভিযানসমূহ

০১. দিয়ারে বনু কালব অভিযান: ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. নেতৃত্বে দুমাতুল জান্দালে একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। রাসূল ﷺ দলনেতার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন। তাকে বলেন, যদি তারা আনুগত্য করে; তবে তাদের সম্রাটের মেয়েকে বিয়ে করবে। আব্দুর রহমান রাযি. সেখানে গিয়ে তিন দিন যাবৎ ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর আব্দুর রহমান রাযি. তুমাজির বিনতে আসবাগকে বিয়ে করেন।

০২. ফাদাক অঞ্চলে অভিযান: ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে ২০০ জন মুজাহিদের একটি বাহিনী আলী রাযি. এর নেতৃত্বে বনু সা'দের আবাস স্থলে প্রেরিত হয়। বনু সা'দের একটি দল ইয়াহুদীদের সাহায্য করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলো। তাঁরা রাতে হামলা করতেন আর দিনে আত্মগোপনে থাকতেন। এক সময় শত্রুদের গোয়েন্দা ধরা পড়লে তার কাছ থেকে তাদের অবস্থান জানা যায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের উপর হামলা করা হয়। এ অভিযানে গনীমত হিসেবে পাঁচশ' উট ও দু'হাজার ছাগল পাওয়া গেলো; তবে তারা শিশু ও মহিলাসহ সকলে পলায়ন করলো।

০৩. **ওয়াদিল কুরা অভিযান:** ষষ্ঠ হিজরীর রমজান মাসে আবু বকর রাযি. মতান্তরে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. এর নেতৃত্বে বনু ফাযারা গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে মুসলিমদের একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। শত্রুরা রাসূল ﷺ কে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিলো। সালামাহ ইবনে আকওয়া বলেন, ফজরের পর আমরা শত্রুপক্ষের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করি। তাদের কিছু লোক নিহত হলো। এদের অপর একটি দলের প্রতি আমার দৃষ্টি গেলো। আমার ভয় হলো, অন্যরা আসার আগেই তারা হয়তো পালিয়ে যাবে। তাই দ্রুত তাদের দিকে অগ্রসর হলাম। তাদের ও পর্বতের মাঝের একটি জায়গায় আমি তীর নিক্ষেপ করলাম। তীর দেখে তারা থমকে দাঁড়ালো। এ দলের মধ্যে উম্মে কিরফাহ নাম্নী এক মহিলার একটি কন্যা ছিলো। আবু বকর রাযি. মেয়েটিকে আমাকে দিয়ে দিলেন।

পরে রাসূল ﷺ সালামাহ রাযি. এর কাছ থেকে তাকে নিয়ে তার বিনিময়ে কুরাইশদের থেকে কতিপয় বন্দীকে মুক্ত করেন। উম্মে কিরফাহ ছিলো দুষ্ট শয়তান মহিলা। সে রাসূল ﷺ কে হত্যার জন্য ৩০ জন ঘোড়সওয়ারের ব্যবস্থা করে। তার প্রতিফলরূপে ৩০ জনের প্রত্যেককে হত্যা করা হয়।

০৪. **উরানিয়্যীন অভিযান:** উকাল ও উরাইনাহ'র কতগুলো লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। মদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য উপযোগী না হওয়ায় রাসূল ﷺ কতগুলো উটসহ তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন। তারা সুস্থ হয়ে উঠার পর রাসূল ﷺ এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলোকে নিয়ে তাদের আবাস স্থলে চলে গেলো। ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূল ﷺ তাদেরকে হত্যা করার জন্য কুরয ইবনে জাবির ফিহরী রাযি. এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন; আল্লাহ যেন তাদের পথ অন্ধকার করে দেয় এবং তাদেরকে কঙ্কণের চেয়েও খাটো করে দেয়।

অবশেষে তারা ধরা পড়লো। মুসলিম রাখালদের সাথে তারা যে আচরণ করেছে এবং তারা ইসলাম আনয়নের পর কাফের হয়ে গেছে; তাই তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হলো। চোখে দাগ দেওয়া হলো। হাররাহ নামক

স্থানের এক প্রান্তে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো।[২৬০]

০৫. সিরাত প্রণেতাগণ আরও একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করেন। এ অভিযান আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রাযি. ও সালামাহ ইবনে আবী সালাম রাযি. এর সমন্বয়ে প্রেরিত হয়। আবু সুফইয়ান রাসূল ﷺ কে হত্যা করার জন্য এক বেদুইনকে পাঠায়; তাই তাকে হত্যা করার জন্য রাসূল ﷺ এ বাহিনী পাঠান। আমর ইবনে উমাইয়া রাযি. আবু সুফইয়ানকে হত্যার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। তবে তিনি এ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হোননি।

মূলত, এসব অভিযান ছিলো ইসলামের শত্রুদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করা; যেন তারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার দুঃসাহস না দেখাতে পারে।

শিক্ষাঃ

০১. শত্রুদেরকে সর্বদা ধাওয়া করতে হবে এবং তাদেরকে অস্থির করে রাখতে হবে; যেন তারা ইসলামের মোকাবেলায় স্থির কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে।

০২. কাফের-মুশরিকদের বন্দী করা এবং এ বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুসলিম বন্দীদের কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করা রাসূল ﷺ এর আমাল।

---

২৬০. সহীহ বুখারী: ২/৬২

হুদাইবিয়াহ'র সন্ধি

[ষষ্ঠ হিজরী যুলকা'দাহ মাস]

উমরাহ করার সংকল্প

রাসূল ﷺ কে স্বপ্নযোগে দেখানো হলো, তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ কা'বা ঘরের চাবি গ্রহণ করে উমরাহ পালন করেছেন। রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে এ স্বপ্নের কথা বললে তাঁরা আনন্দিত হোন। তাঁরা ধারণা করলেন, অচিরেই মক্কায় প্রবেশাধিকার লাভ হবে। রাসূল ﷺ উমরাহ করার নিয়ত করলেন আর সাহাবায়ে কেরামদের এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে বললেন। আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলেও এ ঘোষণা করা হলো। তিনি ষষ্ঠ হিজরীর পহেলা যুল কা'দাহ মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সঙ্গে এ সফরে ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ রাযি.। সে সাথে ১৪০০ জন মতান্তরে ১৫০০ জন সাহাবা রাযি.। সফররত অবস্থায় অস্ত্র গ্রহণের নিয়মে কোষবদ্ধ তলোয়ার নেওয়া ছাড়া তাঁরা পৃথক কোনো অস্ত্র সঙ্গে নেননি।

যুল হুলাফায় গিয়ে কুরবানীর পশুকে হার পরিয়ে উটের পিঠের কুজ কেটে দিয়ে কালাদাহ করা হলো। তারপর উমরার জন্য সকলে ইহরাম বাঁধলেন। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিলো; যেন লোকজন নিশ্চিত থাকে যে, উমরাহ করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এদিকে রাসূল ﷺ কুরাইশদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য খুযাআ গোত্রের এক গোয়েন্দাকে প্রেরণ করলেন। যখন তাঁরা উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন সে গোয়েন্দা এসে জানালেন– কা'ব ইবনে লুওয়াই তার সাহায্যকারী মিত্রদের সঙ্গে একত্র হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ও আল্লাহর ঘর থেকে তাঁদেরকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারপর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরাম এর সাথে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলেন সামনে এগিয়ে যাবেন।

শিক্ষাঃ

কাফেলাসহ কোনো দিকে রওয়ানা করার পূর্বে গোয়েন্দা প্রেরণ করে সেদিকের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত হওয়া জরুরি।

আল্লাহর ঘর থেকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা

কুরাইশরা মুসলিমদের আগমনের সংবাদ পেয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, যেভাবেই হোক তাঁদেরকে আল্লাহর ঘর থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। রাসূল ﷺ তাঁর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। এ সময় বনু কা'ব গোত্রের এক লোক এসে সংবাদ দিলেন যে, কুরাইশরা যীতুওয়া নামক স্থানে তাদের শিবির স্থাপন করেছে। আর খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে অশ্বারোহী বাহিনী কুরাউল গামীম স্থানে প্রস্তুত রয়েছে।

খালিদ এমন এক স্থানে ঘোড়সওয়ারদেরকে মোতায়েন করেছিলো যে, মুসলিমগণ ও কাফেররা তাদের পরস্পরকে দেখছে। খালিদ দেখলেন, মুসলিমগণ নামাজে রুকু-সিজদা করছে। তাই নামাজে যখন তাঁরা ব্যস্ত থ াকবে, তখন তাঁদেরকে আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু আসরের সময় আল্লাহ তাআলা সালাতে খওফের আয়াত নাযিল করলেন; ফলে সে সুযোগ আর কাফেররা পেলো না।

এবার রাসূল ﷺ কুরাউল গামীমের প্রধান পথ পরিহার করলেন। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদের মোতায়েন করা সেনাদের বাম দিকে রেখে আঁকাবাঁকা অন্য এক পথে চলতে লাগলেন। এক সময় তাঁরা হুদায়বিয়াতে উপস্থিত হলেন।

শিক্ষাঃ

০১. উপস্থিত সিদ্ধান্ত নিতে পারা একজন নেতার জন্য একটি আবশ্যকীয় গুণ।

০২. শত্রুদের পরাভূত করার সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

বুদাইল ইবনে ওয়ারক্বা এর আগমন

খুযাআ গোত্র রাসূল ﷺ এর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলো। বুদাইল ইবনে ওয়ারক্বা নিজ গোত্রের কয়েকজন লোকসহ রাসূল ﷺ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। বুদাইল জানালেন, কা'ব ইবনে লুওয়াই হুদাইবিয়ার পর্যাপ্ত পানির পাশে তার শিবির স্থাপন করেছে। তারা আল্লাহর ঘর থেকে মুসলিমদেরকে বিরত রাখতে ও যুদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর।

রাসূল ﷺ বললেন, কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পূর্বের যুদ্ধসমূহ কুরাইশদেরকে পর্যদুস্ত করে ফেলেছে। তারা যদি এখন যুদ্ধ চায়; তাহলে তাদের এ ঔদ্ধত্যের জন্য তারা শাস্তি পাবে। তারা যদি যুদ্ধই চায়; তবে তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যুদ্ধ করে যাবো, যতক্ষণ আমার শরীরে প্রাণ থাকে। কিংবা আল্লাহ তাআলা দ্বীনের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। বুদাইল রাসূল ﷺ এর বক্তব্য তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য অনুমতি চাইলেন।

বুদাইল কুরাইশদের কাছে গিয়ে রাসূল ﷺ এর কথাগুলো বর্ণনা করলেন। এর প্রেক্ষিতে কুরাইশরা মিকরায ইবনে হাফস কে তাঁর নিকট প্রেরণ করে। তাকে রাসূল ﷺ তাই বললেন, যা বুদাইলকে বলেছিলেন। সে এসে তা কুরাইশদের নিকট জানালো।

কুরাইশদের দূত প্রেরণ

কুরাইশরা আলাপ আলোচনার করার সময় বনু কিনানার হুলাইস ইবনে আলকামাহ রাসূল ﷺ এর সাথে কথা বলার জন্য আসতে চাইলে কুরাইশরা তাকে পাঠিয়ে দিলো। যখন সে রাসূল ﷺ এর দরবারে এলো, রাসূল ﷺ সাহাবাদের বললেন, এরা সে সম্প্রদায়ের লোক যারা হাদ্য়ীর পশুকে সম্মান করে না। তাই তোমরা হাদ্য়ীগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে লাব্বাইক বলে তাকে স্বাগত জানালেন। সে খুশি হয়ে ফিরে গেলো ও কুরাইশদের সামনে বললো, মুসলিমদেরকে উমরাহ থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। ফলে তার ও কুরাইশদের মাঝে ঝগড়া শুরু হয়।

এমন সময় উরওয়া ইবনে মাসউদ হস্তক্ষেপ করলো। প্রস্তাব করলো তাকে যেতে দিতে। তারা সম্মতি দিলে সে রাসূল ﷺ এর দরবারে আসলো। রাসূল ﷺ তাকে তাই বললেন, যা তিনি বুদাইলকে বলেছিলেন। উত্তরে উরওয়া বললো, যদি আপনি নিজ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন; তবে কি আপনি এরকম কোনো আরবের কথা শুনেছেন, যে তার জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে? আর যদি তাই হয়; তবে আল্লাহর কসম! আমি এমন কতগুলো মূর্খ লোককে আপনার সাথে দেখছি, যারা আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে।

আবু বকর রাযি. তখন মুখ খুললেন, লাতের লজ্জাস্থানের ঝুলন্ত চামড়া চুষতে থাকো। আমরা রাসূল ﷺ কে ছেড়ে পালাবো?

এরপর উরওয়া আবার রাসূল ﷺ এর সাথে কথা বলা শুরু করলো। সে ক্ষণে ক্ষণে রাসূল ﷺ এর দাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে তাঁর দাড়ি ধরতে চাইছিলো। পাশে ছিলেন মুগীরাহ ইবনে শো'বা রাযি.; তিনি তরবারির হাতল দিয়ে তার হাতে আঘাত করে তার হাত সরিয়ে দিচ্ছিলেন। আর বলছিলেন, রাসূল ﷺ এর বরকতময় দাড়ি থেকে তোমার হাত সরাও।

এরপর উরওয়া রাসূল ﷺ এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের সৌজন্যবোধ লক্ষ্য করছিলো। তারপর সে কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বললো, আল্লাহর কসম! আমি কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েছি। আমি কোনো সম্রাটকে এমন দেখিনি; যেমন সম্মান মুহাম্মাদ (ﷺ) কে তাঁর সাহাবাগণ করেন। নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে এমন গুণ আছে, যার কারণে তাঁর সঙ্গীগণ তাঁকে এত সম্মান করেন। তোমরা তার প্রস্তাবটি মেনে নাও।

শিক্ষা:

> মুমিনের হৃদয়ের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিজেদের জীবন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে বেশি ভালোবাসবে।

কুরাইশ যুবকদের হঠকারিতা

এদিকে যখন কুরাইশ যুবকরা দেখলো নেতৃস্থানীয় লোকেরা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে, তারা ঠিক করলো রাতের বেলা গিয়ে মুসলিম শিবিরে এমন কাণ্ড ঘটিয়ে আসবে; যাতে করে যুদ্ধ বেধে যায়। তারা ৭০ বা ৮০ জন রাতের বেলা তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে গেলে সকলে ধরা খেয়ে যায়। তবে সন্ধিচুক্তির খাতিরে রাসূল ﷺ সকলকে ক্ষমা করে মুক্ত করে দেন।

দূত হিসেবে উসমান রাযি. কে প্রেরণ

রাসূল ﷺ চিন্তা করলেন কুরাইশদের নিকট এমন একজন দূত প্রেরণ করা দরকার; যিনি তাদের নিকট মুসলিমদের আগমন উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোরালোভাবে বলতে পারবেন। তাই তিনি উসমান রাযি. কে প্রেরণ করলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে আদেশ করলেন– তাদেরকে বলবে, আমরা উমরাহ করতে এসেছি। যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে। আর মক্কার মুসলিমদের জানিয়ে দেবে, অচিরেই আল্লাহ তাআলা'র রহমতে মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা পাবে। তখন আর আত্মগোপনে থাকার প্রয়োজন পড়বে না। উসমান রাযি. সেখানে গিয়ে কুরাইশদেরকে রাসূল ﷺ এর বাণী শুনিয়ে দিলেন।

উসমান রাযি. এর শাহাদাতের গুজব ও বাইআতে রিযওয়ান

কুরাইশদের সন্ধি করার ব্যাপারে কিছু সময়ের দরকার ছিলো। তাই তারা উসমান রাযি. এর প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত করতে চাইলো। কিন্তু উসমান রাযি. এর ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, উসমান রাযি. কে হত্যা করা হয়েছে। রাসূল ﷺ এ সংবাদ শুনে ঘোষণা দিলেন– لا نبرح حتى نناجز القوم "যুদ্ধের মাধ্যমে যতক্ষণ না চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা এ স্থান (কওমকে) পরিত্যাগ করবো না।" তারপর তিনি সাহাবাদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। সকলে রাসূল ﷺ এর হাতে মৃত্যুর উপর বাইআত হলেন। সবার বাইআত শেষ হলে রাসূল ﷺ স্বয়ং নিজ হাত ধরে বললেন, এ হচ্ছে উসমানের হাত। ইতোমধ্যে উসমান রাযি. ফিরে আসলেন এবং তিনিও অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। একজন মুসলিমের জন্য সকলের উৎসর্গিত হওয়ার এ বাইআতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে ইরশাদ

করেন–

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾

"মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হলেন, যখন তাঁরা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইআত নিলো।"[২৬১]

শিক্ষাঃ

০১. মুমিনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক অবশ্যই এক দেহের মতো হওয়া উচিত।

০২. একজন মুসলিমও যদি তাগুতের কাছে বন্দী থাকে; তাহলে তাঁকে উদ্ধার করার জন্য জিহাদ করা ফরয। এ জন্য গোটা পৃথিবীর সকল মানুষের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

০৩. মুমিনাত্মার পরমাকাঙ্খা হলো اعلاء كلمة الله। তাই সদা সর্বত্র আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা জিহাদে লিপ্ত থাকে।

সন্ধি-চুক্তি

কুরাইশরা পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করলো। খুব দ্রুতই তারা সুহাইল ইবনে আমরকে সন্ধি করার জন্য আলাপ-আলোচনা করতে পাঠিয়ে দিলো। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে নিম্নের দফাগুলো নির্দিষ্ট হলো–

০১. মুসলিমগণ এ বছর উমরাহ না করে ফিরে যাবেন। আগামী বছর থেকে তিন দিনের জন্য মক্কায় আগমন করা যাবে। তাঁদের সাথে সফরের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও কোষবদ্ধ তরবারি থাকবে।

০২. দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

০৩. যে সকল গোত্র বা কওম মুহাম্মাদ (ﷺ) মিত্রতায় থাকতে চায়, তারা তা করতে পারবে। আর যারা কুরাইশদের মিত্রতায় থাকতে চায়, তারাও তা পারবে।

---

২৬১. সূরা ফাতহ: ১৮

০৪. কুরাইশদের কোনো লোক যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মদীনায় চলে যায়; তবে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি মদীনা থেকে কেউ মক্কায় আসে; তবে কুরাইশরা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

রাসূল ﷺ আলী রাযি. কে আদেশ দিলেন, সন্ধির শর্তাবলী লেখার জন্য। তিনি بسم الله الرحمن الرحيم দিয়ে লেখা শুরু করলেন। সুহাইল ভেটো দিয়ে বললো, আমরা রহমান নামে কাউকে চিনি না। আপনি এভাবে লিখুন باسمك اللّهم (বিসমিকা আল্লাহুম্মা)। রাসূল ﷺ আলী রাযি. কে সেভাবে লিখতে নির্দেশ দিলেন। আলী রাযি. সেভাবেই লিখলেন। তারপর আলী রাযি. লিখলেন, هذا ما صالح عليه محمد رسول الله "এটা সেসব কথা; যার উপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সন্ধি করলেন।" এবারও সুহাইল বাধা দিলো যে, আমরা যদি আপনাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতাম; তবে আপনাকে আল্লাহর ঘর থেকে বিরত রাখতাম না, আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতাম না।

রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা মিথ্যা বললেও আমি আল্লাহর রাসূল, এটা মহাসত্য। তারপর আলী রাযি. কে রাসূল ﷺ সেটি মোছার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন। রাসূল ﷺ আলী রাযি. এর এ মানসিক অবস্থার সন্ধিক্ষণে নিজ হাতে সেই কথাটি মুছে দিলেন। তারপর পুরো চুক্তিটি লেখা হয়ে গেলো। রাসূল ﷺ এর মিত্রতায় বনু খুযাআ প্রবেশ করলো। যা তারা পূর্ব থেকেই ছিলো। আর কুরাইশদের পক্ষে বনু বকর যোগ দিলো।

শিক্ষা:

মুসলিমগণ নিজ থেকে কখনো কাফেরদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করে না; তবে কাফেররা নিজ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করলে এবং এতে মুসলিমদের বেশি ফায়দা থাকলে সন্ধি করা যেতে পারে।

চিত্র: হুদায়বিয়াহ'র সন্ধি সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ

আবু জান্দালের ফিরে যাওয়া

সন্ধিপত্র লেখার কাজ এখনো চলছে, এমন সময় সুহাইলের পুত্র আবু জান্দাল লোহার শিকলে জড়িত অবস্থায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসে নিজে নিজে মুসলিমদের দলের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে সুহাইল বললো, আপনার সঙ্গে যে মত বিনিময় করেছি, তার উপর আবু জান্দালই হলো প্রথম ব্যক্তি। রাসূল ﷺ বললেন, সন্ধিপত্র তো মাত্র লেখা হচ্ছে। এখনো তা কার্যকর হয়নি। সে বললো, তাহলে আমি আর এ সম্পর্কে আলোচনা করতে রাজি নই। রাসূল ﷺ বললেন, তাঁকে আমার জন্য ছেড়ে দাও। সে বললো, না। আপনার খাতিরেও আমি তাঁকে ছাড়বো না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাকে এতটুকু করতেই হবে। সে বললো, না আমি তা করতে পারি না। তারপর সুহাইল আবু জান্দাল কে চপেটাঘাত করে তাঁকে নিয়ে ফিরে গেলো। আবু জান্দাল চিৎকার করে করে বলছিলেন, আমার মুসলিম ভাইগণ! আমি কি ফিরে যাবো? তারা আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলবে। রাসূল ﷺ তখন তাঁকে ধৈর্যধারণের জন্য বললেন।

এদিকে উমর রাযি. দ্রুত তাঁর পাশে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করো। এরা তো মুশরিক, এদের রক্ত কুকুরের রক্তের সমান। তিনি তখন তলোয়ারের বাট তুলে ধরছিলেন। উমর রাযি. বলেন, আমি আশা করছিলাম। সে তাঁর পিতাকে হত্যা করে দেবে; কিন্তু সে পিতার ব্যাপারে কৃপণতা করেছে।

শিক্ষাঃ

০১. মুসলিমগণ সর্বদা সন্ধি-চুক্তির উপর অটল থাকে। যদিও তা (সাময়িকভাবে দৃশ্যত) নিজের বিরুদ্ধে হয়।

০২. মুমিনের অন্তরে সর্বদা দ্বীনের ভালোবাসা বিজয়ী থাকে। তাই দ্বীন বিরোধী হলে, কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ, দেশ বা অঞ্চলের কিংবা পরিবার-পরিজনের ভালোবাসা তাঁর হৃদয়ে ঠাঁই পায় না।

উমরাহ হতে হালাল হওয়া

সন্ধি-চুক্তি করার পর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামদেরকে কোরবানী করতে বললেন; কিন্তু কেউই নিজ স্থান ছাড়লো না। রাসূল ﷺ তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূল ﷺ মনোক্ষুণ্ন হয়ে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ রাযি. কাছে এসব ব্যক্ত করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, আপনি যদি চান সকলে এ আমল করুক; তবে আপনি নিজে উট জবাই করে নিন। নিজ মস্তক মুণ্ডন করে নিন। রাসূল ﷺ তাই করলেন; ফলে সাহাবাগণও তাঁর অনুরূপ করলেন। রাসূল ﷺ সে সময় আবু জাহেলের একটি উট জবাই করেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো, মুশরিকরা যেন মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে।

মুহাজিরাগণকে ফেরত না দেওয়া

সন্ধির পর কিছু সংখ্যক মহিলা হিজরত করেন। এদিকে কুরাইশরা তাঁদের নেওয়ার জন্য এলে রাসূল ﷺ তাঁদেরকে নিতে দেননি। বরং তিনি বললেন, চুক্তির মধ্যে যা লেখা হয়েছিলো, তা হলো– أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا "এ শর্তে সন্ধি করা হচ্ছে, আমাদের কোনো লোক আপনার নিকট গেলে যদিও সে আপনার দ্বীন গ্রহণ করুক না কেন, আপনি তাকে ফেরত দেবেন।" অতএব এ মহিলাগণ চুক্তির আওতায় পড়ে না।

উমর রাযি. এর বিষণ্নতা

উমর রাযি. সন্ধির পর রাসূল ﷺ এর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি সত্যের উপর নই? তারা কি মিথ্যার উপর নয়? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, অবশ্যই। উমর রাযি. বললেন, তাহলে আমরা কেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মুশরিকদের চাপে পড়বো?

রাসূল ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমি আল্লাহর রাসূল, আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন, অবশ্যই। কখনোই তিনি আমাকে ধ্বংস করে দেবেন না। উমর রাযি. এরপর আবু বকর রাযি. এর কাছে গেলেন। আগের মতোই আবু বকর রাযি. এর সাথে কথা বলতে লাগলেন। আবু বকর রাযি. রাসূল ﷺ এর মতো উত্তর দিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا "আমি তোমাকে

দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।"[২৬২] এ আয়াতের মধ্যে সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ আয়াতটি উমর রাযি. কে শুনালেন। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি একে বিজয় বলতে পারি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। উমর রাযি. সান্ত্বনা লাভ করে চলে গেলেন।

পরে উমর রাযি. নিজের ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি বলেন, সে ভুলে আমি এত ভীত হয়েছি যে, আমি অনেক আমাল করেছি, প্রচুর দান-খয়রাত করেছি। রোজা রেখে আসছি। দাস মুক্ত করে আসছি। এতকিছু করার পর এখন আমার কল্যাণের আশা করছি।

শিক্ষাঃ

০১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের সামনে সর্বদা আত্মসমর্পণ করতে হবে।

০২. আমীর কখনো সামনের অবস্থা ভেবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন; যাতে প্রকৃতই কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং আমীরের সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। যদিও বাহ্যিকভাবে কিছু বিষয় বুঝে নিতে কঠিন মনে হয়।

সন্ধির পর্যালোচনা

সন্ধির দফাগুলো নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তা স্পষ্ট হয় যে, তা ছিলো সুস্পষ্ট বিজয়। সাধারণভাবে এ সন্ধির প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হবে; যেন তা পরাজয়ের নামান্তর। কিন্তু তা নয়, কারণ এ সন্ধির দ্বারা মুশরিকরা এটা স্বীকার করে নিলো যে, তারা মুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করার যে দুঃস্বপ্ন দেখতো, তার ক্ষমতা তাদের নেই। অপরদিকে, সন্ধির চতুর্থ শর্তটি যদিও মুসলিমদের বিরুদ্ধে দেখা যায়। কিছুদিন পরে কুরাইশরা নিজেরাই তা বাদ দিতে রাসূল ﷺ এর কাছে অনুরোধ জানায়।

---

২৬২. সূরা ফাতহ: ০১

দুর্বল মুসলিমদের অবস্থার সমাধান

সন্ধির কিছু দিনের মধ্যে আবু বাসীর রাযি. মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনা আসেন। একটু পর তাঁকে নেওয়ার জন্য দু'জন লোককে কুরাইশরা পাঠায়। রাসূল ﷺ তাঁকে শর্তানুযায়ী তাদের হাতে সমর্পণ করেন। এ সাহাবীকে নিয়ে তারা চলে যাওয়ার পর পথে এক জায়গায় তারা বিশ্রাম করতে থামে। তখন আবু বাসীর রাযি. একজনের তলোয়ারের প্রশংসা করলেন এবং তা ধরতে চাইলেন। সে তো তার তলোয়ারের প্রশংসা শুনে অভিভূত। আবু বাসীর রাযি. তার তলোয়ার ধরতে চাইলে, সে তা ধরতে দিলো। আবু বাসীর সাথে সাথে তাকে হত্যা করলেন। অপরজন পালিয়ে এসে মদীনায় উপস্থিত হলো।

সে দৌড়ে এসে মাসজিদে নাববীতে রাসূল ﷺ এর সামনে উপস্থিত হলো। সে তার ভয়ের কারণ রাসূল ﷺ এর কাছে বললো। এদিকে আবু বাসীর রাযি. এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। আপনি আমাকে তাদের হাতে সমর্পণ করেছেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের নির্যাতন থেকে আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। রাসূল ﷺ তখন বললেন, তার মাতা ধ্বংস হোক! এ কোনো সঙ্গী পেলে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। আবু বাসীর রাযি. মদীনায় না থেকে এবার সমুদ্রোপকূলে নিজের অবস্থান করে নিলেন। এদিকে আবু জান্দাল রাযি.ও তাঁর সাথে এসে যোগ দিলেন। এরপর কুরাইশদের যে ব্যক্তিই ঈমান আনতেন, তিনি এদিকে চলে আসতেন।

তাঁরা সেখানে থেকে কুরাইশদের ব্যবসায়িক কাফেলার উপর হামলা করতেন। তাদের ধন-সম্পদ যা পেতেন নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসতেন। এরপর কুরাইশরা অতিষ্ঠ হয়ে তাঁদেরকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য রাসূল ﷺ এর কাছে অনুরোধ জানালেন। আর তারা এর সাথে এটাও বললো যে, কেউ যদি ইসলাম কবুল করে মদীনায় আসে; তবে তাঁকে আর তারা ফেরত চাইবে না।

শিক্ষা:

০১. নিজের স্বার্থবিরোধী হলেও মুসলিমগণ অঙ্গীকার পূরণে সদা প্রস্তুত থাকে। তাই আমাদেরকে অঙ্গীকার পূরণে সচেষ্ট হতে হবে।

০২. যুদ্ধের জন্য কখনো খলিফা থাকা শর্ত নয়; বরং খলিফা ছাড়াও যুদ্ধ হয়। অতএব খলিফা বা সুলতান না থাকার অযুহাতে জিহাদ থেকে পিছে থাকা যাবে না।

০৩. কাফেরদের ধ্বংস করার জন্য যথাসাধ্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এবং নিজেকে বন্দীদশা থেকে বাঁচাতে সর্বোপায়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

কুরাইশদের কলিজাসম পুত্রদের ইসলাম গ্রহণ

হুদায়বিয়াহ'র সন্ধি চুক্তির পর সপ্তম হিজরীর প্রথম ভাগে আমর ইবনে আস, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এবং উসমান ইবনে তালহা রাযি. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরা যখন মাসজিদে নাববীতে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল ﷺ বলে উঠলেন–

إن مكــة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها

"মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে আমাদের নিকট সমর্পণ করেছে।"[২৬৩]

---

২৬৩. হুদায়বিয়াহ'র সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে, ফাতহুল বারী: ৭/৪৩-৪৫, ৮৮ পৃ.; সহীহ বুখারী: ১/৩৭৮-৩৮১ পৃ.; ২/৫৯৮-৬০০ পৃ.; সহীহ মুসলিম: ২/১০৪-১০৬ পৃ.; ইবনে হিশাম: ২/৩০৮-৩২২ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/১২২-১২৭ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ২০৭-৩৫০ পৃ.; ইবনুল কাইয়্যিম জাওযীর লিখিত তারীখে উমর ইবনে খাত্তাব: ৩৯-৪০ পৃ.

দ্বিতীয় পর্যায়
পরিবর্তনের নতুন ধারা

হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে নিরাপত্তা ও শান্তি-স্বস্তির যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো ইসলামের দাওয়াতকে প্রসারিত করার জন্য তা একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ সন্ধির ফলে সাহাবাদের উদ্যমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলাম প্রচারের জন্য নতুন পরিধি সৃষ্টি হয়। এ সময়কার কাজকে নিম্নোক্ত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।

০১. প্রতিনিধি প্রেরণ। ০২. যুদ্ধ অভিযান ।

বাদশাদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

রাসূল ﷺ ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে বা সপ্তম হিজরীর প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রের জন্য সাহাবা কেরামের পরামর্শে রাসূল ﷺ একটি রুপোর আংটি বানিয়ে নেন; যার উপর মুদ্রিত ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এ মুদ্রণের আকৃতি ছিলো এরকম:

রাসূল ﷺ যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, তার মধ্যে তাদেরকে ইসলামের মৌলিক আকীদা লিখে প্রেরণ করেন। সেখানে লেখা থাকতো, ইসলাম গ্রহণ করো, নিরপদে থাকবে। এভাবে প্রায় সকল চিঠির মধ্যেই একই রকম লেখা থাকতো। তবে মাঝে মাঝে পত্রে কোনো শব্দের সংযোজন-বিয়োজন হতো।

শিক্ষা:

> প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো আবশ্যক নয়। বরং নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট দাওয়াত পৌঁছে দিলেই সকলের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়।

----

০১. হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে পত্র প্রেরণ: তাঁর নাম আসহামা ইবনে আবযার। রাসূল ﷺ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রাযি. এর হাতে ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে বা সপ্তম হিজরীর প্রথম ভাগে তাঁর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। আমর রাযি. পত্র দিলে তিনি তা পাঠ শেষে রাসূল ﷺ এর জন্য এ বার্তা দিলেন, আপনি যা কিছু আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন আমরা তা অবগত হলাম। আপনার চাচাতো ভাই ও সাহাবাগণের আতিথ্য করলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্য রাসূল। আমি আপনার পত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার করলাম। আপনার চাচাতো ভাইয়ের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলাম।[২৬৪]

রাসূল ﷺ নাজ্জাশীর কাছে খবর পাঠালেন, জাফর রাযি. ও হাবশার মুহাজির মুসলিমদেরকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি আমর ইবনে উমাইয়া রাযি. এর সাথে দু'টি নৌকা করে তাঁদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। একটি নৌকাতে জাফর রাযি., আবু মুসা আশআরী রাযি. ও অন্যান্য সাহাবীগণ ছিলেন। দ্বিতীয়টিতে তাঁদের পরিবারের লোকজন ছিলেন। প্রথম নৌকার লোকজন সরাসরি খায়বার প্রান্তরে গিয়ে রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করেন। আর দ্বিতীয়টির লোকজন মদীনায় চলে যান।[২৬৫]

এ নাজ্জাশী তাবূক যুদ্ধের পর নবম হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। রাসূল ﷺ সাহাবাদের নিয়ে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। এরপরে যে নাজ্জাশীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তার কাছেও একটি পত্র প্রেরণ করা হয়।[২৬৬]

০২. মিশরের সম্রাট মুকাওকিসের নিকট পত্র: মিশর ও ইস্কান্দারিয়ার শাসক জুরাইজ ইবনে মাত্তার; যার উপাধি ছিলো মুকাওকিস, তার নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করা হয়। এ পত্র দিয়ে রাসূল ﷺ হাতিব ইবনে আবী বালতাআহ রাযি. কে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে পূর্ববর্তী প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বাদশাদের শোচনীয় পরিণতির কথা বললেন। যারা তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী ছিলেন।

---

২৬৪. যাদুল মাআদ: ৩/৬২
২৬৫. ইবনে হিশাম: ২/৩৫৯
২৬৬. সহীহ মুসলিম: ২/৯৯

মুকাওকিস বললো, আমাদের একটি ধর্ম আছে। যতক্ষণ না আমরা তার চেয়ে উত্তম পাবো, তাছাড়া অন্য কিছু আমরা গ্রহণ করবো না। তবে হাতিব ইবনে আবী বালতাআহ রাযি. এর দাওয়াত দেওয়ার পর তিনি রাসূল ﷺ এর প্রশংসা করেন ও তাঁর সত্যতা স্বীকার করে নেন এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কথা বললেন। তারপর তাঁর চিঠিটি সযত্নে তুলে রাখেন।

মুকাওকিস রাসূল ﷺ এর জন্য কিবতীদের মাঝে অত্যন্ত সম্মানের অধিকারী দু'টি দাসী, কিছু পরিচ্ছেদ এবং বাহন হিসেবে একটি খচ্চর উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। মুকাওকিস রাসূল ﷺ এর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেও ঈমান আনেননি। তার প্রেরিত দাসী দু'টির নাম মারিয়া ও শিরীন। রাসূল ﷺ মারিয়া কে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেন। শিরীনকে হাসসান রাযি. এর অধীনে দিয়ে দেন।[২৬৭]
মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করা পত্রের কপি।

চিত্র: মুকাওকিসের নিকট প্রেরিত পত্রের কপি

২৬৭. যাদুল মাআদ: ৩/৬১

০৩. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট চিঠিঃ রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা রাযি. কে পত্র দিয়ে সম্রাট খসরু'র কাছে প্রেরণ করেন। যখন তাকে পত্র পাঠ করে শোনানো হলো, সে তা ছিঁড়ে ফেলে অহংকারের সাথে বললো, আমার একজন নিকৃষ্ট দাস আমার নামের পূর্বে তার নাম লিখলো। রাসূল ﷺ কিসরার এ ঔদ্ধত্যের কথা জানার পর বললেন, আল্লাহ যেন তার সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। রাসূল ﷺ যা বললেন পরে ঠিক তাই হলো। কিসরা তার অধীনস্থ ইয়ামানের গভর্নর বাজানকে নির্দেশ দিলো, দু'জন শক্তিশালী লোক পাঠিয়ে হিজাযের সেই লোককে আমার নিকট হাজির করো। বাজান দু'জন লোক নির্বাচন করে তাদের হাতে কিসরার সেই কথা সম্বলিত পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। তারা রাসূল ﷺ এর সাথে দাম্ভিকতার সাথে কথা বলতে লাগলো। তারা তাঁকে কিসরার সে কথাও শুনালো। রাসূল ﷺ বললেন, কাল এসো।

মদীনায় যখন বাজানের দূত উপস্থিত হয়েছিলো, সে সময় কিসরার প্রাসাদে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিলো। কায়সারের অনবরত হামলার তোপে তাদের পরপর পরাজয় ঘটতে থাকলো। এক সময় শিরওয়াইহ্ তার পিতা খসরুকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করে।[২৬৮] রাসূল ﷺ এ ঘটনা ওহীর মাধ্যমে জানতে পারেন।

পরবর্তী দিন তারা রাসূল ﷺ এর নিকট আসলে তিনি তাদেরকে এ ঘটনা অবহিত করেন। তারা এবারও ঔদ্ধত্য দেখিয়ে কথা বললো। তারা বললো, আপনার অপরাধের তালিকায় কি এ কথাও লিখে পাঠাবো?

রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তবে তাকে এ কথাও বলে দিও যে, আমার দ্বীন আমার শাসন সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, যেখান পর্যন্ত কিসরা পৌঁছেছে; বরং এর চেয়েও অগ্রসর হয়ে ঐ জায়গায় পৌঁছবে, যে পর্যন্ত গিয়ে উট ও ঘোড়ার পা থেমে যায়। তোমরা উভয়ে তাকে বলবে, সে যদি মুসলিম হয়ে যায়; তবে তার আয়ত্তাধীনে যা আছে তা তার শাসনেই থাকবে। তাকে তোমাদের জাতির জন্য শাসক বানিয়ে দেওয়া হবে।

---

২৬৮. ফাতহুল বারীঃ ৮/১২৭

এরপর দূতদ্বয় বাজানের নিকট মুহাম্মাদ ﷺ এর কথা উপস্থাপন করে। এর পরক্ষণেই শিরওয়াইহ্ এর চিঠি এসে পৌঁছে। সেখানে বলা ছিলো, সে তার পিতাকে হত্যা করেছে। আর তাদেরকে উপদেশ দিলো যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমার পিতা তোমাদেরকে পত্র লিখেছিলো পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁকে উত্তেজিত করবে না। এ ঘটনার পর বাজান ও তার পারস্যের বন্ধুগণ ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৬৯]

০৪. **রোমান সম্রাট কায়সারের নিকট পত্রঃ** এ পত্রটি রোমান সম্রাট হিরাকল বা হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত হয়। এ পত্রটির জন্য সাহাবী দাহ্ইয়াহ ইবনে খলীফা কালবী রাযি. মনোনীত হোন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, তিনি যেন বসরার শাসকের নিকট তা সমর্পণ করেন। অতঃপর বসরার শাসনকর্তা তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সে সময় আবু সুফইয়ান শাম দেশে একটি ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে ছিলেন। সে কাফেলার সাথে আবু সুফইয়ানকে হিরাকল ডেকে পাঠায় এবং রাসূল ﷺ সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করে। আবু সুফইয়ান রাসূল ﷺ এর উচ্চবংশ, উঁচু মর্যাদা, উন্নত চরিত্রের কথা স্বীকার করেন। তারপর হিরাকল তাঁর প্রচারিত বাণীর কথা জিজ্ঞেস করলে, আবু সুফইয়ান ইসলামের মৌলিক কথাগুলো শুনালেন। তারপর তাঁর বংশে অন্য কেউ নবুওয়াত দাবি করেছে কিনা জিজ্ঞেস করলে, আবু সুফইয়ান সত্য উপস্থাপন করেন। তাঁর অনুসারী সম্পর্কে জানতে চাইলে, আবু সুফইয়ান বললেন, দরিদ্র ও দুর্বলতর শ্রেণী তাঁর অধিকাংশ অনুসারী। হিরাকল বললো, এ শ্রেণীই নবীর অনুসারী হয়।

সবশেষে হিরাকল বললো, তুমি যা বলছো; তা যদি সত্য হয়। তাহলে তিনি শীঘ্রই আমার পায়ের নিচের জায়গাও অধিকার করে নেবেন। আমার জানা ছিলো, এ নবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমার ধারণা ছিলো না, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আসবেন। যদি আমি তাঁর নিকটবর্তী হতাম; তবে তাঁর দু'পা ধুয়ে দিতাম। আবু সুফইয়ান বর্ণনা করেন, এরপর হিরাকল পত্রটি পাঠ করলো। তারপর সেখানে শোরগোল সৃষ্টি হলে আমাদেরকে সেখান থেকে বাহিরে নিয়ে আসা হলো। আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবু কাবশার

---

২৬৯. ফাতহুল বারীঃ ৮/১২৭-১২৮ পৃ.; আল্লামা খুযরীকৃত মুহাযারাতঃ ১/১৪৭;

ছেলের ব্যাপারটি শক্তিশালী হলো। তার সম্পর্কে রোমীয়দের সম্রাট ভয় করছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, এরপর রাসূল (ﷺ) এর দ্বীন বিজয়ী হবে। এমনকি আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলামের স্থান করে দিলেন। আবু সুফইয়ান দেখলেন যে, হিরাকলের মাঝে এ পত্রের যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী উদাহরণ হলো, রাসূল ﷺ এর দূত দাহ্ইয়াহ কালবী রাযি. কে অর্থ-সম্পদ এবং মূল্যবান পোশাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে আসার পথে হাসমা নামক স্থানে জুযাম গোত্রের কিছু লোক তাঁর থেকে এসব লুটপাট করে নিয়ে যায়। তিনি সরাসরি রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা সবিস্তারে বললেন।

তাই যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. এর নেতৃত্বে জুযাম গোত্রের উপর অতর্কিতে হামলা করা হয়। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়। মহিলা, শিশু, উট ও ছাগল আটক করা হয়। তাদের মাঝে ও মুসলিমদের মাঝে সন্ধি করা হয়েছিলো। তাই তাদের অন্যতম নেতা যায়েদ ইবনে রিফাআহ জুযামী দেরি না করে রাসূল ﷺ এর কাছে চলে এলেন। এ গোত্রের কিছু লোক ও যায়েদ ইবনে রিফাআহ এর আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। তাই যখন দাহ্ইয়াহ কালবী রাযি. ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হোন, তখন তাঁকে তারা সাহায্য করেছিলেন। রাসূল ﷺ গনীমতের সম্পদ ও আটককৃতদের ফিরিয়ে দিলেন।[২৭০]

শিক্ষা:

সর্বাবস্থায় কাফেরদের উপর অতর্কিত হামলা করে তাদের সম্পদকে গনীমত বানানো জায়েয।

---

০৫. বুসরার শাসকের কাছে চিঠি: রাসূল ﷺ হারেস ইবনে উমায়ের আযদী রাযি. কে বুসরার শাসকের নিকট একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। এটি শামের একটি গ্রামের নাম। শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, শামে।

২৭০. যাদুল মাআদ: ২/১২২; তালকীহুল ফুহুম ২৯ পৃষ্ঠার হাশিয়া

শুরাহবিল বললো, মনে হয় আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর দূত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর সে তাঁকে হত্যার হুকুম দিলো। রাসূল ﷺ এর এ দূত ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা হয়নি।

০৬. বাহরাইনের শাসক মুনযিরের কাছে পত্র: তার পুরো নাম মুনযির ইবনে সাভী। তার কাছে পত্র বহনের দায়িত্ব পান আলা ইবনে হাযরামী রাযি.। পত্র পাওয়ার পর তিনি এ উত্তর প্রদান করেন, আপনার পত্র আমি লোকদের কাছে শুনিয়ে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক ঈমান এনেছে। আর কতক বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছে। আমার যমীনে ইয়াহুদী ও আগুনপূজারি আছে। তাই এ ব্যাপারে আপনার প্রক্রিয়া অবলম্বন করুন।

তার উত্তরে রাসূল ﷺ যে পত্র লিখলেন তার সারাংশ হলো, মুসলিমদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিন। আমি অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। তাদেরকে গ্রহণ করে নিন। যতক্ষণ আপনি কল্যাণের উপর থাকবেন, আমরা আপনাদেরকে আপনাদের কাজ থেকে অপসারিত করবো না; তবে যারা ইয়াহুদী ও মাজুসী তাদের উপর জিযিয়া প্রযোজ্য হবে।[২৭১]

০৭. ইয়ামামার বাদশা হাওযাহ ইবনে আলীর নিকট পত্র: এ পত্রটি সালীত ইবনে আমর আমেরী রাযি. বহন করেন। হাওযাহ তাঁকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করে। পত্র পড়ে শোনালে হাওযাহ তার উত্তরে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। সে রাসূল ﷺ এর কাছে পত্র লিখলো, আপনি যে বিষয়ের আহ্বান জানাচ্ছেন তার শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বলার কিছু নেই। আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। আমি আপনার কিছু খেদমত করার মনস্থ করেছি। অতএব, আমার উপর কিছু কাজ-কর্মের ভার অর্পণ করলে আমি আপনার আনুগত্য করবো। সালীত রাযি. কে তারপর উপঢৌকন দিয়ে সে বিদায় দেয়। তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে সব অবহিত করেন। রাসূল ﷺ বললেন, যদি সে যমীনের একটি অংশ আমার নিকট থেকে চায়; তবুও আমি তাকে তা দেবো না। সে নিজে ধ্বংস হবে। আর তার হাতে যা আছে তাও নিঃশেষ হবে। তারপর মক্কা বিজয়ের পরে জিবরাঈল আ. হাওযার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করেন।

---

২৭১. যাদুল মাআদ: ৩/৬১-৬২ পৃ.

রাসূল ﷺ বললেন, শোনো! ইয়ামামায় একজন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে; যাকে আমার পরে হত্যা করা হবে। কেউ একজন বললো, তাকে কে হত্যা করবে? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ও তোমার সাথীগণ।[২৭২]

০৮. দামিশকের শাসক হারিস ইবনে আবী শামির গাসসানীর নিকট পত্র: রাসূল ﷺ তাকে দাওয়াত কবুল করার আহ্বান জানান; তাহলে তার রাজত্ব স্থায়ী হবে বলে আশ্বাস দেন। এ পত্রটি বহন করেন আসাদ ইবনে খুযাইমাহ গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহাবী শুজা' ইবনে ওহাব রাযি.। পত্র পড়ে সে বললো, আমার রাজত্ব কে ছিনিয়ে নিতে পারে? আমি তার উপর আক্রমণ করবো। তার এ কথা কায়সারের নিকট পৌঁছলে সে তাকে রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। হারিস শুজা' ইবনে ওহাব রাযি. কে উপঢৌকন দিয়ে উত্তম পন্থায় বিদায় করেন।

০৯. আম্মানের সম্রাটের কাছে পত্র: রাসূল ﷺ আম্মানের সম্রাট জাইফার ও তার ভাই আব্দ এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাদের পিতার নাম ছিলো জুলান্দাই। এ পত্রটি আমর ইবনে আস রাযি. বহন করেন। পত্রের বিষয়বস্তু এমন ছিলো, প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর রাসূল ﷺ বলেন, যদি আপনারা দু'জন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন; তবে আপনাদেরকে শাসক হিসেবে রাখা হবে। না হয় আপনাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের অঞ্চলে সৈন্য পরিচালনা করা হবে। সেখানে নবুওয়াত বিজয়ী হবে।

পত্র বাহক আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, আম্মান গিয়ে আমি আব্দের সাথে দেখা করি। কারণ তাদের দু'জনের মাঝে আব্দ ছিলেন দূরদর্শী ও কোমল স্বভাবের। আমি তাকে আগমনের কারণ বললে, তিনি বললেন, বয়স ও রাজত্ব উভয় দিক থেকে আমার ভাই আমার চেয়ে বড়। আমি তার কাছে আপনাকে পৌঁছে দেবো; তবে আপনি কোন কথার দাওয়াত দেন? আমর রাযি. তখন তাকে ইসলামের মৌলিক কথাগুলো শুনালেন। আব্দ বললেন, আপনি নিজ সম্প্রদায়ের নেতার পুত্র, আপনার বাবা কী করেছেন? কারণ, তার কার্যক্রম হবে আমাদের অনুসরণীয়। আমর রাযি. তখন তার বাবার মন্দ পরিণাম অর্থাৎ ইসলাম বিমুখ হয়ে মৃত্যুবরণের কথা জানালেন।

---

২৭২. যাদুল মাআদ: ৩/৬৩

আব্দ তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতে চাইলেন। আমর রাযি. বললেন, আমি কিছুদিন আগেই ইসলাম কবুল করেছি। তখন আমি নাজ্জাশীর ওখানে ছিলাম। নাজ্জাশীও ইসলাম কবুল করেছেন। আব্দ জিজ্ঞেস করলেন, নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা হিরাকল জানেন না, মনে করেছি। আমর বললেন, কেন নয়? নাজ্জাশী আগে হিরাকল কে কর দিতেন; কিন্তু এখন ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এখন যদি হিরাকল আমার কাছে কর চায়, আমি তাকে এক কানাকড়িও দেবো না। হিরাকলের কাছে এর প্রতিবাদ করে বলা হলে হিরাকল নিজেই বলেছে, এ ব্যক্তি নিজের জন্য নতুন দ্বীন পছন্দ করেছেন। এখন আমি কী করতে পারি? আল্লাহর শপথ! যদি আমার রাজত্বের লোভ না থাকতো; তবে তিনি যা করেছেন আমিও তাই করতাম।

আব্দ আমর রাযি. এর কাছ থেকে ইসলামের আদেশ-নিষেধগুলো শুনে বললেন, এসব কথা কতই না উত্তম! যদি আমার ভাই এসবের অনুসরণ করতো! কিন্তু আমার ভাইয়ের ভেতরে রাজত্বের মোহ বেশি। কিছুতেই তিনি কারো অধীনতা মেনে নেবেন না।

আমর বললেন, যদি তিনি ইসলাম কবুল করেন; তবে তার রাজত্ব তারই থাকবে। ধনীদের কাছ থেকে সাদাকা নিয়ে তা গরীবদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হবে। আব্দ বললেন, এত বড় ভালো কথা। তারপর আমর রাযি. তার কাছে সাদাকার মানে পরিষ্কার করলেন। আব্দ বললেন, আমার মনে হয় না– আমার সম্প্রদায় তাদের স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তা মেনে নেবে।

আমর রাযি. বলেন, আমি আব্দের ঘরে কয়েক দিন ছিলাম। তিনি তার ভাইয়ের নিকট আমার কথা ব্যক্ত করলেন। একদিন আমাকে ডাক দেওয়া হলো। আমার কাছে থাকা পত্র তাকে দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরাইশরা কী করেছে? আমি উত্তর দিলাম, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে আর অন্যরা তরবারি দ্বারা পরাভূত হয়েছে। কিছু কথা হওয়ার পর আগামীকাল কথা বলার সিদ্ধান্ত হলো।

দ্বিতীয় দিন তার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি পাওয়া গেলো না। তাই আমি তার ভাই আব্দের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে বললে, তিনি আমাকে নিয়ে

গেলেন। তিনি বললেন, দাওয়াতের কথা আমি চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমি যদি এমন এক ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করি, যাঁর ঘোড়া এখানে এসে এখনও পৌঁছায়নি; তবে লোকেরা আমাকে দুর্বল বলবে। আর যদি তা এখানে আসে; তবে এমন এক লড়াই হবে যা আগে হয়নি। আমি বললাম, আচ্ছা! আমি আগামীকাল ফেরত যাচ্ছি। যখন আমার ফেরত যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাদের মনে বদ্ধমূল হলো, তারা একা আলাপ করলো। তার ভাই বললো, এ নবী যাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছেন; তাদের তুলনায় আমরা কিছুই না। তাছাড়া তিনি যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী দিন তারা আমাকে আবার ডাকলো। তারা এবার ইসলাম গ্রহণ করলেন।[২৭৩]

এমনিভাবে রাসূল ﷺ জাবালাহ ইবনে আইহুম গাসসানী, ইয়ামানের শাসক হারিস ইবনে আবদে কেলাল আল-হিমাইরীসহ প্রমুখের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

এসব পত্র প্রেরণের মাধ্যমে রাসূল ﷺ সকল রাজা-বাদশার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিলেন। কেউ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। আর কেউ ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে এর দ্বারা এতটুকু সুবিধা হয়েছে, যারা দ্বীন অস্বীকার করেছে; তারাও এর ব্যাপারে জেনে গেলো এবং এর প্রতি মনোযোগী হলো।

শিক্ষা:

০১. দাওয়াতের জন্য প্রথম টার্গেট করতে হবে নেতৃস্থানীয়দেরকে। কারণ, তারা দাওয়াত কবুল করলে তাদের অধীনস্থ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তা গ্রহণ করবে।

০২. গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম সকল মানুষের ধর্ম। তাই দ্বীনের বাণী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য।

০৩. নেতৃস্থানীয়দের সাথে উপযুক্ত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত

---

২৭৩. যাদুল মাআদ: ৩/৬৩-৬৪ পৃ.

দিতে হবে। মানুষের নিকট হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে সুন্দর উপস্থাপন ভঙ্গির মাধ্যমে দাওয়াত পেশ করতে হয়।

০৪. অহংকারের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। তাই এ নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

০৫. হিদায়াত আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ঈমানের নূর দান করেন।

হুদায়বিয়াহ'র সন্ধির পরে পরিচালিত সামরিক অভিযান

গযওয়ায়ে যু-কারাদ বা গাবাহ

খায়বার যুদ্ধের মাত্র তিন দিন পূর্বে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়।[২৭৪] সালামাহ ইবনে আকওয়া রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ স্বীয় দাস রবাহ'র তত্ত্বাবধানে রাসূলের সওয়ারির উট পাঠিয়েছিলেন চারণভূমিতে। বনু ফাযারা গোত্রের আব্দুর রহমান ফাযারী পশুপালের উপর আক্রমণ করে রাখালকে হত্যা করে ও পশুপাল নিয়ে পলায়ন করে। আমি রবাহকে একটি ঘোড়া দিয়ে বললাম, সে যেন রাসূল ﷺ এর কাছে সংবাদটি পৌঁছে দেয়। তারপর আমি ছোট একটি পাহাড়ে উঠে মদীনামুখী হয়ে তিনবার আওয়াজ করে তাদেরকে সতর্ক করে দেই। তারপর আক্রমণকারীদের পিছু ধাওয়া করি।

আমি তাদের পিছু ধাওয়া করি ও অবিরত তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকি। যখন কেউ আমার দিকে অগ্রসর হতো, আমি গাছের আড়ালে বসে গা ঢাকা দিতাম। যখন তারা অপ্রশস্ত রাস্তায় প্রবেশ করলো, আমি পাহাড়ে উঠে পাথর নিক্ষেপ করে তাদের অগ্রগতি আঁচ করছিলাম, যে পর্যন্ত না তারা রাসূল ﷺ এর উটগুলো পেছনে ছেড়ে দিলো। তারপরও আমি তাদের পেছনে অগ্রসর হতে থাকি। তারা দ্রুত যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সামানাগুলো খুলে ফেলেছিলো, আমি সেগুলোকে পাথর দিয়ে চেপে রেখে গেলাম যেন মুসলিম বাহিনী বুঝতে পারে তা গনীমতের মাল। তারা একটি অপ্রশস্ত মোড়ে এসে দুপুরের খাবার খেতে লাগলো, আমিও তখন একটি চূড়ার উপর গিয়ে বসলাম। তাদের থেকে চারজন আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলে আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তোমরা কি আমাকে চেনো? আমি হলাম সালামাহ ইবনুল আকওয়া। আমি যার পিছু নিই, সে আমার হাত থেকে রেহাই পায় না। আর যে আমাকে ধাওয়া করবে, আমার নাগাল সে কখনোই পাবে না। এ কথা শুনে তারা সকলে চলে গেলো। আমি সেখানে বসে থাকলাম যতক্ষণ না মুসলিমগণ আসলেন।

---

২৭৪. সহীহ বুখারী: ২/৬০৩; সহীহ মুসলিম: ২/১১৩-১১৫ পৃ.; ফাতহুল বারী: ৭/৪৬০-৪৬২ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/১২০

এ সময় রাসূল ﷺ এর ঘোড়সাওয়ারগণকে বৃক্ষসারির মাঝে দেখা গেলো। আখরাম রাযি. ও আব্দুর রহমানের মাঝে টক্কর লাগে। এতে আখরাম রাযি. শহীদ হয়ে যান। আবু কাতাদাহ রাযি. বর্শা দিয়ে আঘাত করায় আব্দুর রহমান আহত হয়ে যায়। এতে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করছিলাম। তখন তারা পিপাসার্ত ছিলো। যু-কারাদ নামক ঝর্ণার দিকে এগিয়ে তারা পানি খেতে চাইলো। আমি তাদের ও ঝর্ণার মাঝে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে পানি খাওয়া থেকে বিরত রাখলাম। এরপর সূর্যাস্তের পর রাসূল ﷺ ও মুসলিম বাহিনী আমার নিকট পৌঁছলেন। আমি রাসূল ﷺ এর কাছে অনুরোধ জানালাম, তারা পিপাসার্ত ছিলো। যদি আপনি আমার সঙ্গে একশ' লোক দেন; তবে আমি পালানসহ তাদের ঘোড়াগুলো ছিনিয়ে আনতে পারি। তাদেরকে আপনার দরবারে হাজির করতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, আকওয়া পুত্র! তুমি অনেক করেছো। এবার ক্ষান্ত দাও। এ সময় তারা বনু গাত্বাফানে আপ্যায়িত হচ্ছিলো।

রাসূল ﷺ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে সালামাহ রাযি. ও আবু কাতাদাহ রাযি. এর বীরত্বের প্রশংসা করে বললেন, আজকে আমাদের সবচেয়ে উত্তম ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদাহ এবং উত্তম পদাতিক সালামাহ ইবনুল আকওয়া।[২৭৫]

শিক্ষা:

অনেক শত্রুকে পরাস্ত করতে বীরত্বের সাথে দৃঢ়ভাবে লড়াই করলে একজন বীর মুজাহিদই যথেষ্ট।

---

২৭৫. প্রাগুক্ত

গযওয়ায়ে খায়বার

[মুহাররম সপ্তম হিজরী]

খায়বার মদীনার আশি বা ষাট মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি শহরের নাম। সে সময় এখানে কয়েকটি দুর্গ ও চাষাবাদের ব্যবস্থা ছিলো।

যুদ্ধের কারণ

ইয়াহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্র করে আসছিলো। মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার পর তারা খায়বারকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলে। তারাই কুরাইশ ও গাত্বাফান গোত্রকে আহযাবের যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিলো। তারপর বনু কুরাইযাহকে সন্ধি ভঙ্গ করে তাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলো। তারা মুনাফিকদের সাথে মিলে অনবরত চক্রান্ত করে চলছিলো। মোট কথা, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা ছিলো একেবারে উন্মুখ। তার উপর তারা রাসূল ﷺ কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করে যাচ্ছিলো।

মোট কথা, তারা ইসলাম ও মানবজাতির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ইসলামের জন্য তারা ছিলো বড়ই বিপজ্জনক। এ সকল কারণে আহযাব যুদ্ধের তিনটি শক্তির প্রথম ও শক্তিশালী অংশ যখন হুদায়বিয়াহ'র সন্ধির মাধ্যমে আয়ত্তে আনা গেলো। এবার খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে বোঝাপোড়ার সময়। রাসূল ﷺ এক্ষেত্রে বিলম্ব করার কারণ ছিলো। কুরাইশরা ছিলো ইয়াহুদীদের তুলনায় শক্তিশালী; তাই এদের সাথে লড়ে শক্তি ও সম্পদ ক্ষয় করা সঙ্গত নয়। কিন্তু এখন তো কুরাইশদেরকে দমানো গেলো, এবার তবে ইয়াহুদীদের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। আর হুদায়বিয়াহ'র সন্ধির সময় আল্লাহ তাআলা খায়বার বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছিলেন ইশারায়। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা

দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্দ করে দিয়েছেন; যাতে এটা মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"[২৭৬]

শিক্ষা:

০১. পৃথিবীতে ইয়াহুদীর মতো জঘন্য জাতি দ্বিতীয়টি নেই। বারবার শাস্তি পেয়েও তারা একই অপরাধে লিপ্ত হয়; তাই তাদের ফেতনা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

০২. ইয়াহুদীরা যতই আত্মসমর্পণ বা সন্ধি-চুক্তি করুক, সুযোগ পেলেই তারা গাদ্দারি করে বসে। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোনো ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

সৈন্য সংখ্যা

মুনাফিক ও দুর্বল প্রকৃতির কিছু মুসলমান হুদায়বিয়াহ'র সফর থেকে বিরত থাকে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

"তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলো; তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই

২৭৬. সূরা ফাতহ: ২০

এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো। আর তারা সামান্যই বোঝে।"[২৭৭]

....

তাই হুদায়বিয়ায় যারা অংশ নিয়েছিলেন, তারাই শুধু এ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাদের সংখ্যা ১৪০০ জন। كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ আয়াতের এ অংশের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খায়বার অভিযানে গনীমত কেবল তাদের জন্য; যারা হুদায়বিয়াহ'র সফরে ও বাইআতে রিদওয়ানে অংশ নিয়েছিলেন।

মুনাফিকদের কাণ্ড-কারখানা ও খায়বারবাসীর সাহায্য চুক্তি

মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই খায়বারের ইয়াহুদীদেরকে অভিযানের কথা জানিয়ে দেয়। এদিকে খবর পেয়ে খায়বারবাসী বনু গাত্বাফানের সাথে আঁতাঁত করতে থাকে। তারা বনু গাত্বাফানের সাথে চুক্তি করে, যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা বিজয় লাভ করে; তবে খায়বারের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক তাদের দেওয়া হবে।

শিক্ষা:

মুনাফিকরা বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা সুযোগ পেলেই ছোবল মারার জন্য এক পায়ে খাড়া থাকে।

খায়বারের পথে মুসলিম সেনাবাহিনী

খায়বার যাওয়ার পথে রাসূল ﷺ রাযী' নামক উপত্যকায় পৌঁছেন। এ রাযী' হতে একদিন ও একরাতের ব্যবধানে বনু গাত্বাফানের বসতি। তারা প্রস্তুতি নিয়ে খায়বারবাসীর সাহায্যার্থে এগিয়ে যাচ্ছিলো। এ সময় তারা পেছনে মহিলা ও শিশুদের ক্রন্দন চিৎকার শুনতে পেয়ে ধারণা করে মুসলিম বাহিনী হয়তো তাদের বসতির উপর হামলা করেছে। তাই তারা খায়বারকে মুসলিমদের জন্য রেখে চলে আসে।

---

২৭৭. সূরা ফাতহ: ১৫

এরপর রাসূল ﷺ মুসলিমদের সাথে থাকা দু'জন পথপ্রদর্শকের মধ্য থেকে হুসাইলের কাছে এমন পথের কথা জানতে চাইলেন, জানা গেলো উত্তর দিক দিয়ে গেলে ইয়াহুদীদেরকে শামের পথে পলায়ন করা থেকে রোধ করা যাবে এবং বনু গাত্বাফানের সাহায্যের পথ বন্ধ করে দেওয়া যাবে।

শিক্ষাঃ

০১. আল্লাহর উপর ভরসা করে মুমিন জিহাদের বের হলে আল্লাহ তাআলা শত্রুর অন্তরে ভয় ঢেলে দেন।

০২. যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, পথ-ঘাট এবং মানচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

খায়বার অঞ্চলে ইসলামী সৈন্যদল

হামলার আগের দিন মুসলিম বাহিনী খায়বারের সন্নিকটে রাত অতিবাহিত করেন। মুসলিম বাহিনী অন্ধকার থাকাবস্থায় ফজর আদায় করে খায়বারের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় ইয়াহুদীরা কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে মাঠের দিকে যাচ্ছিলো। তারা অগ্রসরমান মুসলিম সেনাগণকে দেখে শহরের দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়।[২৭৮]

শিক্ষাঃ

শত্রুদেরকে তাদের ঘাঁটিতে গিয়ে হামলা করতে হবে। যেন তারা প্রস্তুতি নিতে না পারে এবং তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা যায়।

খায়বারের বর্ণনা

খায়বারের জনবসতি দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত। প্রথম অঞ্চলের নাতাত এলাকায় তিনটি দুর্গ ও শ্বক অঞ্চলে দু'টি দুর্গ।

যথাক্রমে এগুলো হচ্ছে, ০১. নায়িম দুর্গ, ০২. সা'ব ইবনে মুআয দুর্গ, ০৩.

২৭৮. সহীহ বুখারী, খায়বার যুদ্ধ অধ্যায়: ২/৬০৩-৬০৪ পৃ.

যুবায়ের দুর্গ, ০৪. উবাই দুর্গ ও ০৫. নিযার দুর্গ।

দ্বিতীয় অঞ্চলের নাম কাতিবাহ, এতে তিনটি দুর্গ ছিলো। তা হচ্ছে, ০১. কামূস দুর্গ (এটা বনু নাযীর গোত্রের আবুল হুকাইকের দুর্গ), ০২. ওয়াতীহ দুর্গ, ০৩. সুলালিম দুর্গ। এগুলো ছাড়াও সেখানে আরও অনেক ছোট-বড় দুর্গ ছিলো।

যুদ্ধপ্রস্তুতি

খায়বারের সংঘর্ষ শুধু প্রথম অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। দ্বিতীয় অঞ্চলের দুর্গ তিনটিতে যোদ্ধাদের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলিম বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে। রাসূল ﷺ সৈন্যদের শিবির স্থাপনের জন্য নাতাত দুর্গের সন্নিকটে স্থান নির্বাচন করেন। তারপর হুবাব ইবনে মুনযির রাযি. এর পরামর্শে সেখান থেকে শিবির সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ স্থানটি দুর্গের নিকটে ছিলো। দুর্গবাসী সহজেই মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারতো। দুর্গ থেকে তীর নিক্ষেপ করলে তা মুসলিম শিবিরে আঘাত হানার সম্ভাবনা ছিলো; কিন্তু মুসলিমগণ এ জায়গা থেকে তাদের উপর হামলা করে সুবিধা করতে পারতো না। তাছাড়া রাতের হামলারও ভয় ছিলো।

যে রাতে রাসূল ﷺ খায়বার সীমান্তে প্রবেশ করেন, তিনি ঘোষণা করেন আগামী কাল এমন একজনের হাতে পতাকা দেওয়া হবে; যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কে ভালোবাসেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন। পরদিন আলী রাযি. এর হাতে পতাকা উঠিয়ে দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ তাঁকে উপদেশ দেন, শান্তির সাথে চলো। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। তাদের কাছে আল্লাহর হক্ব সম্পর্কে বলবে। আল্লাহ যদি তোমাদের মাধ্যমে একজনকেও হিদায়াত দেন; তাহলে তোমাদের জন্য তা লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ সৌভাগ্যের বিষয় হবে।[২৭৯]

শিক্ষা:

> যুদ্ধের অন্যতম একটি কৌশল হলো, শত্রুর নাগালের বাহিরে উপযুক্ত স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করা।

---

২৭৯. সহীহ বুখারী, খায়বার যুদ্ধ: ২/৬০৫-৬০৬ পৃ.

নায়িম দুর্গ পদানত

আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে এ দুর্গটি ছিলো প্রথম শ্রেণীর ও সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এটি ছিলো মারহাব নামক এক যোদ্ধার দুর্গ। যাকে এক হাজার পুরুষের সমান মনে করা হতো। আলী রাযি. তাদের নিকট এসে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন; কিন্তু তারা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। মারহাবের নেতৃত্বে তারা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এলো। মারহাব প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মুসলিমদের আহ্বান করলো। সালামাহ ইবনে আকওয়া রাযি. বলেন, যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম, তখন ইয়াহুদীদের সম্রাট মারহাব তরবারি হাতে নিয়ে অহংকারের সাথে কবিতা আবৃত্তি করছিলো–

قد عَلِمتْ خيبر أني مَرْحَب

شَاكِي السلاح بطل مُجَرَّب

إذا الحروب أقبلتْ تَلَهَّب

"খায়বার জানে– আমি মারহাব অস্ত্রে সজ্জিত বীর এবং দক্ষ, যখন যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়।"

এ সময় তার বিরুদ্ধে আমার চাচা এগিয়ে যান। আর তিনি বলতে থাকেন–

قد علمت خيبر أني عامر ** شاكي السلاح بطل مُغَام

"খায়বার জানে– আমি আমির অস্ত্র সজ্জিত বীরযোদ্ধা।"

তারপর উভয়ে পরস্পরের প্রতি হামলা করলো। মারহাব সুবিধা করতে পারছিলো না। তার তরবারি আমার চাচার ঢালে আটকে যায়। সে নিচ থেকে মারতে চেষ্টা করে। চাচা তার পায়ের গোছায় আঘাত করলে, তা না লেগে উল্টো চাচার গায়ে এসে পড়ে। এ আঘাতেই তিনি অবশেষে শাহাদাতবরণ

করেন। রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দু'টি আযরের ঘোষণা করেন।[২৮০] এরপর মারহাব অন্য একজনকে আহ্বান করলো ও কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। এবার আল্লাহর সিংহ আলী রাযি. এগিয়ে গেলেন। তিনি তখন আবৃত্তি করছিলেন:

أنا الذي سمتني أمي حَيْدَرَهْ
كلَيْثِ غابات كَرِيه المَنْظَرَهْ
أُوفِيهم بالصَّاع كَيْل السَّنْدَرَهْ

"আমি সেই; যাকে তাঁর মা হায়দার (বাঘ) উপাধি দিয়েছে। বনের বাঘের মতো ভয়ংকর। আমি সা' এর বিনিময়ে বর্শার দ্বারা তাদের পাত্র পূর্ণ করে দেবো।"

তারপর তিনি তরবারি দিয়ে এমনভাবে তাকে আঘাত করেন যে, সেখানেই সে নিহত হয়। যুদ্ধের সময় যখন আলী রাযি. ইয়াহুদীদের দুর্গের নিকট পৌঁছলেন, তখন মারহাবের ভাই ইয়াসির এগিয়ে আসলো। এবার যুবায়ের রাযি. ময়দানে অবতরণ করেন। যুবায়ের ইয়াসিরকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর নায়িম দুর্গে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে তাদের নেতৃস্থানীয় অনেকেই মারা যায়; ফলে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তারা সঙ্গোপনে এ দুর্গ পরিত্যাগ করে সা'ব নামক দুর্গে আশ্রয় নেয়। ফলে নায়িম দুর্গ মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

সা'ব ইবনে মুআয দুর্গ

মুসলিমগণ হুবাব ইবনে মুনযির রাযি. এর নেতৃত্বে তাদের উপর হামলা করেন। তিন দিন যাবৎ অবরোধ করে রাখার পর তৃতীয় দিন রাসূল ﷺ তা বিজয়ের জন্য আল্লাহর সমীপে বিশেষভাবে দুআ করলেন। রাসূল ﷺ এর কাছে আসলাম কবিলার সাহম গোত্রের কতিপয় লোক এসে তাদের

---

২৮০. সহীহ বুখারী, খায়বার যুদ্ধ: ২/১২২

দারিদ্রতার অভিযোগ করেন। তারপর রাসূল ﷺ তাদের দারিদ্রতা মেটানোর কথা বলে দুআ করেন।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম প্রবল বিক্রমে আক্রমণ শুরু করেন। আসলাম গোত্র ছিলেন আক্রমণের অগ্রভাগে। এখানে দুর্গের সামনে সংঘর্ষ হয়। তারপর সূর্য ডোবার আগেই এ দুর্গ পদানত হয়। এতে মুসলিমগণ মিনজানীক ও দাববাব লাভ করেন। দুর্গ বিজিত হওয়ার পর দেখা গেলো খায়বারে এমন কোনো দুর্গ নেই; যার মধ্যে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ খাদ্য ও চর্বি মজুদ ছিলো।[২৮১]

যুবায়ের দুর্গ

নায়িম দুর্গ থেকে পালিয়ে ইয়াহুদীরা পর্বত চূড়ার উপর দুর্গম যুবায়ের দুর্গের ইয়াহুদীদের সাথে একত্রিত হয়। এর উপর ঘোড়া তো দূরের কথা পায়ে চলে উঠাও মুশকিল। রাসূল ﷺ তা অবরোধ করতে বললেন। তিন দিন অবরোধের পর একজন ইয়াহুদী এসে বললো, তাদেরকে যদি একমাসও আটকে রাখা হয়, তাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তবে দুর্গের তলে পানির ঝর্ণাটি তাদের পানির উৎস; সেটি দখলে নিতে পারলেই তারা বিপদ টের পাবে। এরপর ঝর্ণাটি দখলে নিলে তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে কয়েকজন মুসলিম শহীদ হোন। আর ১০ জন ইয়াহুদী নিহত হয়। দুর্গ মুসলিমদের দখলে চলে আসে।

উবাই দুর্গ

মুসলিম বাহিনী এ দুর্গ অবরোধ করার পর ইয়াহুদীদের দু'জন বীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান করলে মুসলিম বীরদের হাতে তারা নিহত হয়। দ্বিতীয়জনের হত্যাকারী ছিলেন বিখ্যাত বীর লাল পাগড়িধারী আবু দুজানাহ রাযি.। শেষজনকে ধরাশায়ী করার পর আবু দুজানাহ রাযি. ও মুসলিমগণ দুর্গের ভেতরে চলে যান ক্ষিপ্র গতিতে। তারপর উভয় দলের মাঝে প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে; কিন্তু ইয়াহুদীরা মুসলিমদের বীরত্বের সামনে টিকতে পারলো না। তারা এ দুর্গ ছেড়ে নিযার দুর্গে পালিয়ে যায়।

---

২৮১. ইবনে হাশিম: ২/৩৩২

নিযার দুর্গ

এটি ছিলো প্রথম অঞ্চলের সর্বশেষ ও সবচেয়ে মজবুত দুর্গ। ইয়াহুদীরা তাই এ দুর্গে মহিলা ও শিশুদের রেখেছিলো। এদিকে দুর্গটি পর্বতশীর্ষে হওয়ায় সুরক্ষিত ছিলো। মুসলিমগণ প্রবলভাবে দুর্গটি অবরোধ করলেন। ইয়াহুদীরা বাহিরে বের হচ্ছিলো না। বরং তারা দুর্গ থেকেই তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে প্রবলভাবে আক্রমণ করছিলো । তখন রাসূল ﷺ মিনজানীক ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন। মিনজানীক ব্যবহারে দুর্গের দেয়ালে বড় ফাটল সৃষ্টি হলো। মুসলিম বাহিনী সে পথ ধরে দুর্গে প্রবেশ করেন ও তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হোন। ইয়াহুদীরা এবারও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তারা ভীত হয়ে তাদের স্ত্রী ও শিশুদেরকে রেখে পালিয়ে যায়।

এ অঞ্চলে আরও কিছু ছোট-খাটো দুর্গ ছিলো; কিন্তু তারা সেখান থেকে পালিয়ে দ্বিতীয় অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

খায়বারের দ্বিতীয় অঞ্চল পদানতকরণ

কাতিবাহ অঞ্চলের কামূস দুর্গের উপর অবরোধ আরোপ করলে এখানে সংঘর্ষ হয়। মুসলিম বাহিনী ইয়াহুদীদেরকে পরাজিত করেন। এরপর অন্য দু'টি দুর্গে অবরোধ আরোপ করলে তারা দুর্গ থেকে বের হচ্ছিলো না। যখন মিনজানীক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে এসে সন্ধির মনোভাব ব্যক্ত করে।

ইবনে আবিল হুকাইক রাসূল ﷺ এর সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি অভয় ও কথা বলার অনুমতি দেন। তারপর এ শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি হলো যে, দুর্গের সৈনিকদের জীবন রক্ষা করা হবে, তাদের পরিবারবর্গকে তাদের সাথে থাকতে দেওয়া হবে। পরিবারসহ তাদেরকে খায়বার ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে। এর বিনিময়ে তারা তাদের সম্পদ, ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র মুসলিমদেরকে দিয়ে দেবে। ইয়াহুদীরা এ সকল শর্ত মেনে নিলে, তাদের সাথে সন্ধি করা হয়।[২৮২]

এদিকে আবুল হুকাইকের দু'পুত্র শর্ত ভঙ্গ করে অনেক সম্পদ গোপনে সরিয়ে নেয়। তারা একটি চামড়াও চুরি করে, যার মধ্যে অনেক মূল্যবান

---

২৮২. যাদুল মাআদ: ২/১৩৬

সম্পদ ও হুয়াই ইবনে আখতাবের অলঙ্কারগুলো ছিলো। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলো কিনানার চাচাতো ভাই। রাসূল ﷺ কিনানাহ ইবনে আবিল হুকাইককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করে। ফলে তার চাচাতো ভাইয়ের কথা মতো সম্পদ লুকানো অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয়। তারপরও সেসব লুকানো সম্পদ সম্পর্কে বলতে অস্বীকার করে। তাই তাকে যুবায়ের রাযি. এর হাতে দেওয়া হয়। বলা হয়, যতক্ষণ না সমস্ত সম্পদ হাতে আসছে, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। যুবায়ের রাযি. তাকে একটা চকমকি পাথর দ্বারা বুকে আঘাত করতে থাকলেন। যখন সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলো, রাসূল ﷺ তাকে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি. এর হাতে সমর্পণ করেন; যেন তিনি তাঁর ভাই মাহমুদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তাকে হত্যা করেন।

শিক্ষা:

কাফেররা সর্বদা সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে থেকে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে। এটা আসলে তাদের দুর্বলতা ও ভীতির লক্ষণ।

শহীদ ও নিহতের সংখ্যা

মুসলিমদের মধ্যে শহীদদের সংখ্যা ছিলো ১৬ জন। মতান্তরে ১৮ জন। আল্লামা মানসূরপুরী ১৯ জনের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, আমি ২৩ জনের নাম পেয়েছি। আর ইয়াহুদীদের মৃতের সংখ্যা ছিলো ৯৩ জন।

গনীমত বণ্টন

রাসূল ﷺ চেয়েছিলেন, ইয়াহুদীদেরকে খায়বার থেকে বিতাড়িত করবেন; কিন্তু তারা অনুরোধ করলো তাদেরকে এখানে থাকতে দিতে। এদিকে রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের নিকট এমন দাস ছিলো না; যারা এগুলো চাষাবাদ করবে। তাই তাদেরকে রাসূল ﷺ যতদিন চাইবেন, ততদিন উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দেওয়ার শর্তে এখানে থাকার অনুমতি দিলেন।

খায়বার থেকে অনেক গনীমত লাভ হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেছেন, তখন তিনি এ কথাও বলেছেন– যে পর্যন্ত না খায়বার বিজয় হলো, সে পর্যন্ত আমরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি।[২৮৩] খায়বার থেকে প্রাপ্ত গনীমত দ্বারা মুসলিমদের অভাব মিটে যায়, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের সম্পদগুলো ফিরিয়ে দিলেন।

শিক্ষা:

০১. মুসলিমদের উপকার বেশি থাকলে শত্রুদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করা বৈধ।

০২. জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমদের অভাব দূর হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে জিহাদের মাধ্যমে অনেক গনীমত দান করেন। আর হালাল রিযিকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রিযিক হলো গনীমতের মাল।

জাফর ও আশআরী সাহাবাগণ রাযি. এর আগমন

খায়বার যুদ্ধের মধ্যে জাফর ইবনে আবু তালিব রাযি. এবং আবু মূসা রাযি. ও তাঁর গোত্রের কতিপয় লোক হাবশা থেকে রাসূল ﷺ এর দূতের সাথে আসেন। রাসূল ﷺ জাফর রাযি. এর আগমনে অত্যন্ত খুশি হোন। তিনি জাফর রাযি. কে চুম্বন করে বললেন, জানি না আজ আমি কীসে অধিক আনন্দিত– খায়বার বিজয়ে, না জাফরের আগমনে? তারপর তাঁর সাথে আগত সকলের জন্য গনীমতের একটি অংশ নির্ধারণ করলেন। এছাড়া যুদ্ধ করেনি এমন আর কারো জন্য গনীমত নির্ধারণ করা হয়নি।[২৮৪]

সাফিয়্যাহ রাযি. এর সঙ্গে বিয়ে

সাফিয়্যাহ রাযি. ছিলেন কিনানাহ ইবনে আবিল হুকাইকের স্ত্রী। তার নববধু থাকা অবস্থায় কিনানাহর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর সাফিয়্যাহ বন্দী মহিলাদের দলভুক্ত হয়। যখন বন্দী মহিলাদের একত্রিত করা হয়। তখন দাহ্ইয়াহ

---

২৮৩. সহীহ বুখারী: ২/৬০৯
২৮৪. তারীখে খুযরী: ১/১২৮

কালবী রাযি. রাসূল ﷺ এর কাছে একজন দাসী চান। রাসূল ﷺ তাঁকে একজন বেছে নিতে বললে তিনি সাফিয়্যাহ্কে নিয়ে যান। এদিকে এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ কে বললেন, আপনি বনু কুরাইযাহ ও বনু নাযীরের সাইয়েদা সাফিয়্যাহ্কে দাহ্ইয়াহ রাযি. এর হাতে সমর্পণ করলেন? অথচ তিনি শুধু আপনার জন্যই উপযুক্ত। অতঃপর রাসূল ﷺ দাহ্ইয়াহ রাযি. কে সাফিয়্যাহ্র পরিবর্তে অন্য একজনকে বেছে নিতে বললেন।

রাসূল ﷺ সাফিয়্যাহ্কে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং নিজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন। মুক্তি দেওয়াকে তাঁর মোহর ধরা হয়েছিলো। রাসূল ﷺ বাসর রাতে তাঁর গালে একটি শ্যামল দাগ দেখলে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খায়বার আগমনের পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আকাশের চাঁদ তার কক্ষচ্যুত হয়ে আমার কোলে এসে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা জানেন, আপনার সম্পর্কে আমার কোনো কল্পনাও ছিলো না। আমার স্বামীকে যখন এ ঘটনা বললাম, তিনি তখন আমার মুখে চড় দিয়ে বললেন, মদীনার বাদশার প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হয়েছে?[২৮৫]

বিষাক্ত খাবারের ঘটনা

রাসূল ﷺ যখন খায়বার বিজয়ের পর আরামবোধ করলেন। তখন সাল্লাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস বকরির গোশত ভুনা করে পাঠালো। সে জেনে নিয়েছিলো যে, রাসূল ﷺ রানের গোশত পছন্দ করেন। তাই সে গোশতের সাথে ভালো করে বিষ মেশালো। তারপর তা রাসূল ﷺ এর কাছে নিয়ে আসে। রাসূল ﷺ রানের কিছু অংশ উঠিয়ে খাওয়া শুরু করে কিছু অংশ চিবানোর পর মুখ থেকে ফেলে দেন। বলেন, এ হাড্ডি আমাকে বলছে যে, এর সাথে বিষ মেশানো হয়েছে। তারপর যায়নাবকে ডাকা হলে সে সত্যতা স্বীকার করে বলে, আমি জানতে চেয়েছিলাম, যদি বাদশা হোন; তবে আমরা তাঁর থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবো। আর তিনি যদি নবীই হোন; তবে আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দেবেন। ফলে তিনি বেঁচে যাবেন। এরপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরে যখন এ গোশত খাওয়ার কারণে বিশর

---

২৮৫. যাদুল মাআদ: ২/১৩৭; ইবনে হিশাম: ২/৩৩৬

রাযি. মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাকে হত্যা করা হয়।[২৮৬]

শিক্ষাঃ

শত্রুরা সব সময় আমীরের এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের জীবন বিপন্ন করার অপেক্ষায় থাকে। এ জন্য খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

ফাদাক অভিযান

রাসূল ﷺ খায়বারে পৌঁছে মুহায়্যিসা ইবনে মাসউদকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ফাদাকের ইয়াহুদীদের কাছে প্রেরণ করেন। তারা প্রথমে সম্মতি প্রকাশ না করলেও পরবর্তীতে খায়বারে ইয়াহুদীদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলের কাছে তাদের উৎপাদনের অর্ধেক দেবে এ চুক্তিনামা প্রেরণ করেন। রাসূল ﷺ সানন্দে তা গ্রহণ করেন। তাদের উপর এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিমদেরকে কোনো ঘোড়া, উট বা তরবারি কিছুই ব্যবহার করতে হয়নি।[২৮৭]

ওয়াদিল কুরা অভিযান

খায়বার বিজয়ের পর রাসূল ﷺ যখন কিছুটা মানসিক প্রশান্তি অনুভব করছিলেন, তখন ওয়াদিল কুরায় বসবাসরত ইয়াহুদীদের কাছ গমন করলেন। তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আরবের একটি দল এসে যোগ দিলো। মুসলিমগণ কুরা উপত্যকায় উপনীত হলে তারা যুদ্ধের সাজে সারিবদ্ধ হয়ে তীর নিক্ষেপ করে। এতে রাসূল ﷺ এর মিদআম নামক দাস নিহত হোন। অতঃপর মুসলিম বাহিনীকেও সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের জন্য দাঁড় করানো হয়। তারপর রাসূল ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা অস্বীকার করে। এবং এক ব্যক্তিকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করে। রাসূল ﷺ যুবায়ের ইবনে মুতইমকে রাযি. কে তার মোকাবেলায় পাঠান। তিনি তাকে ধরাশায়ী করে ফিরে আসেন। এভাবে তাদের একেক করে ১১ জন নিহত হয়। প্রত্যেকজনের মৃত্যুর পর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হতো;

---

২৮৬. যাদুল মাআদ: ২/১৩৯-১৪০ পৃ., ফাতহুল বারী: ৭/৪৯৭; সহীহ বুখারী: ১/৪৪৯; ২/৬১০ ও ৮৬০ পৃ.; ইবনে হিশাম: ২/৩৩৭-৩৩৮ পৃ.

২৮৭. ইবনে হিশাম: ২/৩৩৭ ও ৩৫৩ পৃ.

কিন্তু তারা গ্রহণ করতো না। প্রথমদিন এভাবেই অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয়দিন সকালে তারা তাদের সমুদয় সম্পত্তি রাসূল ﷺ হাতে সমর্পণ করে দেয়। শুধু তাদের জমি-জমাগুলো খায়বারের ন্যায় অর্ধেকের বিনিময়ে সন্ধির মাধ্যমে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়।[২৮৮] রাসূল ﷺ ওয়াদিল কুরায় চার দিন অবস্থান করে সাহাবীদের মাঝে গনীমতের মাল বন্টন করে দেন।

শিক্ষা:

ইসলাম কখনো যুদ্ধের মাধ্যমে কাউকে হত্যা করতে চায় না; বরং তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাই দাওয়াহ ইলাল্লাহ জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তাইমা'র ইয়াহুদীদের সন্ধি-চুক্তি

খায়বার, ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরার ইয়াহুদীদের পতনের খবর জানার পর তাইমা'র ইয়াহুদীরা নিজ থেকেই রাসূল ﷺ এর নিকট দূত মারফত সন্ধি-চুক্তির প্রস্তাব করলো। রাসূল ﷺ তাদেরকে সম্পদসহ বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন[২৮৯] এবং তাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করেন।

শিক্ষা:

মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেই আল্লাহ তাআলা শত্রুর অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেবেন; তাই শত্রুর সংখ্যাধিক্যে ভয়ের কোনো কারণ নেই।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

খায়বারের বিবরণাদি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, রাসূল ﷺ সপ্তম হিজরীর সফর মাসের শেষ ভাগে কিংবা রবিউল আওয়াল মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে এক রাত্রিতে তাঁরা দীর্ঘ পথ চলার পর এক জায়গায় শিবির স্থাপন করেন। তখন বিলাল রাযি. কে ঘুম থেকে জাগ্রত

---

২৮৮. যাদুল মাআদ: ২/১৪৬
২৮৯. যাদুল মাআদ: ২/১৪৭

করার দায়িত্ব দিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়েন; কিন্তু হযরত বিলাল রাযি. কেও নিদ্রা আচ্ছন্ন করে নেয়। অতঃপর সূর্যের কিরণে প্রথমে রাসূল ﷺ এর ঘুম ভাঙে। সকলকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ফজরের সালাতের ইমামতি করেন। বলা হয়ে থাকে এ ঘটনাটি অন্য কোনো সফরে ঘটেছিলো।[২৯০]

সারিয়ায়ে আবান ইবনে সাঈদ

খায়বার অভিযানের প্রাক্কালে মদীনার আশপাশে অবস্থানরত লুটতরাজ ও ডাকাত বেদুইনদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য আবান ইবনে সাঈদের নেতৃত্বে নাজদের দিকে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে ফেরার সময় খায়বারে রাসূল ﷺ এর সাথে দেখা হয়। তখন খায়বার বিজয় পর্ব শেষ হয়েছিলো। অধিকতর বিশুদ্ধ তথ্য হচ্ছে, এ অভিযান সপ্তম হিজরীর সফর মাসে প্রেরণ করা হয়েছিলো। সহীহ বুখারীতে এর উল্লেখ আছে।[২৯১] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন, 'এ অভিযানের অবস্থা আমি জানতে পারিনি।'[২৯২]

সপ্তম হিজরীর অন্যান্য গযওয়া ও সারিয়্যাসমূহ

০১. যাতুর রিকা' যুদ্ধঃ রাসূল ﷺ আহযাবের দু'টি অঙ্গকে বিধ্বস্ত করে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন, তখন তিনি তৃতীয় অঙ্গটির প্রতি পূর্ণ মনযোগী হতে সক্ষম হয়েছেন। সেখানে অবস্থান করতো নাজদের বালুকাময় প্রান্তরে শিবির স্থাপনকারী কিছু বেদুইন। যারা মাঝে মাঝে ডাকাতি ও লুটতরাজে লিপ্ত হতো। তাদের কোনো স্থায়ী জনপদ ও দুর্গ না থাকায়, তাদেরকে বশীভূত করা ছিলো অত্যন্ত কঠিন। তাই তাদের শায়েস্তা করার জন্য রাসূল ﷺ যেই শাস্তিমূলক আক্রমণ পরিচালনা করেন, তা-ই যাতুর রিকা' যুদ্ধ নামে পরিচিত। সাধারণ যুদ্ধ বিশারদদের নিকট এটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু বুখারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, এটি সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো। এ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রাসূল ﷺ আনমার অথবা বনু গাত্বাফানের দু'টি

---

২৯০. ইবনে হিশাম: ২/৩৪০
২৯১. সহীহ বুখারী: ২/৬০৮-৬০৯ পৃ.
২৯২. ফাতহুল বারী: ৭/৪৯১

শাখা বনু সা'লাবাহ এবং বনু মুহারিবের লোকদের একত্রিত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হোন। তখন তিনি ৪০০ জন মতান্তরে ৭০০ জন সাহাবার একটি বাহিনী নিয়ে নাজদ অভিমুখে রওয়ানা হোন। তথায় বনু গাত্বাফানের সাথে মুখোমুখি হলেও উভয়ের মাঝে কোনো যুদ্ধ হয়নি; তবে রাসূল ﷺ তখন খওফের নামাজ আদায় করেন। এ যুদ্ধের ফলে বেদুইনরা খুবই ভীত হয়ে পড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মুসলিমদের অনুকূলে চলে আসে। তাই বড় বড় শহর ও বিভিন্ন দেশ বিজয়ের পথও প্রশস্ত হতে থাকে।

০২. কুদাইদ অভিযান: সপ্তম হিজরীর সফর কিংবা রবিউল আওয়াল মাসে বনু মুলাওওয়াহ গোত্রকে শায়েস্তার জন্য গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ লাইসীর পরিচালনায় কুদাইদ নামক স্থানে এ অভিযান প্রেরিত হয়। কেননা তারা বিশর ইবনে সুওয়াইদের বন্ধুগণকে হত্যা করেছে। এ অভিযানে তাদের অনেক লোক নিহত হয় এবং তাদের গবাদিপশুগুলো মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। অতঃপর তারা মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করতে আসলে পথিমধ্যে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়। এই সুযোগে মুসলিম বাহিনী নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

০৩. হিস্‌মা অভিযান: এ অভিযান সপ্তম হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে পরিচালিত হয়।

০৪. তুরাবাহ অভিযান: সপ্তম হিজরীর শা'বান মাসে হযরত উমর রাযি. এর নেতৃত্বে ৩০ জন সৈন্যের একটি বাহিনীকে বনু হাওয়াজিন অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনীর খবর পেয়ে তারা পলায়ন করে। ফলে কোনো সংঘাত ছাড়াই মুসলিম বাহিনী ফিরে আসে।

০৫. ফাদাক অঞ্চল অভিমুখে অভিযান: সপ্তম হিজরীর শা'বান মাসে বাশীর ইবনে সা'দ আনসারী রাযি. এর নেতৃত্বে বনু মুররার সংশোধন উপলক্ষ্যে ৩০ জন সৈন্যের এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। রাতে শত্রু বাহিনী মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। মুসলিমদের তীর শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আর মোকাবেলা করতে পারেননি। অবশেষে সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। শুধু বাশীর রাযি. জীবিত ছিলেন।

শিক্ষাঃ

সার্বক্ষণিকভাবে মুসলিমদের উপর আবশ্যক শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র মজুদ রাখা ও অস্ত্র তৈরি করা।

---

০৬. মাইফাআহ অভিযানঃ সপ্তম হিজরীর রমজান মাসে ১৩০ জন সৈন্যের একটি বাহিনীকে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ লাইসীর নেতৃত্বে বনু উওয়াল ও বনু আবদ ইবনে সা'লাবাহ্‌র সংশোধন উপলক্ষ্যে এবং বলা হয়েছে যে, জুহাইনাহ গোত্রের শাখা হুরাকাতকে শিক্ষা দানের জন্য এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের পশুগুলো নিয়ে আসা হয়। উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. এ অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে কালেমা পড়া সত্ত্বেও হত্যা করেছিলেন; পরে তিনি এ ব্যাপারটি রাসূল ﷺ কে জানানোর পর তাঁর কথা শুনে খুব আফসোস করেছিলেন। তিনি অবশ্য ভেবেছিলেন, সেই লোক বাঁচার জন্যই ঐ সময় কালেমা পড়ছিলো।

০৭. খায়বার অভিযানঃ সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসে ৩০ জন ঘোড়সওয়ারের সমন্বয়ে এ বাহিনী প্রেরণ করা হয়। আসীর অথবা বাশীর ইবনে যারাম মুসলিমদের বিরুদ্ধে গাত্বাফানদেরকে একত্রিত করছিলো। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছে আসীরকে খায়বারের গভর্নর বানানোর আশ্বাস দিয়ে রাসূলের নিকট নিয়ে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যে দু'দলের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি হলে তারা মুসলিমদের হাতে নিহত হয়।

০৮. ইয়ামান ও জাবার অভিযানঃ সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসে (এটি বনু গাত্বাফান বা বনু ফাযারা ও বনু উযরা এলাকার নাম) ৩০০ জন মুসলিম সৈন্যের একটি দলকে সেখানে প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিলো, মদীনায় আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হওয়া এক বিরাট বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করা। শত্রুরা মুসলিমদের সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে। তাদের দু'জন বন্দী হয় এবং অনেকগুলো গবাদিপশু করায়ত্ত হয়।

০৯. গাবাহ অভিযানঃ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এ অভিযানকে উমরায়ে কাযার পূর্বে সপ্তম হিজরীর অন্তর্ভুক্ত করেন। জুশাম ইবনে মুআবিয়া নামক

এক ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বনু কায়স গোত্রকে একত্রিত করছিলো। রাসূল ﷺ মাত্র ৩ জনকে এ অভিযানে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা গোত্রপ্রধানকে হত্যা করেছেন এবং তাদের বাহিনীর উপর এমনভাবে আক্রমণ করেন যে, তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মুসলিম বীরগণ অনেক উট, ভেড়া ও ছাগল খেদিয়ে নিয়ে আসেন।

শিক্ষাঃ

০১. জিহাদ নামক ইবাদাতই মুসলিমদের অর্থ সংকট দূর করে। মুসলিমদের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করে।

০২. মুসলিমগণ প্রশিক্ষিত থাকলে অল্প কয়েকজনই বহু সংখ্যক কাফেরদের জন্য যথেষ্ট।

কাযা উমরাহ

যখন যুল কা'দাহ মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছিলো রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরাম কে কাযা হিসেবে নিজ নিজ উমরাহ আদায় করতে বললেন। হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন না এমন বহিরাগত লোকসহ মোট দু'হাজার সাহাবী উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। মহিলা ও শিশুরা এ সংখ্যার বাহিরে।

রাসূল ﷺ ৬০ টি উট নিয়েছিলেন কোরবানীর উদ্দেশ্যে। যুল হুলাইফাতে তিনি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন ও লাব্বাইক ধ্বনি উঁচু করে পড়তে থাকলেন। মুশরিকদের ওয়াদা ভঙ্গের আশঙ্কায় যুদ্ধে পারদর্শী এমন লোকদেরকে সঙ্গে নেওয়া হয় এবং অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখা হয়। ইয়াজুজ নামক উপত্যকায় পৌঁছার পর সেখানে আওস ইবনে খাওলী রাযি. এর নেতৃত্বে ২০০ জন লোক নিযুক্ত করে সেগুলো রেখে যাওয়া হলো। তারপর তাঁরা খাপেভরা তরবারি নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।[২৯৩] প্রবেশের সময় রাসূল ﷺ কাসওয়া নামক উটের উপর আরোহী ছিলেন। সাহাবাগণ তাঁকে সকলের মধ্যস্থলে রেখে লাব্বাইক ধ্বনি বলছিলেন।

২৯৩. যাদুল মাআদঃ ২/১৫১

মুশরিকরা এ অগ্রাভিযানকে একটি তামাশা সুলভ ব্যাপার মনে করে তা দেখার জন্য কা'বা ঘরের উত্তর দিকে অবস্থিত কুআইকিআন নামক পাহাড়ের উপর গিয়ে বসেছিলো। তারা বলাবলি করছিলো, তোমাদের সামনে এমন এক জাতি আসছে ইয়াসরিবের জ্বর যাদেরকে আক্রান্ত করে একদম দুর্বল করে দিয়েছে। এ কারণে রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে প্রথম তিনটি চক্কর বীরের মতে দ্রুত হাঁটতে আদেশ করলেন। যেন তারা রাসূল ﷺ এর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে পারে।[২৯৪] তাছাড়া রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে ইযতিবা' করতে বললেন। ইযতিবা' মানে হলো, ডান কাঁধ খোলা রেখে ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদর নিয়ে বাম কাঁধের উপর বাঁধা।

রাসূল ﷺ হারামে প্রবেশ করে তার লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। কা'বা ঘরের তাওয়াফ করলেন। মুসলিমগণও তার সাথে তাওয়াফ করলেন। সে সময় আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. যুদ্ধকবিতা আবৃত্তি করছিলেন। উমর রাযি. তা শুনে তাঁকে বললেন, হে রাওয়াহার পুত্র! আপনি রাসূল ﷺ এর সামনে ও আল্লাহর ঘরে কবিতা আবৃত্তি করছেন? রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: হে উমর! তাঁকে আবৃত্তি করতে দাও। কারণ, এটা ওদের (কাফেরদের) জন্য বর্শার আঘাত হতেও অধিক তীক্ষ্ণ হবে।

রাসূল ﷺ ও সাহাবাগণ তিন চক্কর শেষ করলে, মুশরিকরা তাঁদেরকে বীরের মতো দ্রুত হাঁটতে দেখে বলছিলো, তোমরা যে ধারণা করেছো– এ সকল লোকজন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে; তা তো সঠিক নয়।[২৯৫] বরং এরা সাধারণ লোকজন থেকেও অধিক শক্তিশালী।

এরপর রাসূল ﷺ সাফা-মারওয়া সায়ী করলেন। রাসূল ﷺ মারওয়ার নিকট পশুগুলি কোরবানী করলেন। তারপর মাথা মুণ্ডন করেলেন। সাহাবাগণও তাঁর অনুসরণ করলেন। তারপর কিছু সংখ্যক সাহাবাকে ইয়াজুজ উপত্যকায় পাঠিয়ে দিলেন। যেন তারা সেখানে দেখাশোনা করতে পারেন। আর সেখানে থাকা সাহাবাগণ উমরাহ পালন করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় তিন দিন ছিলেন। এরপর মক্কা থেকে বেরিয়ে সারিফ

---

২৯৪. সহীহ বুখারী: ১/১১৮; ২/৬১০-৬১১ পৃ.; সহীহ মুসলিম: ১/৪১২
২৯৫. সহীহ মুসলিম: ১/৪১২

নামক স্থানে অবস্থান করলেন। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় হামযা রাযি. এর কন্যা রাসূল ﷺ এর পেছন পেছন "চাচা, চাচা" ডাকতে ডাকতে ছুটে এলেন। আলী রাযি. তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। আলী, জাফর, যায়েদ রাযি. তাঁর লালনপালনের দায়িত্ব নেবেন বলে নিজেদেরকে তাঁর অধিক হক্বদার প্রমাণ করছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে জাফর রাযি. এর অনুকূলে মীমাংসা করলেন। কারণ, জাফর রাযি. এর স্ত্রী ছিলেন সে মেয়েটির খালা।

শিক্ষাঃ

০১. তাগুতগোষ্ঠী সর্বদা মুমিনদেরকে শক্তিহীন দুর্বল বলে প্রচার করে। কারণ, মুমিনদের শক্তির কথা সাধারণ মানুষ জেনে গেলে তাদের পক্ষ থেকে সরে পড়বে।

০২. মুসলিমদের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

মায়মুনাহ রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ

এ উমরাহ পালনকালে রাসূল ﷺ মায়মুনাহ বিনতে হারিস আমিরিয়াহ রাযি. কে বিবাহ করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাসূল ﷺ জাফর রাযি. কে মক্কা আসার পূর্বেই মায়মুনাহ রাযি. এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর সমস্ত দায়িত্ব আব্বাস রাযি. এর উপর ন্যস্ত করেন। কারণ, মায়মুনাহ রাযি. ছিলেন আব্বাস রাযি. এর স্ত্রী উম্মুল ফযলের বোন। যখন রাসূল ﷺ সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তাঁর কাছে তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয়।[২৯৬]

মুতা'র যুদ্ধ

মুতা হচ্ছে বায়তুল মাকদিস থেকে দু'মনজিল দূরে জর্দান অঞ্চলে বালকা নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। এ যুদ্ধ খ্রিস্টান দেশসমূহ বিজয়ের পূর্বসূত্র। অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ সনের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

---

২৯৬. যাদুল মাআদঃ ২/১৫২

যুদ্ধের কারণ

এ যুদ্ধের কারণ ছিলো রাসূল ﷺ বুসরা শহরের শাসকের নিকট পত্র দিয়ে হারিস ইবনে উমায়ের আযদী রাযি. কে প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমান সম্রাটের বালকার গর্ভনর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী তাঁকে বন্দী করে এবং শক্ত করে বেঁধে হত্যা করে। দূত হত্যা যুদ্ধ ঘোষণার চেয়েও জঘন্য। রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে ৩০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। যা এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ইসলামী সৈন্যবহর।[২৯৭]

রাসূল ﷺ কর্তৃক আমীর ঘোষণা

এ যুদ্ধে রাসূল ﷺ যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. কে সেনাপতি ঘোষণা করে বলেন, যদি তাঁকে শহীদ করে দেওয়া হয়; তবে জাফর রাযি. এবং তাঁকে শহীদ করা হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সেনাপতি হবেন।[২৯৮] তারপর তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে জায়গায় হারিস রাযি. কে শহীদ করা হয়েছে, তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেবে। তারা গ্রহণ না করলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। সাবধান! অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। আমানতের খিয়ানত করো না, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ এবং গীর্জায় অবস্থানরত পুরোহিতদেরকে হত্যা করবে না। খেজুর বা কোনো বৃক্ষ কাটবে না এবং বাড়ি, ঘর, দালানকোঠা নষ্ট করবে না।[২৯৯] এরপর রাসূল ﷺ তাঁদেরকে সানায়াতুল অদা নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে বিদায় দেন।[৩০০]

শিক্ষা:

০১. জিহাদ ও দাওয়াত পরস্পর বিপরীত বা সাংঘর্ষিক নয়। বরং যুদ্ধ হচ্ছে দাওয়াতের অন্যতম একটি মাধ্যম। তাই যুদ্ধ ও দাওয়াতকে বিপরীত করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

০২. অন্যায়ভাবে নারী-শিশু হত্যা কিংবা বিধর্মীদের উপসনালয়ে আঘাত করা ইসলামে বৈধ নয়।

----

২৯৭. যাদুল মাআদ: ২/১৫৫; ফাতহুল বারী: ৭/৫১১
২৯৮. সহীহ বুখারী: ২/৬১১
২৯৯. মুখতাসারুস সীরাহ: ৩২৭; রহমাতুল্লিল আলামীন: ২/২৭১
৩০০. ইবনে হিশাম: ২/৩৭৩-৩৭৪ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/১৫৬; মুখতাসারুস সীরাহ: ৩২৭

পরবর্তী পরিস্থিতি

মুসলিম সেনাদল উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মাআন নামক স্থানে পৌঁছেন। মুসলিম গোয়েন্দা জানান, রোমান সম্রাট হিরাকল বালকার মাআবে এক লক্ষ রোমান সৈনিক জমা করেছে। তার সাথে আছে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে সংগৃহীত আরও এক লক্ষ সৈন্য।

পরামর্শ

মুসলিমদের সামনে এরকম বিশাল অঙ্কের এক যুদ্ধপ্রিয় সেনাসমুদ্র। তার সামনে মাত্র ৩০০০ সৈন্য। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. পরামর্শে বসলে দু'টি পরিস্থিতি তাঁদের সামনে আসে, এক. তাঁরা সামনে অগ্রসর হবেন। দুই. তাঁরা রাসূল ﷺ এর কাছে পত্র প্রেরণ করে পরিস্থিতি জানিয়ে সাহায্য চাইবেন এবং করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা চাইবেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. প্রথম মতের উপর অটল থেকে বলেন, আমরা যে জিনিসের খোঁজে এসেছি তা হলো শাহাদাত। শত্রুর সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা সৈন্য সংখ্যা, শক্তি কিংবা সমরাস্ত্রের ভিত্তিতে নয়। বরং তাদের সাথে যুদ্ধ করে যেতে হবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য। যার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাই চলুন, আমরা অগ্রসর হই। আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করতে গিয়ে আমাদের জন্য রয়েছে দু'টি কল্যাণ। হয় আমরা বিজয় হবো, না হয় আমরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবো। অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর কথার উপর সিদ্ধান্ত হয়।[৩০১]

শিক্ষা:

০১. প্রকৃত ঈমানদার সর্বদা শাহাদাতের তামান্না করে। কারণ, ঈমানের চাহিদাই হলো শাহাদাত। আর জয়-পরাজয় সে তো আল্লাহর হাতে।

০২. মুসলিমগণ কখনো সৈন্য সংখ্যার বলে জিহাদ করে না। বরং তারা ঈমানী তেজের বলেই জিহাদ করে। তাই ইসলামের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর সৈন্যসমুদ্র একত্রিত হলেও মুসলিমদের ভয় পাওয়া উচিত নয়।

---

৩০১. ইবনে হিশাম: ৪/২৪

মাআনে তাঁরা দু'রাত কাটিয়ে দেন। বালকার শারিফ নামক স্থানে হিরাকলের সৈন্যদের সম্মুখীন হোন মুসলিম বাহিনী। এরপর শত্রুরা আরও নিকটবর্তী হলে তাঁরা মুতা নামক স্থানে একত্রিত হয়ে সৈন্যদের শৃঙ্খলা বিন্যাস করেন। ডান বাহুতে কুতবাহ ইবনে কাতাদাহ উযরী রাযি. এবং বাম বাহুতে উবাদাহ ইবনে মালিক আনসারী রাযি. কে নিযুক্ত করা হয়।

যুদ্ধ অবস্থা

একপক্ষে অস্ত্রেশস্ত্রে সমৃদ্ধ দু'লক্ষ সৈন্যের সেনাসমুদ্র। আর অপরপক্ষে সাধারণ অস্ত্রে সজ্জিত তিন হাজার মুসলিম সৈন্য। এক অকল্পনীয় অসম যুদ্ধ। রাসূল ﷺ এর পরম প্রিয় পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. পতাকা উঠিয়ে নিলেন। নজীরবিহীনভাবে তিনি যুদ্ধ করতে থাকলেন। ইসলামী বাহিনী ছাড়া যার নজির পাওয়া অসম্ভব। এক সময় তিনি শত্রুপক্ষের বর্শাঘাতে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

এরপর জাফর রাযি. পতাকা উঠিয়ে নিলেন। পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। যুদ্ধ চলছে, এমনই মুহূর্তে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন ও ঘোড়ার পা কেটে দেন। আঘাতের পর আঘাত হেনে শত্রুকে প্রতিহত করতে থাকেন। একপর্যায়ে শত্রুর আঘাতে তাঁর ডান হাত কেটে যায়। তিনি বাম হাতে পতাকা নিলেন। এক সময় বাম হাতও কর্তিত হলো। অতঃপর তিনি দু'হাতের অবশিষ্টাংশ দিয়ে বুকের সঙ্গে পতাকা জড়িয়ে ধরলেন। ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পতাকাকে উড্ডীন রাখলেন, যে পর্যন্ত না তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শাহাদাতের সম্মানে ভূষিত হলেন।

অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. পতাকা উঠিয়ে নিলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠে উঠে সম্মুখ অগ্রসর হয়ে লড়াইয়ে রত হোন। এমন সময় তাঁর চাচাতো ভাই একটি গোশতযুক্ত হাড় নিয়ে আসলেন আর বললেন, এটি খেয়ে তোমার কোমর শক্ত করে নাও; কারণ আজ তোমাকে অনেক খাটতে হবে। তিনি হাড়টি নিয়ে একবার কামড় দিলেন, তারপর তা ফেলে দিলেন। তরবারি ধারণ করে সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন আর যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত লাভে ধন্য হলেন।

শিক্ষাঃ

০১. আমরা নিজেদের ও আমাদের প্রজন্মকে এমনই ঈমানের শিক্ষা দিতে হবে; যেন তারা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ন্যায় দ্বীনের জন্য কোরবানী ও শাহাদাতের নেশায় মরিয়া হয়ে উঠে।

০২. প্রাণ বিলিয়ে হলেও দ্বীনের ঝাণ্ডা উড্ডীয়মান রাখা ঈমানের দাবি।

আল্লাহর তরবারীর হাতে ঝাণ্ডা

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর শাহাদাতের পর বনু আজলান গোত্রের সাবিত ইবনে আকরাম রাযি. লাফ দিয়ে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরে বললেন, আমাদের মধ্য হতে একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করুন। অন্যরা বললেন, আপনি এ দায়িত্ব নিন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, এ দায়িত্ব আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. কে সেনাপতি নির্বাচন করা হলো। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন বীর বিক্রমে। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, মুতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছিলো। হাতে অবশিষ্ট ছিলো ইয়ামানের তৈরি একটি ছোট তরবারি।[৩০২]

এদিকে রাসূল ﷺ ময়দানের কোনো খবর না পেয়ে চিন্তিত ছিলেন। এমন সময় ওহীর মাধ্যমে তিনি ময়দানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন। তিনি তা বর্ণনা করছিলেন, পতাকা হাতে যায়েদ যুদ্ধ করছে, সে শহীদ হয়ে গেলো। এবার জাফর পতাকা হাতে নিলো, তারপর সেও শহীদ হয়ে গেলো। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা হাতে নিলো; সেও শহীদ হয়ে গেলো। অতঃপর পতাকা হাতে নিলেন আল্লাহর তরবারির মধ্য থেকে একটি তরবারি। এমনকি আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে বিজয়ী করলেন।[৩০৩]

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়, কাফেরদের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় মাত্র তিন হাজারের একটি বাহিনী এতক্ষণ সময় ধরে পর্বতের ন্যায় অটল ছিলো।

---

৩০২. সহীহ বুখারী: ২/৬১১
৩০৩. প্রাগুক্ত

তারপর আরও আশ্চর্যের বিষয়, কী কৌশলেই না খালিদ রাযি. কাফেরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে মুসলিমদেরকে সম্মানের সাথে সেখান থেকে নিয়ে আসেন।

মুসলিমদের সৈন্যবাহিনী ছিলো স্বল্প। এটি ছিলো অকল্পনীয় অসম শক্তির লড়াই। তাই মুসলিমদের ফিরে যাওয়া ছিলো অনিবার্য। খালিদ রাযি. একটি অপূর্ব রণকৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সম্মুখ ভাগের দলকে পেছনে, পেছনের লোকদেরকে সামনে, ডান পাশের লোকদেরকে বামে, বাম পাশের লোকদেরকে ডানে নিয়ে আসলেন। পরিবর্তিত বিন্যাস দেখে শত্রুরা ধারণা করলো, নিশ্চয়ই মুসলিমগণ নতুন করে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই তাদের মাঝে ভীতির উদ্রেক হয়। এরপর উভয় পক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। খালিদ রাযি. ধীরে ধীরে মুসলিমদেরকে পেছনে সরিয়ে আনতে লাগলেন। কিন্তু রোমান সৈন্যবাহিনী ভাবলো, তারা তাঁদের পিছু পিছু গমন করলে তাদেরকে মরুভূমিতে নিয়ে বিপদে ফেলতে পারে; তাই তারা মুসলিম বাহিনীর পিছু আসার পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এদিকে মুসলিম বাহিনী মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলো।[৩০৪]

শিক্ষা:

০১. কুফর-শিরককে নিশ্চিহ্ন করার প্রবল আগ্রহে মুমিনের ঈমানী শক্তি তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে টিকিয়ে রাখে।

০২. লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মোকাবেলায় যখন স্বল্প সংখ্যক মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করে জিহাদ শুরু করে দেয়। তখন তাঁদের ঈমানী শক্তি কোটি কোটি গুণ মজবুত হয়ে যায়। যার সামনে লক্ষ লক্ষ সৈন্য কিছু মৃত প্রাণী বৈ কিছু নয়। তাই যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ঈমানকে মজবুত করা আবশ্যক।

০৩. পরিস্থিতি অনুযায়ী যুদ্ধের ময়দানে এমনভাবে সেনা বিন্যাস করতে হবে; যেন শত্রুদের মাঝে ভীতির সঞ্চার হয়।

---

৩০৪. ফাতহুল বারী: ৫১৩-৫১৪ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/১৫৬

০৪. মুমিন যুদ্ধের ময়দান থেকে ভয়ের কারণে পেছনে সরে যায় না। বরং যুদ্ধ কৌশলের জন্যই তা করে থাকে; কেননা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা মহাপাপ।

শহীদ ও নিহতের সংখ্যা

এ যুদ্ধে মুসলিমদের মোট ১২ জন শহীদ হোন। কতজন রোমীয় নিহত হয়, তার কোনো নির্দিষ্ট অঙ্ক সম্পর্কে জানা যায়নি; তবে তা যে বহু সংখ্যক– এটা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ খালিদ রাযি. একাই নয়টি তলোয়ার ভেঙেছিলেন; তাহলে তাদের নিহত ও আহতের সংখ্যা অনেক বেশিই হবে নিশ্চয়।

যুদ্ধের ফলাফল

এর দ্বারা বিশ্বের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মুসলিমগণ এক অকুতোভয় জাতি। তারা কোনো পার্থিব শক্তির সামনে মাথা নত করে না। চাই তাদের শত্রুপক্ষ যত বিশাল সংখ্যকই হোক বা যত শক্তিশালীই হোক। এদিকে শত্রুতা পোষণ করে, এরকম আরবরা ধারণা করেছিলো, মুসলিমদের একজনও ফিরে আসতে পারবে না আর এটি তাদের জন্য আত্মহত্যা করার মতো হবে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী যেভাবে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে দু'লক্ষ সেনার সাথে লড়াই করলো আর তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে মদীনায় প্রায় অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলো; তা বিশ্ববাসীর কাছে একটি অকল্পনীয় ও অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিলো। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আরব বিশ্বের অন্যদের থেকে মুসলিম জাতি আলাদা ও অনন্য সাধারণ একটি উম্মাহ। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ও ওয়াদাপ্রাপ্ত।

এমন প্রেক্ষাপটে আরবের যে সকল গোত্র মুসলিমদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করতো, তারা এ যুদ্ধের পর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বনু সুলাইম, আশজা', গাত্বাফান, যুবইয়ান, ফাযারা প্রমুখ গোত্র। এ যুদ্ধের দ্বারা মুসলমানদের সাথে রোমকদের লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। এরপর মুসলিম বাহিনী রোমানদের উপর হামলা করে একের পর এক রাজ্য দখল করতে থাকেন।

শিক্ষা:

০১. মুসলিম কখনো শত্রুর সামনে মাথা নত করে না। সে যত বড় শক্তিধরই হোক না কেন।

০২. মুসলিমদের অসাধারণ বীরত্ব আর কৌশল শত্রুদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।

যাতুস সালাসিল অভিযান

মুতার যুদ্ধে রোমানদের পক্ষে শামবাসী আরবদের এক বিশাল অংশ যোগ দেয়। তাই রাসূল ﷺ তাদের মাঝে ও রোমানদের মাঝে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তারা যেন পরবর্তীতে রোমানদের সাথে যোগ না দেয়, সে ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে আমর ইবনুল আস রাযি. এর নেতৃত্বে অষ্টম হিজরী সনের জুমাদাল উখরা ৩০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এছাড়াও বলা হয় যে, মুসলিম গোয়েন্দাগণ সংবাদ দিয়েছেন, বনু কুযাআহ মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেনা সংগ্রহ করছে। তাই বলা যায়, এ দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অভিযানটি পরিচালিত হয়।

মুসলিম বাহিনী রাতের সময় সামনে অগ্রসর হতো আর দিনের সময় আত্মগোপনে থাকতো। শত্রুপক্ষের কাছাকাছি যাওয়ার পর জানা গেলো, তাদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। তাই আমর রাযি. সাহায্য পাঠানোর অনুরোধসহ রাফি' ইবনে মাকীস জুহানী রাযি. কে রাসূল ﷺ এর কাছে প্রেরণ করেন। রাসূল ﷺ আবু উবায়দা রাযি. এর নেতৃত্বে ২০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁকে আমর রাযি. এর সাথে মিলেমিশে কাজ করার উপদেশ দেন। এ বাহিনীতে বড় বড় মুহাজির সাহাবী ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ ছিলেন।

সাহায্য আসার পর কুযাআহ'র অঞ্চল পদানত করা হলো। তারপর তাঁরা দূর-দূরান্তের সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁরা একটি বাহিনীর সম্মুখীন হোন; তবে শত্রুরা আক্রমণের মুখে বিক্ষিপ্ত হয়ে এদিক সেদিক পলায়ন করে।[৩০৫]

---

৩০৫. ইবনে হিশাম: ২/৬২৩-৬২৬ পৃ.; যাদুল মাআদ: ২/১৫৭

শিক্ষাঃ

০১. যুদ্ধ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা প্রেরণ অত্যন্ত জরুরী।

০২. যুদ্ধের সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলতে হয়।

০৩. অবস্থা অনুযায়ী চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

খাযিরাহ অভিযান

নাজদের অন্তর্ভুক্ত মুহারিব গোত্রের অঞ্চলে খাযিরাহ নামক জায়গায় বনু গাত্বাফান সৈন্য একত্রিত করছিলো। অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে আবু কাতাদাহ রাযি. এর নেতৃত্বে ১৫ জন মুজাহিদ তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। একাধিক শত্রুকে হত্যা করা হয় ও বন্দী করা হয়। পনেরো দিন বাহিরে অবস্থান করে এ বাহিনী গনীমতসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৩০৬]

মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী রাসূল ﷺ এর আশ্রয়ে বনু খুযাআ ও কুরাইশদের আশ্রয়ে বনু বকর প্রবেশ করে। বনু বকর ও বনু খুযাআর সাথে জাহেলী যুগ থেকেই বিরোধ চলে আসছে। কুরাইশদের মিত্রতা পেয়ে বনু বকর নিজেদেরকে শক্তিশালী মনে করতে থাকে। তারা এবার পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। তারা এ সময়কে এর জন্য দারুণ সুযোগ মনে করে।

এ ধারণার উপর ভিত্তি করে নাওফাল ইবনে মুআবিয়া দীলী অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে বনু বকরের একটি বাহিনী নিয়ে রাতের আঁধারে বনু খুযাআহকে আক্রমণ করে। এ আক্রমণে খুযাআহ গোত্রের অনেকে নিহত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশরা বনু বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে; এমনকি সশরীরে রাতের আঁধারে অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে তাদের অবস্থান স্থল থেকে খেদিয়ে হারামে আনা হয়। হারামে প্রবেশ করে লোকেরা তাদেরকে হত্যা করতে ইতস্তত করলে, নাওফাল তাদেরকে হারামেই হত্যা করতে লোকদের উৎসাহিত করে।

---

৩০৬. তালকীহুল ফুহুমঃ ৩৩; রহমাতুল্লিল আলামীনঃ ২/২৩৩

এদিকে খুযাআহ গোত্র মক্কায় পৌঁছে বুদাইল ইবনে ওয়ার্‌ক্বা ও নিজেদের মুক্ত করা দাস রাফি'র ঘরে আশ্রয় নেয়। তারপর সেখান থেকে আমর ইবনে সালিম খুযায়ী তৎক্ষণাৎ মদীনায় রওয়ানা হয়। মদীনায় পৌঁছে তিনি রাসূল ﷺ এর খেদমতে এসে কবিতার মাধ্যমে বনু বকরের আক্রমণ ও কুরাইশদের সাহায্য করা সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, তারা আমাদেরকে রুকু-সিজদা অবস্থায় হত্যা করছে; অথচ আমরা মুসলিম।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাকে সাহায্য করা হলো। তারপর আকাশে একটি মেঘ দেখা গেলো। তিনি বললেন, এ মেঘ বনু কা'বের সাহায্যের শুভ সংবাদ নিয়ে চমকাচ্ছে।[৩০৭]

এরপর বুদাইল ইবনে ওয়ার্‌ক্বা খুযায়ীর নেতৃত্বে একটি দল মদীনায় আগমন করে এবং রাসূল ﷺ কে জানান যে, কে নিহত হয়েছে আর কীভাবে কুরাইশরা বনু বকরকে সাহায্য করেছে? এরপর তিনি মক্কায় ফিরে গেলেন।

শিক্ষা:

> সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করা জঘন্য অপরাধ; তাই মুমিনগণ কখনো তা ভঙ্গ করেন না।

নতুন করে সন্ধি করার জন্য আবু সুফইয়ানের আগমন

কুরাইশদের যখন বোধোদয় হলো, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা সত্যি সত্যিই নিজেদের জন্য অনেক বড় বিপদ ডেকে এনেছে। আর এর ফলাফলও ভয়াবহ হবে। তখন তারা পরামর্শ করে আবু সুফইয়ানকে মদীনায় পাঠালো পুনরায় সন্ধি করার জন্য।

আবু সুফইয়ান মদীনায় এসে তার মেয়ে উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবাহ রাযি. এর ঘরে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি রাসূল ﷺ এর বিছানায় বসার ইচ্ছা করলেন। উম্মে হাবীবাহ রাযি. রাসূল ﷺ এর বিছানা গুটিয়ে নিলেন। আবু সুফইয়ান এ দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে উম্মে হাবীবাহ রাযি.

---

৩০৭. সীরাতুন নবী- ইবনে কাসীর: ৩/৫২৬; আল-ইসাবাহ: ২/৫২৯

বললেন, আপনি নাপাক মুশরিক। তারপর আবু সুফইয়ান রাসূল ﷺ এর সাথে কথাবার্তা বললেন। কিন্তু রাসূল ﷺ কোনোই উত্তর দিলেন না। তখন তিনি একে একে আবু বকর রাযি., উমর রাযি. ও আলী রাযি. এর কাছে গেলেন। তাঁরা সকলেই তাকে নৈরাশ করলেন। শুধু আলী রাযি. তাকে একটি পরামর্শ দিলেন। লোকদের সামনে আশ্রয় ঘোষণা করতে। তিনি তাই করলেন। পরে মক্কায় গেলে লোকেরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি সব বলে এ আশ্রয় ঘোষণার কথাও বললেন। তখন তারা বললো, মূলত আলী রাযি. তোমার সাথে কেবল রহস্যই করেছে। আবু সুফইয়ান বললেন, এই ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিলো না।

গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি

ইমাম তাবারানী রহ. বর্ণনা করেন, অঙ্গীকার ভঙ্গের তিন দিন পূর্বেই সফরের প্রস্তুতি নিতে রাসূল ﷺ আয়েশা রাযি. কে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এ খবর কেউই জানতো না। আবু বকর রাযি. এ দেখে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন, তিনি জানেন না– এ কীসের প্রস্তুতি!

তৃতীয় দিন সকালে আমর ইবনে সালিম ৪০ জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে আসলেন ও আগের কবিতাটি পড়লেন। তখন সাধারণ লোকেরা জানতে পারলো যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়েছে। এরপর বুদাইল এলেন। তারপর এলেন আবু সুফইয়ান। এরপর লোকজন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। তারপর রাসূল ﷺ আদেশ দিলেন, মক্কা যেতে হবে। তার সাথে তিনি এ দুআ করলেন–

اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها

"হে আল্লাহ! গোয়েন্দাদের ও কুরাইশদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছতে বাধার সৃষ্টি করুন এবং থামিয়ে দিন; যাতে আমরা তাদের অজান্তেই একেবারে তাদের মাথার উপর গিয়ে পৌঁছতে পারি।"

রাসূল ﷺ সঙ্গোপনে মক্কায় পৌঁছার উদ্দেশ্যে অষ্টম হিজরীর রমজান মাসের প্রথম দিকে আবু কাতাদাহ রাযি. এর নেতৃত্বে ৮ জন মুজাহিদকে বাতনে ইজামের দিকে প্রেরণ করেন। এ স্থানটি মদীনা থেকে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে। উদ্দেশ্য ছিলো যেন মানুষ মনে করে রাসূল ﷺ এদিকে যাত্রা করবেন। এমনকি এ খবরই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। দলটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রাসূল ﷺ এর মক্কা অভিমুখে রওয়ানার কথা শুনে তাঁরাও সেদিকে রওয়ানা করেন এবং রাসূল ﷺ এর সাথে মিলিত হোন।[৩০৮]

হাতিব ইবনে আবী বালতাআহ রাযি. কুরাইশদের নিকট একটি পত্রে রাসূল ﷺ এর মক্কাভিযানের কথা লিখেন। রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ পেয়ে আলী রাযি., মিকদাদ রাযি., যুবায়ের রাযি. এবং আবু মারসাদ গানাভী রাযি. কে এ পত্রটি উদ্ধারের জন্য পাঠান। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা খাখ নামক উদ্যানে গিয়ে একটি হাওদানশীন মহিলাকে দেখতে পাবে। সে পত্রটি তার কাছ থেকে উদ্ধার করবে। তারা মহিলাটির নাগাল পেয়ে তার কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করে। কিন্তু আলী রাযি. বললেন, তুমি যদি এমনিতে দিয়ে দাও; তবে ভালো, না হলে তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী করা হবে। তখন মহিলাটি তাঁদের কথার দৃঢ়তা অনুভব করে চিঠিটি দিয়ে দেয়।

এদিকে হাতিব ইবনে আবী বালতাআহ রাযি. কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। মক্কায় আমার সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গ আছে তাদের নিরাপত্তার জন্য আমি এরূপ করেছি। অন্য সকলের তো কোনো না কোনো আত্মীয় আছে, সেখানে আমার কেউ নেই।

উমর রাযি. তখন তাঁকে হত্যা করার জন্য অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ বললেন, তাঁকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি জানো না? সে বদরে অংশগ্রহণ করেছে। উমর রাযি. অশ্রুসজল চোখে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (ﷺ) ভালো জানেন।[৩০৯] এভাবে আল্লাহ তাআলা গোয়েন্দাদের থেকেও তথ্য প্রকাশ হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

---

৩০৮. যাদুল মাআদ: ২/১৫০; ইবনে হিশাম: ২/৬২২, ৬২৭, ৬২৮ পৃ.
৩০৯. সহীহ বুখারী: ১/৪২২; ২/৬১২

শিক্ষাঃ

০১. যুদ্ধের কলা-কৌশল, গোপন তথ্য কারো নিকট বলা যাবে না। এমনকি বিশ্বস্ত জীবন সঙ্গিনীর কাছেও নয়।

০২. শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। যেন তাদেরকে পরাভূত করা যায়।

০৩. শত্রুর মনকে অপরদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যুদ্ধের অন্যতম কৌশল।

মুসলিম বাহিনী মক্কার পথে

অষ্টম হিজরীর ১০ই রমজান রাসূল ﷺ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন, সাথে দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর এক বিশাল বাহিনী। জুহফাহ কিংবা তার আগেই আব্বাস রাযি. রাসূল ﷺ এর সাথে সপরিবারে সাক্ষাত করেন। তিনি সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করছিলেন তখন। আবওয়া নামক স্থানে রাসূল ﷺ এর চাচাতো ভাই আবু সুফইয়ান ইবনে হারিস ও ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার সাথে দেখা হয়। তাঁরা দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩১০]

মাররুয যাহরানে ইসলামী সৈন্য

মাররুয যাহ্‌রানের ফাতিমা উপত্যকায় ইসলামী বাহিনী অবতরণ করলো। এটি মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান। রাসূল ﷺ এর নির্দেশে দশ হাজার লোকের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আগুন জ্বালালো। উদ্দেশ্য ছিলো, কুরাইশ এবং তাদের মিত্র শক্তির অন্তরে ভয় সৃষ্টি করা।

আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ এর দুআ কবুল করে তাঁদের সংবাদ কুরাইশদের পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি। তবে কিছু কুরাইশ নেতা কোনো সেনাবাহিনীর খবর অনুমান করে। সেই রাতে আবু সুফইয়ান, হাকীম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওয়ারক্বা মক্কা থেকে এ কারণে বের হয়। এবং তারা এমন একটি

৩১০. যাদুল মাআদঃ ২/১৬২-১৬৩ পৃ.

সৈন্যদলের আলোচনা করছিলো; যারা মাররুয যাহরানে অবস্থানরত এবং সেখানে অনেক বেশি আগুন জ্বলছে। তাঁরা কারা?

শিক্ষা:

পরিস্থিতির আলোকে পদক্ষেপ নিয়ে শত্রুকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও হতাশা-নিরাশার মাঝে ফেলে রাখতে হবে। যেন মুসলিমদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে তারা নির্দিষ্ট কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে না পারে। আর তারা যখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে, তখন আর মোকাবেলা করার সাহস পাবে না।

রাসূল ﷺ এর কাছে আবু সুফইয়ানের উপস্থিতি

সে সময় আব্বাস রাযি. রাসূল ﷺ এর সাদা খচ্চর নিয়ে বের হলেন। উদ্দেশ্য এমন লোককে খুঁজে বের করা, যাকে দিয়ে কুরাইশদের কাছে সংবাদ পাঠানো যায় যে, যেন তারা রাসূল ﷺ এর মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

পথে তিনি আবু সুফইয়ান ও তার দু'সাথীর কথোপকথন শুনতে পান। আব্বাস রাযি. ও আবু সুফইয়ান পরস্পরকে চিনতে পারেন। আব্বাস রাযি. তাকে রাসূল ﷺ এর সসৈন্যে আগমনের কথা জানান। তারপর তাকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে নেন। যখন তারা উনুনগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেখানকার লোকজন পরিচয় জিজ্ঞেস করছিলেন এবং তাঁরা রাসূল ﷺ এর খচ্চর দেখে বলতে লাগলেন, রাসূল ﷺ এর চাচা ও তাঁর খচ্চর। এভাবে যখন উমর রাযি. এর উনুনের পাশ দিয়ে তারা গমন করছিলেন। উমর রাযি. আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন যে, কোনো প্রকার কৌশল ব্যতীত শত্রুকে হাতের নাগালে পাওয়া গেলো। তারপর তিনি সেখান থেকে রাসূল ﷺ এর কাছে যেতে লাগলেন। আব্বাস রাযি. খচ্চরকে দ্রুত হাঁকিয়ে উমর রাযি. এর আগেই উপস্থিত হলেন।

ইতোমধ্যে উমর রাযি. সেখানে পৌঁছে আবু সুফইয়ানের গর্দান কাটার অনুমতি চাইলে আব্বাস রাযি. বললেন, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। কিছুক্ষণ পর রাসূল ﷺ কথা বললেন, এ ফাঁকে তাঁদের মাঝে কথাবার্তা চলছিলো। তিনি বললেন, (চাচা) আব্বাস একে (আবু সুফইয়ান) নিজ তাঁবুতে নিয়ে যান। কাল সকালে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। সকাল বেলা তাকে রাসূল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আবু সুফইয়ান! আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এ মহাসত্য উপলব্ধি করার এখনো তোমার সময় হয়নি? উত্তরে আবু সুফইয়ান বললো, যদি অন্য কোনো উপাস্য থাকতো, এত দিনে আমার কাজে আসতো। রাসূল ﷺ বললেন, এখনো কি তুমি উপলব্ধি করতে পারোনি যে, আমি আল্লাহর রাসূল? উত্তরে তিনি বললেন, এ বিষয়ে এখনো কিছুটা সন্দেহ আছে। আব্বাস রাযি. তখন বললেন, ওহে! গলা কাটা যাওয়ার আগেই ইসলাম কবুল করে নাও। তারপর আবু সুফইয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন। আব্বাস রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি সম্মানিত হতে ভালোবাসেন। তাকে সম্মান প্রদান করুন। রাসূল ﷺ বললেন, যে আবু সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরে থাকবে, সে নিরাপদ। যে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।

শিক্ষা:

ক্ষমা করে দিলে যদি শত্রুর অন্তরের ব্যাধি দূর হয়ে ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে; তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

মক্কার দিকে যাত্রা

অষ্টম হিজরীর ১৭ই রমজান রাসূল ﷺ মাররুয যাহরান থেকে মক্কার দিকে রওয়ান করলেন। তিনি আব্বাস রাযি. কে নির্দেশ দিলেন, আবু সুফইয়ান রাযি. কে মক্কা প্রবেশের সময় ইসলামী বাহিনীর অবস্থা দেখাতে; যেন তাঁর মনে ঈমান দৃঢ় হয়। তিনি একে একে এক একটি গোত্রের সেনাদের দেখলেন, তখন তিনি বলছিলেন, তাঁদের সাথে আমার সম্পর্ক কী? তারপর এক সময় রাসূল ﷺ জাঁকজমক অবস্থার মধ্য দিয়ে মুহাজির ও আনসারদের বেষ্টনীর মাঝে থেকে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তখন আবু সুফইয়ান বললেন,

আব্বাস! তোমার ভাতিজাকে আল্লাহ তাআলা অনেক শক্তিশালী রাজত্ব দিলেন। আব্বাস রাযি. উত্তর দিলেন, এটি নবুওয়াতী সম্মান।[৩১১]

সে সময় আনসারদের পতাকা বাহক সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি. আবু সুফইয়ান রাযি. এর নিকট দিয়ে যেতে যেতে বললেন, আজ রক্তক্ষরণের দিন। আজ হারাম কে হালাল করার দিন। আবু সুফইয়ান রাযি. এটি রাসূল ﷺ কে জানালেন। উসমান রাযি. এবং আব্দুর রহমান রাযি.ও তাঁর মতো রাসূল ﷺ এর কাছে সংবাদ দিলেন। রাসূল ﷺ তখন বললেন, না। আজ হারামের যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শিত হবে। আজকের দিন কুরাইশরা যথাযথ ইজ্জত পাবে। এরপর তিনি পতাকা নিয়ে সা'দ রাযি. এর ছেলে কায়স রাযি. এর হাতে দিলেন। পতাকা তাঁর হাতেই আছে, তা বুঝানো উদ্দেশ্য।

কুরাইশদের মাথার উপর মুসলিম সৈন্যদল

রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে আবু সুফইয়ান চলে গেলে আব্বাস রাযি. তাকে বললেন, শীঘ্রই কুরাইশদেরকে গিয়ে সতর্ক করো। তিনি কুরাইশদের নিকট গিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই; তা জানিয়ে নিরাপদ থাকার মূলনীতিগুলো বললেন।[৩১২] এরপরও একটি দল মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটলো। তারা একটি লম্পট নির্বোধ দলকে নিযুক্ত করলো, মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। যদি তারা কোনো সুবিধা করতে পারে; তবে তারাও এসে তাদের সাথে যোগ দেবে বলে আশ্বাস দেয়।[৩১৩] এদের মধ্যে ছিলো ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ও সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে খান্দামায় একত্রিত হওয়া একটি দল।

শিক্ষা:

> কাফেররা সুযোগ পেলেই মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। তাই মুমিনদেরকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

----

৩১১. সহীহ বুখারী: ৪/১৫৫৯
৩১২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৬/১৬৪-১৬৭ পৃ.
৩১৩. সহীহ মুসলিম: ৩/১৪০৫ (১৭৮০ নং হাদীস)

মুসলিম সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ

রাসূল ﷺ যু-তুওয়া নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, সে সময় তিনি বিজয়ের শুকরিয়াস্বরূপ তাঁর মাথা নিচু করে রেখেছিলেন। এমনকি তখন তাঁর দাড়ি সওয়ারির খড়ির সাথে লাগছিলো। রাসূল ﷺ এ সময় মুসলিম সৈন্যদের বিন্যস্ত করেন। ডান পাশে নিযুক্ত করলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. কে। তাঁকে আদেশ দিলেন নিচু অঞ্চল দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে। যদি কুরাইশরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাদের সকলকে হত্যা করে দেবে। তারপর সাফা পাহাড়ের উপর তাঁর সাথে সাক্ষাত করার আদেশ দিলেন। যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. কে বাম পাশের নেতৃত্বে দিলেন। তাঁর সাথে রাসূল ﷺ এর পতাকা ছিলো। তাঁকে আদেশ দিলেন, মক্কার উপরিভাগ দিয়ে প্রবেশ করে হাজূনে গিয়ে পতাকা উত্তোলন করতে ও তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে। পদাতিক সেনাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদাহ রাযি.। তাঁকে আদেশ দিলেন বাতনে ওয়াদীর পথ ধরে এমনভাবে সামনে অগ্রসর হতে; যেন রাসূল ﷺ এর আগেই মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হোন।

মক্কায় প্রবেশ

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. এর সম্মুখে যে সকল মুশরিক প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, খান্দামায় পৌঁছলে তাদের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে তাদের ১২ জন নিহত হয়। এরপর তারা পলায়ন করে। অবশ্য এতে দু'জন মুসলিম শাহাদাত লাভ করেন। কারণ তাঁরা সেনা থেকে পৃথক হয়ে চলছিলেন। এরপর খালিদ রাযি. সাফা পাহাড়ের উপর রাসূল ﷺ এর সাথে একত্রিত হোন। যুবায়ের রাযি. আগেই এসে হাজূনে ফাতাহ মাসজিদের নিকট রাসূল ﷺ পতাকা উত্তোলন করেন ও তাঁর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করেন।

শিক্ষা:

> সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে যে কোনো সময় বিপদ আসতে পারে; তাই জামাআহ'র সাথে থাকা একান্ত কর্তব্য।

মাসজিদে হারামে প্রবেশ ও মূর্তি ভাঙন

মাসজিদুল হারামে আগমন করে রাসূল ﷺ হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করলেন। তারপর আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলেন। তখন রাসূল ﷺ এর হাতে একটি ধনুক ছিলো। মুশরিকরা কা'বা ঘরের আশপাশে ও ছাদের উপর যেসব মূর্তি স্থাপন করেছিলো। তিনি ধনুক দিয়ে সেগুলোকে আঘাত করে ভাঙছিলেন আর মুখে বলছিলেন–

﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

"হক্ব এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। আর বাতিল তো বিলুপ্ত হওয়ারই ছিলো।"[৩১৪]

﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾

"বলুন! সত্য সমাগত। নতুন করে মিথ্যার আবির্ভাব ঘটবে না। আর তা পুনরায় আসবেও না।"[৩১৫]

তাওয়াফ শেষ হলে তিনি উসমান ইবনে তালহা রাযি. কে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কা'বা ঘরের চাবি নিলেন এবং কা'বা ঘর খোলা হলো। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলে ভেতরের ছবিগুলো তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। সেখানে ইবরাহীম আ. ও ইসমাইল আ. এরও প্রতিকৃতি ছিলো। কা'বা ঘরে একটি কাঠের তৈরি কবুতরির মূর্তি ছিলো। তিনি তা ভেঙে ফেলেন। অন্য সকল প্রতিকৃতি তাঁর নির্দেশে মুছে ফেলা হয়।

---

৩১৪. সূরা ইসরা: ১৮

৩১৫. সূরা সাবা: ৪৯

শিক্ষাঃ

০১. কোনো মূর্তি বা ভাস্কর্য তৈরি করা এবং তা স্থাপন করা শরীয়তসিদ্ধ নয়; তাই এসব নাপাক জিনিসের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে হবে।

০২. মূর্তি ভাঙা রাসূল ﷺ এর-ই সুন্নাহ ও আদর্শ। তাই যুগে যুগে তাঁর প্রকৃত অনুসারীগণই মূর্তি ভাঙার জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত থাকেন।

কা'বা ঘরের ভেতরে নামাজ

এরপর রাসূল ﷺ কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উসামা রাযি. ও বিলাল রাযি. ভেতরেই ছিলেন। তিনি দরজা অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর তিনি ভেতরের অংশগুলো দেখতে থাকেন। এ সময় তিনি তাকবীর ও তাওহীদের আয়াতগুলো পড়ছিলেন। তারপর কা'বা ঘরের দরজা খুলে দেন। রাসূল ﷺ কী করছেন, তা দেখার জন্য কুরাইশদের বিশাল সংখ্যক লোক কা'বার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো।

কুরাইশদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

রাসূল ﷺ কুরাইশদের সম্বোধন করে সেখানে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন। একাই তিনি সকল দলকে পরাজিত করেছেন। জেনে রেখো! আল্লাহর ঘরের চাবি রাখা, হাজ্বীদের পানি পান করানোর সম্মান ছাড়া সমস্ত মর্যাদা, সম্পদ, রক্ত ঝরানো আমার দু'পদতলে। ভুলবশত হত্যা, যা লাঠি দিয়েও যদি হয়ে থাকে; তবে তা হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে। তার জন্য শোনিতপাতের খেসারত দিতে হবে অর্থাৎ একশ'টি উট, যার মাঝে চল্লিশটি গর্ভবতী। হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর থেকে জাহিলিয়্যাতের অহংকার ও পূর্বপুরুষদের দাম্ভিকতা শেষ করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম আ. এর সন্তান। আর তিনি ছিলেন মাটির তৈরি। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

﴿ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। বস্তুত তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাবান; যে তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।"[৩১৬]

অতঃপর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী ধারণা? আমি তোমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করবো? সকলে বললো, খুব ভালো। আপনি সদয় ভাই এবং সদয় ভাইয়ের পুত্র। রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সাথে সেই কথাই বলবো; যা ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদের বলেছিলেন– আজ তোমাদের জন্য কোনো নিন্দা নেই। যাও তোমরা মুক্ত।

তারপর তিনি উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে কা'বা ঘরের চাবি ও হাজ্বীদের কে পানি পান করানোর সম্মানজনক দায়িত্ব ফিরিয়ে দিলেন। আর বললেন, যে তাঁর থেকে এ চাবি ছিনিয়ে নেবে সে জালিম। তখন নামাজের সময় হয়েছিলো রাসূল ﷺ বিলাল রাযি. কে কা'বার ছাদে উঠে আযান দিতে বললেন।

শিক্ষা:

আদর্শ নেতাকে অবশ্যই উদারতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

বিজয়ের পর শোকরানা নামাজ

এরপর রাসূল ﷺ উম্মে হানী বিনতে আবু তালিবের ঘরে গেলেন। সেখানে গোসল করে আট রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তখন সেখানে উম্মে হানী

৩১৬. সূরা হুজুরাত: ১৩

তার দু'দেবরকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন।

শিক্ষা:

কোনো অঞ্চল বিজয়ের পর শোকরানা নামাজ আদায় করা রাসূল ﷺ এর সুন্নাত।

বড় বড় পাপীদের হত্যার নির্দেশ

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ ৯ জন বড় বড় পাপীদেরকে হত্যার আদেশ দেন। যদিও এদেরকে কা'বা ঘরের পর্দার সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়; তবুও হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়।। তারা হচ্ছে–

০১. আবদুল উয্যা ইবনে খাতাল, ০২. আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ, ০৩. ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, ০৪. হারিস ইবনে নুফাইল ইবনে ওহাব, ০৫. মাকীস ইবনে সাবাবাহ, ০৬. হাব্বার ইবনে আসওয়াদ, ০৭ ও ০৮. ইবনে খাতালের দুই দাসী। ০৯. আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যকার কারো দাসী সারাহ।

ইবনে আবী সারাহ্র ব্যাপারে উসমান রাযি. সুপারিশ করেন। তখনো রাসূল ﷺ চাইছিলেন, যদি কোনো সাহাবী তাকে হত্যা করে দিতো। এ সময় তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকলেন। সবশেষে রাসূল ﷺ তাকে আশ্রয় দিলেন। ইকরামা ইয়ামানের পথ ধরে পলায়ন করছিলো। তার স্ত্রী রাসূল ﷺ এর কাছে তার জন্য আশ্রয় চাইলো। রাসূল ﷺ আশ্রয় দিলে সে তাকে নিয়ে আসে। তারপর ইকরামা ইসলাম কবুল করেন। ইবনে খাতাল কে কা'বার গিলাফের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। সাহাবায়ে কেরাম এসে রাসূল ﷺ কে এ খবর জানালেন। রাসূল ﷺ তাকে হত্যা করতে আদেশ করলেন। মাকীস ইবনে সাবাবাহকে নুমাইলাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. হত্যা করেন। মাকীস পূর্বে মুসলিম হয়েছিলো, পরে একজন আনসারী সাহাবীকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে যায়। হারিসকে আলী রাযি. হত্যা করেন। সে রাসূল ﷺ কে

খুব কষ্ট দিতো। হাব্বার ইবনে আসওয়াদ রাসূল ﷺ কন্যা যায়নাব রাযি. কে তাঁর হিজরতের সময় তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করে উটের হাওদা থেকে একটি শক্ত পাথরের উপর ফেলে দেয়। এতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। মক্কা বিজয়ের সময় সে পালিয়ে যায়। পরে এসে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইবনে খাতালের দু'দাসীর একজনকে হত্যা করা হয়। অন্যজন আশ্রয় চাইলে, তাকে আশ্রয় দেওয়া হয় । এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। সারাহের জন্য আশ্রয় চাওয়া হলে আশ্রয় দেওয়া হয়। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবনুল হাজার আসকালানী রহ. বলেন, যাদের রক্ত মূল্যহীন; এদের মধ্যে আবু মাশআর হারিস ইবনে তালাতিল খুযায়ীকে আলী রাযি. হত্যা করেন। কা'ব ইবনে যুহাইর পরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ওয়াহশী ও হিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক এরকমই বর্ণনা করেন। এ হিসেবে যাদেরকে হত্যার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; তাদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ৮ জন ও মহিলাদের সংখ্যা ৬ জন।[৩১৭]

উমায়ের ইবনে ওহাব রাযি. রাসূল ﷺ এর কাছে সফওয়ানের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলে রাসূল ﷺ তাকে আশ্রয় দেন। এরপর সফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। ফুযালাহ রাসূল ﷺ যখন তাওয়াফ করছিলেন, তখন তাঁকে হত্যা করার জন্য আসে, রাসূল ﷺ তার মনের কুমতলবের কথা বলে দিলে; সে মুসলিম হয়ে যায়।

এরপর রাসূল ﷺ কুরাইশদের সামনে আরও একটি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি হারাম শরীফের বিধি-নিষেধ উল্লেখ করেন।

শিক্ষা:

যারা রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে কটুক্তি করবে, তাদের কোনো নিরাপত্তা নেই। যেখানেই থাকবে, তাদেরকে হত্যা করা আবশ্যক। চাই তারা তাওবা করুক বা না করুক।

----

৩১৭. ফাতহুল বারী: ৮/১১-১২ পৃ.

আনসারদের মনে সান্ত্বনা

আনসারদের ভাবনা ছিলো এখন তো রাসূল ﷺ এর জন্মভূমি মুক্ত হলো। এখন কি তিনি এখানে থেকে যাবেন? এ প্রশ্নটি তাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। রাসূল ﷺ তখন সাফা পাহাড়ের উপর প্রার্থনারত ছিলেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী বিষয়ে কথা বলছিলে? সাহাবাগণ বললেন, তেমন কিছু নয়, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ জানার ব্যাপারে মত পরিবর্তন না করায় তাঁরা বলতে বাধ্য হলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এখন জীবন-মরণ তোমাদের সাথেই।

মক্কাবাসীদের বাইআত গ্রহণ

মক্কাবাসীগণ যখন দেখলেন ইসলামই কৃতকার্য এবং এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তারা রাসূল ﷺ এর কাছে আনুগত্যের বাইআত গ্রহণের জন্য আসলে উমর রাযি. রাসূল ﷺ এর বসার স্থানের নিচে বসে লোকজনদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তারপর সাফা পাহাড়ে মহিলাদের নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করলেন।

বিভিন্ন মূর্তি ভাঙার অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ

০১. মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ অষ্টম হিজরীর ২৫ শে রমজান উয্যা নামক মূর্তি ভাঙ্গার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। মূর্তিটির মন্দির ছিলো নাখলা নামক স্থানে। খালিদ রাযি. সেটি ভেঙে রাসূল ﷺ এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কিছু দেখেছো? খালিদ রাযি. বললেন, না। রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে তুমি তা ভাঙতে পারোনি। আবার গিয়ে ভেঙে আসো। উত্তেজিত হয়ে তিনি পুনরায় গিয়ে বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট এক মহিলাকে তাঁদের দিকে আসতে দেখলেন। প্রহরী চিৎকার দিয়ে ডাকতে লাগলো। কিন্তু ততক্ষণে খালিদ রাযি. তরবারি দিয়ে তার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। তারপর রাসূল ﷺ কে অবগত করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ সেটাই উয্যা। আর কোনো দিন তার পূজা করা হবে না।

০২. সেই মাসেই আমর ইবনে আস রাযি. কে মক্কা থেকে ১৫০ কি.মি. দূরত্বে রিহাত নামক স্থানে বনু হুযাইলের সুওয়া মূর্তিটি ভাঙার জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে উপস্থিত হলে প্রহরী জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কী চাও? তিনি বললেন, আল্লাহর নবী এই মূর্তিটি ভাঙার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সে বললো, তোমরা তা ভাঙতে পারবে না। আমর বললেন কেন? তোমরা এখনো এ বাতিলের উপর আছো? অতঃপর তিনি মূর্তিটির কাছে গিয়ে তা ভেঙে ফেললেন। সাথীদের নির্দেশ দিলেন, তার ধনভাণ্ডারের গৃহটি ভেঙে ফেলতে। কিন্তু সেখানে কোনো কিছু পাওয়া গেলো না। অতঃপর তিনি প্রহরীকে জিজ্ঞস করলেন, কেমন হলো? সে বললো, আমি আল্লাহর দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করলাম।

শিক্ষাঃ

> চোখে মিথ্যার রঙিন আয়না পরিধান করার কারণে অনেক মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু মিথ্যার আয়না সরিয়ে দিলে তারা ঠিকই নিজ থেকে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষের চোখ থেকে মিথ্যার আয়না সরিয়ে দেওয়া।

---

০৩. একই মাসে হযরত সা'দ রাযি. এর নেতৃত্বে ২০ জন ঘোড়সওয়ারকে প্রেরণ করা হয় কুদাইদের নিকটে মুশাল্লাল নামক স্থানে আওস, খাযরাজ, গাস্সান এবং অন্যান্য গোত্রের উপাস্য 'মানাত' মূর্তি ভাঙার জন্য। তাঁরা সেখানে গেলে মন্দিরের প্রহরী জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কী চাও? তাঁরা বললেন, মানাত মূর্তি ভাঙার জন্য আমরা এখানে এসেছি। সে বললো, তোমরা জানো এবং তোমাদের কার্য জানে। সা'দ রাযি. মূর্তির দিকে অগ্রসর হতেই দেখলেন– কালো, উলঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট এক মহিলা বেরিয়ে আসছে। সে আপন বক্ষদেশ চপড়াতে চপড়াতে উচ্চারণ করছিলো 'হায় রব'। প্রহরী বলে উঠলো, মানাত! অবাধ্যদের ধ্বংস করে দাও। ততক্ষণে সা'দ রাযি. তারবারি দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। সেখানে ধনভাণ্ডার কিছুই পাওয়া যায়নি।

০৪. অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে খালিদ রাযি. কে রাসূল ﷺ বনু জাযীমাহ গোত্রের নিকট আক্রমণ না করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ৩৫০ জন লোক নিয়ে সেখানে গমন করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি' না বলে 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছি' বললো। এজন্য তিনি তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করার আদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকের হাতে এক একজন বন্দী প্রদান করে তিনি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ইবনে উমর ও তাঁর সঙ্গীগণ এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। ঘটনাটি রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি আল্লাহর কাছে এ বলে দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে, আমি তা হতে তোমার নিকট নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি।[৩১৮] তখন শুধু বনু সুলাইম গোত্রের লোকজন নিজ বন্দীদেরকে হত্যা করেছে। আনসার ও মুহাজিরগণ তা করেননি। তারপর রাসূল ﷺ আলী রাযি. কে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন।

---

৩১৮. সহীহ বুখারী: ১/৪৫০, ২/৬২২

গযওয়ায়ে হুনাইন

মুসলিমগণ আকস্মিকভাবে মক্কা অভিযান করেন। সে সময় কোনো গোত্রের সাহস ছিলো না যে, আক্রমণকে রুখবে। এ কারণে জেদি ও অহংকারী কিছু গোত্র ব্যতীত বাকি সকলেই মুহাম্মাদ ﷺ এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই জেদি ও অহংকারী গোত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র। পরাজয় স্বীকার করে মুসলিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করাকে তারা নিজেদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক মনে করলো। তাই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

শত্রুদের অগ্রসর হওয়া

তারা সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে মালিক ইবনে আওফের নেতৃত্বে যাত্রা করলো এবং আওতাস নামক উপত্যকায় এসে শিবির স্থাপন করলো। তাদের সাথে তাদের মহিলা, শিশু ও গাবাদিপশু ছিলো। এ জায়গাটি হুনাইনের নিকটে।[৩১৯]

তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিলো তার নাম দুরাইদ ইবনে সিম্মান। সামরিক বিষয়ে সে ছিলো খুব অভিজ্ঞ। সে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করার শক্তি রাখতো না। তবে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা তার জন্য উপযোগী ছিলো। সে মালিক ইবনে আওফকে ডেকে এনে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করলো। এক সময় সে বললো, মহিলা-শিশুদের সাথে আনা ঠিক হয়নি। মালিক বললো, এতে করে তো যোদ্ধারা উৎসাহিত হবে। নিজের পরিবার বাঁচানোর জন্য লড়াই করবে। দুরাইদ তাকে আরও বোঝালো। প্রকৃতপক্ষে মালিক চাইছিলো না যে, কেউ পরামর্শ দিয়ে তার আগে থাকুক। দুরাইদের পরামর্শ মতো কাজ হবে, তা মালিক চাইতো না।

শিক্ষা:

> শত্রুরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। মুমিনদেরকে ঈমানী তেজে বলীয়ান হয়ে তাদের মোকাবেলা করা উচিত। তবেই তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা সম্ভব হবে।

---

৩১৯. ফাতহুল বারী: ৮/২৭ ও ৪২ পৃ.

শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের দুরাবস্থা

মুসলিমদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য মালিক যেসব গোয়েন্দা প্রেরণ করলো। তাদের এমন অবস্থা হলো যে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সন্ধিক্ষণে চিড়ে যেতে থাকলো। তাদেরকে মালিক জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, আমরা কিছু সংখ্যক সাদা-কালো মিশ্রিত ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যাওয়া মানুষকে দেখলাম, তখন থেকে আমাদের এ অবস্থা।

শিক্ষা:

আল্লাহই মুমিনদের একমাত্র সহায়ক। তাই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা উচিত।

মুসলিম বাহিনীর গোয়েন্দা

রাসূল ﷺ শত্রুদের অবস্থানের কথা জানতে পেরে আবু হাদরাদ আসলামী রাযি. কে নির্দেশ দিলেন মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়বে ও অবস্থান করবে। তাদের নিকট থেকে সঠিক খবরাখবর নিয়ে ফিরে আসবে। নির্দেশ মতো তিনি কাজ আদায় করলেন।

শিক্ষা:

শত্রুর খবরাখবর নেওয়ার জন্য তাদের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা মোতায়েন করতে হবে।

মক্কা থেকে হুনাইন

অষ্টম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শনিবার রাসূল ﷺ মক্কা থেকে রওয়ানা হোন। সাথে ১২০০০ সৈন্য। দুপুরের পর এক ঘোড়সওয়ার এসে জানালেন, আমি অমুক অমুক পর্বতের উপর আরোহণ করে দেখলাম, বনু হাওয়াযিন গোত্র তাদের সর্বস্ব নিয়ে ময়দানে এসেছে। মহিলা, শিশু, গবাদিপশু তাদের সাথে আছে। রাসূল ﷺ মৃদু হেসে বললেন, আগামীকাল ইন'শাআল্লাহ তা মুসলিমদের হাতে আসবে।[৩২০]

---

৩২০. আওনুল মা'বূদ শরহে আবু দাউদ: ২/৩১৭

হুনাইন যাওয়ার পথে মুসলিম বাহিনী একটি বড় আকারের কুল গাছ দেখলো। যাকে সে সময় যাতু আনওয়াত বলা হতো। কারণ এর উপর অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হতো। একে মন্দির বানাতো। কিছু মুসলিম এরকম একটি বৃক্ষের জন্য আবেদন করলেন রাসূল ﷺ এর কাছে। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা তো তাই বলছো; যা ইয়াহুদীরা মূসা আ. কে বলেছিলো। তারা চাইছিলো, তাদের জন্য একজন ইলাহ বানিয়ে দিতে। তোমরাও পূর্বের রীতিনীতির উপর অবশ্যই আরোহণ করে বসবে।[৩২১]

মুসলিম সৈন্যের উপর হঠাৎ আক্রমণ

মুসলিম বাহিনী ১০ই শাওয়াল হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছলেন; কিন্তু শত্রু বাহিনী এর পূর্বেই রাতের বেলা সেখানে এসে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে। মুসলিমগণ উপত্যকায় প্রবেশ করা মাত্রই তারা তীর ছুঁড়তে থাকে। আকস্মিক এমন আক্রমণের প্রচণ্ডতায় মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যখন দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ হলো, রাসূল ﷺ ডান দিক থেকে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, হে লোকসকল! আমার দিকে এসো। আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ। সে সময় কিছু সংখ্যক আনসার ও মুহাজির সাহাবী সেখানে ছিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেছেন, ৯ জন। ইমাম নাবাবী বলেন, ১২ জন। বিশুদ্ধ কথা এটা যা আহমাদ ইবনে হাম্বল ও হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন, তখন সেখানে ছিলেন ৮০ জন সাহাবী। এ সময় রাসূল ﷺ এর যে বীরত্ব প্রকাশ পায় তার কোনো তুলনা হয় না। শত্রু বাহিনীর প্রবল আক্রমণের সময়ও তিনি ছিলেন অটল। তিনি বলছিলেন–

أنــا النبي لا كَذِبْ ** أنا ابن عبد المطلب

"আমি সত্য নবী, মিথ্যা (নবী) নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।"

কিন্তু সে সময় আবু সুফইয়ান ইবনে হারিস রাযি. রাসূল ﷺ এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আব্বাস রাযি. রেকাব ধরে থামিয়ে রাখছিলেন। যেন সে দ্রুত গতিতে এগিয়ে না যায়।

---

৩২১. সুনানে তিরমিযী: ২/৪১

শিক্ষাঃ

ময়দানের কঠিন পরিস্থিতিতে নেতাকে অবশ্যই অটল-অবিচল থেকে সাথীদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মুসলিমদের ফিরে আসা

রাসূল ﷺ দরাজ কণ্ঠবিশিষ্ট আব্বাস রাযি. কে বললেন, সাহাবাদেরকে উচ্চস্বরে আহ্বান জানাতে। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, হে বৃক্ষ তলের শপথকারীগণ! কোথায় আছো? এমন সময় তাঁরা সকলে ফিরতি পথ ধরলো ময়দানের দিকে। অবস্থা এমন হলো, যে ব্যক্তি আপন উটকে ফিরাতে সক্ষম হচ্ছিলেন না; তিনি উটকে ছেড়ে ঢাল-তলোয়ার সামলে আওয়াজের উৎসের দিকে ছুটলেন। মুসলিম সৈন্যগণ যে গতিতে গিয়েছিলেন। ঠিক একই গতিতে তারা ফিরে আসলেন।[৩২২] কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়দানে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। রাসূল ﷺ এক মুঠো মাটি নিয়ে শত্রুদের উপর নিক্ষেপ করে বললেন– شاهت الوجوه (শাহাতিল উযুহ) "তোমাদের মুখমণ্ডল ধুলো ধুসরিত হোক!" এ এক মুঠো মাটি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, তা সকল শত্রুসেনার চোখে গিয়ে লাগলো। এরপর শত্রুদের যুদ্ধের স্পৃহা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পর শত্রুরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলো। ফলে শত্রুদের ৭০ জন নিহত হয় ও তাদের নিয়ে আসা সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, মহিলা, শিশু ও গবাদিপশু সবই মুসলিমদের হাতে এসে পড়ে।

হুনাইনে প্রাথমিক পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়ার কারণ

হুনাইনের দিকে মুসলিমদের আসার সময় তাঁদের মধ্য থেকে কোনো একজন অহংকারের সাথে বলেছিলেন– لن نغلب اليوم من قلة "আজ আমরা সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবো না।" আল্লাহ তাআলা এ বাক্য পছন্দ করেননি। কেননা বিজয় ও সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর হাতে। ফলে মুসলিমদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁদেরকে পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করান। মুসলিমদের প্রাথমিক বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে আল্লাহ

---

৩২২. সহীহ বুখারী: ২/১০০

তাআলা বলেন–

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ - ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾

"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিলো; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিলো। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী; যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হলো কাফেরদের কর্মফল।"[৩২৩]

শিক্ষা:

০১. যে কোনো প্রকার দুর্বলতা বা ভুলের উত্তম চিকিৎসা হলো ঈমানকে দৃঢ় করা। ঈমান দৃঢ় করলে সকল মানসিক ব্যাধি ও ভীতি দূর হয়ে যায়।

০২. মুমিন ব্যক্তিকে অহংকার ও দাম্ভিকতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা তা ধ্বংসের কারণ।

০৩. যারা আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরবে, তাদের জন্য সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে। যারা সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে, তাদের জন্য নয়।

৩২৩. সূরা তাওবা: ২৫-২৬

০৪. সংখ্যাধিক্যের উপর ভরসা জন্মানোর মতো দুর্ভাবনা আসলেই সাথে সাথে তাওবা করে নিতে হবে।

শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন

পরাজিত হওয়ার পর শত্রুদের একটি দল তায়েফের দিকে চলে যায়। অপর একটি দল নাখলার দিকে যায়। তাদেরকে মুসলিম ঘোড়সওয়ারদের একটি দল পশ্চাদ্ধাবন করে। দুরাইদকে রাবীআহ ইবনে রাফি' রাযি. হত্যা করেন। আরেকটি দল আওতাসের পথ ধরে। রাসূল ﷺ আবু আমর আশআরী রাযি. এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী আওতাসের দিকে প্রেরণ করেন তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য। সেখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে লড়াই হলে শত্রুরা পালিয়ে যায়। আবু আমর রাযি. শহীদ হোন।

পরাজিত মুশরিকদের সবচেয়ে বড় দলটি তায়েফের দিকে যায়। রাসূল ﷺ স্বয়ং গনীমত একত্রিত করার পর একটি বাহিনীর সাথে তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করেন।

গনীমত

৬ হাজার যুদ্ধবন্দী, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজারেরও বেশি বকরি, ৪ হাজার উকিয়া রূপা গনীমত হিসেবে পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ তা একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তারপর তা মাসউদ ইবনে আমর গিফারী রাযি. এর তত্ত্বাবধানে রেখে তায়েফ অভিমুখে রওয়ানা করেন।

যুদ্ধবন্দীদের মাঝে রাসূল ﷺ এর দুধ বোন শায়মা বিনতে হারিস ছিলেন। রাসূল ﷺ এর নিকট তাকে আনা হলে তিনি পরিচয় পেশ করেন। একটি পরিচিত চিহ্নের মাধ্যমে তাকে রাসূল ﷺ চিনতে পারেন। তারপর তাকে নিজ চাদর বিছিয়ে তার উপর সসম্মানে বসালেন। পরে তাকে তার গোত্রের নিকট ফেরত পাঠান।

গযওয়ায়ে তায়েফ

হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের অধিকাংশ লোকজন মালিক ইবনে আওফের নেতৃত্বে তায়েফের দিকে গমন করে। রাসূল ﷺ হুনাইনের ব্যস্ততা থেকে অবকাশের পর অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তায়েফের উদ্দেশ্যে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. এর নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এরপর তিনি স্বয়ং তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে লিয়াহ নামক স্থানে মালিক ইবনে আওফের একটি দুর্গ ছিলো। রাসূল ﷺ তা ভেঙে ফেলেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে তায়েফ অবরোধ করেন। অবরোধ ধীরে ধীরে দীর্ঘায়িত হচ্ছিলো। এ অবরোধ চল্লিশ দিন অব্যাহত থাকে।[৩২৪]

উভয় পক্ষ থেকে তীর ও প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপন চলতে থাকে। প্রথমে মুসলিমগণ যখন অবরোধ করলেন। তখন শত্রুরা এত অধিক পরিমাণে তীর নিক্ষেপ করছিলো যে, যেন টিড্ডিরা আকাশে আঁধার ফেলে এগিয়ে আসছে। এতে ১২ জন মুসলিম শহীদ হোন আর কিছু সংখ্যক আহত হোন। তারপর সেখান থেকে শিবির সরিয়ে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এ পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ তায়েফবাসীর উপর মিনজানীক দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করেন। ফলে দেয়ালের কয়েকটি স্থানে ফাটলের সৃষ্টি হয়। তখন মুসলিমগণ কামানের ভেতরে প্রবেশ করে দুর্গের কাছে গিয়ে আগুন জ্বালানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শত্রুরা তাদের উপর লোহার উত্তপ্ত টুকরো নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে কিছু সংখ্যক মুসলিম সেখানে শহীদ হয়ে যান।

শত্রুদের বশে আনার জন্য রাসূল ﷺ তাদের আঙুর গাছগুলো কাটতে আদেশ দিলেন। অধিক সংখ্যক গাছ কেটে ফেললে তারা আত্মীয়তা ও আল্লাহর দোহাই দিয়ে আবেদন জানায়; এরপর রাসূল ﷺ তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। অবরোধ চলাকালে ঘোষণা দেওয়া হয়, যে গোলাম দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবে সে মুক্ত। তখন তাদের থেকে ২২ জনের মতো বের হয়ে আসে ও মুসলিমদের দলভুক্ত হোন।[৩২৫]

---

৩২৪. ফাতহুল বারী: ৮/৪৫
৩২৫. সহীহ বুখারী: ২/২৬০

অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছিলো। দুর্গ পতনের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিলো না। এদিকে মুসলমানদের উপর তীর ও গরম লোহার আঘাত আসতে থাকলো। তাছাড়া তারা এক বছরের জন্য দুর্গের মধ্যে খাদ্য মজুদ করে রেখেছিলো। রাসূল ﷺ নাওফাল ইবনে মুআবিয়ার নিকট পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, এখানে অটল থাকলে তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবেন। আর যদি ছেড়ে চলে যান, তারা আপনার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এ কথা শুনে আগামী দিন চলে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি সাহাবাগণকে নাখোশ দেখে আগামীকালও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ তায়েফ বিজয় করা ছাড়া যেতে চাইলেন না। তার পরের দিন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য গেলেও আঘাত নিয়ে ফিরে আসা ছাড়া কোনো সুবিধা করা গেলো না। এবার সকলে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন। রাসূল ﷺ তখন মৃদু হাসতে থাকলেন।

শিক্ষা:

০১. শত্রুদেরকে কখনো স্থির থাকতে দেওয়া যাবে না। এক ময়দান থেকে অপর ময়দানে তাদেরকে অস্থির করে রাখতে হবে। অন্যথায় তারা নতুন ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পাবে।

০২. অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার আলোকে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।

গনীমত বণ্টন

তায়েফ অবরোধ শেষে জিরানায় ফিরে এসে রাসূল ﷺ অপেক্ষা করতে থাকেন। যদি তারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আসে; তবে তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বিলম্ব করা সত্ত্বেও যখন তারা এলো না, রাসূল ﷺ গনীমতের মাল বণ্টন করতে শুরু করলেন। মক্কার নব মুসলিমদের কে অনেক গুণ বাড়তি দেওয়া হচ্ছিলো তাদের মুআল্লাফাতে কুলূব অনুসারে। যেমন, রাসূল ﷺ আবু সুফইয়ান ইবনে হারিসকে চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দিলেন। একশ' উট দিলেন। তিনি বললেন, আমার ছেলে ইয়াযীদ? তখন রাসূল ﷺ

তাকেও অনুরূপ দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমার ছেলে মুআবিয়া। তারপর তাকেও অনুরূপ অংশ প্রদান করলেন।

এমনকি মানুষের মাঝে প্রচার হয়ে গেলো রাসূল ﷺ এমনভাবে দান করছেন, তাঁদের আর পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না। তাই অর্থ সাহায্যের জন্য বেদুইন দল আসতে থাকলো। অতিরিক্ত ভিড় এড়ানোর জন্য রাসূল ﷺ একটি গাছের দিকে সরে পড়তে বাধ্য হলেন। রাসূল ﷺ তখন বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তুহামা বৃক্ষের সমপরিমাণ পশু আমার কাছে থাকতো! তবে তা তোমাদের মধ্যেই আমি বণ্টন করে দিতাম। এ বণ্টন নীতি ছিলো একটি রাজনৈতিক কৌশল।

আনসারদের দুর্ভাবনা

এ বিষয়টি নিয়ে আনাসারদের মধ্যে বিমর্ষতা ছড়িয়ে পড়ে। তারা ভাবলেন, দুঃখের সময় আমরা পাশে ছিলাম। নিজেদের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে আমরা বিজয় করেছি। এখন হুনাইন যুদ্ধের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হলো।[৩২৬] সা'দ রাযি. এ বিষয়টি রাসূল ﷺ কে জানালেন। তিনি সকল আনসারকে এক জায়গায় সমবেত হতে বললেন। সেখানে কিছু মুহাজির সাহাবী আসলে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়নি। অপর কিছু লোক আসলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়। রাসূল ﷺ তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিয়ে বললেন, হে আনসারগণ! একটি নিকৃষ্ট ঘাসের জন্য তোমরা নিজ অন্তর নষ্ট করছো। হে আনসারগণ! তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, অন্যরা বকরি ও উট নিয়ে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যাবে? রাসূল ﷺ এর এ ভাষণের পর উপস্থিত সকলে এত বেশি কাঁদলেন যে, তাঁদের দাড়িগুলোও ভিজে গেলো। তারা বলতে লাগলেন, আমরা এ জন্য খুশি যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের অংশে আমাদের সাথে রয়েছেন। তারপর রাসূল ﷺ ফিরে আসেন আর লোকজন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন।[৩২৭]

---

৩২৬. ফিকহুস সীরাহ, গাযালী: ২৯৮ ও ২৯৯ পৃ.

৩২৭. ইবনে হিশাম: ২/৪৯৯-৫০০ পৃ.; সহীহ বুখারী: ২/৬২০-৬২১ পৃ.

শিক্ষা:

শয়তান বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে কিছু দুর্ভাবনা ঢুকিয়ে দিতে পারে; সুতরাং এগুলোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আমীরের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের আগমন

গনীমত বন্টনের পর হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল ﷺ এর কাছে আসেন। তাঁর কাছে আরয করেন, দয়া করে আটককৃত ও আমাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিন। কারণ তারা আমাদের মা, বোন, খালা, ফুফু। তাদের বন্দিত্ব আমাদের জন্য বড়ই অবমাননাকর। তাদের কথাবার্তায় মনে হয় অন্তর গলে যায়।[৩২৮]

রাসূল ﷺ বললেন, আমি সত্য কথা ভালোবাসি। তাই বলো, তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ বড় না সন্তান-সন্ততি? তারা বললেন, আমাদের নিকট মর্যাদার চেয়ে বড় কিছু নেই। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা যোহরের নামাজ শেষে বলবে, আমরা রাসূল ﷺ কে মুমিনদের জন্য সুপারিশকারী বানাচ্ছি ও মুমিনদেরকে রাসূল ﷺ এর জন্য সুপারিশকারী বানাচ্ছি। তাই আমাদের আটককৃতদের ফিরিয়ে দিন। তারা ঠিক তাই করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি আমার ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের যা আছে তা তোমাদের দিয়ে দিলাম। এখন আমি লোকজনের নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাই। তারপর আনসার, মুহাজির, বনু সুলাইমের লোকজন তা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর জন্য সমর্পণ করেন। বনু তামীম ও বনু ফাযারা তা থেকে বিরত থাকলেন।

শিক্ষা:

মুসলিমগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মাঝে অত্যন্ত কোমল স্বভাবের অধিকারী।

---

৩২৮. ফাতহুল বারী: ৮/৩৩

উমরাহ পালন এবং মদীনায় ফিরে আসা

রাসূল ﷺ জিরানা থেকে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধেন এবং উমরাহ পালন করে অষ্টম হিজরীর ২৪ শে যুল কা'দাহ মদীনায় ফিরে আসেন।

গযওয়ায়ে তাবুক

[রজব, নবম হিজরী]

মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলিমদের জন্য অভ্যন্তরীণ আর কোনো সমস্যা ছিলো না বললেই চলে। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধি দল মক্কায় আসছিলো, আর তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিচ্ছিলো। এভাবে দলে দলে তারা দ্বীনে প্রবেশ করছিলো। তাই তাঁদের জন্য আরবের বাহিরে ইসলাম প্রচারের সুযোগ এসে গেলো। ইসলামের দাওয়াত প্রচারে তাঁরা একনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেলো।

তাবূক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এ পর্যায়ে এসে একটি শক্তি মুসলিমদের বিরক্ত করছিলো। তাঁদের সাথে শত্রুতায় মোড় নিতে চাচ্ছিলো। যেমন শুরাহবিল ইবনে আমর কর্তৃক হারিস ইবনে উমাইর আযদী রাযি. কে হত্যা করার মাধ্যমে এ শত্রুতা শুরু হয়। মুসলিমগণ তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম দাপটের অধিকারী রোমানদের জন্য স্পষ্ট বিপদস্বরূপ দেখা দিলো। তাদের শাম রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তারা চাইছিলো, ইসলামকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে; যেন পরবর্তীতে কোনো সমস্যা না হয়। তাই মুতার যুদ্ধের এক বছর পর রোম সম্রাট রোমান ও তাদের অধীনস্থ আরব গোত্রগুলো বিশেষ করে গাসসান গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অপরদিকে, মানুষের জন্য ইসলামের দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে একটি বাধা হলো শাসকগোষ্ঠী। মূলত সাধারণ লোকজনের স্বাধীনতা না থাকায় তারা ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসে না। তাই তাদেরকে সে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে জিহাদ করতে হয়। আর ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৩২৯]

ইবনে কাসীর রহ. বলেন, রাসূল ﷺ রোমানদের সাথে কিতাল করতে চাইলেন, কারণ তারা ছিলো অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। তাদের ইসলামের প্রতি অধিক নৈকট্য ছিলো। তাই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার

৩২৯. তাই ফুকাহায়ে কেরাম দাওয়াতকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন: ১- دعوة بالسيف / ২- دعوة باللسان

জন্য এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। আল্লাহর বাণী–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মাঝে যেন কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।"[৩৩০]

শিক্ষা:

০১. প্রথমে নিকটবর্তী কাফেরদেরকে প্রতিহত করতে হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তীদেরকে।

০২. আমরা শত্রুদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকলেও তারা আমাদের ব্যাপারে নীরব বসে নেই। তাই তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

০৩. আল্লাহর ইবাদতের পথে মানুষের সকল বাধা দূর করার জন্য এবং মানুষকে তাগুতের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামিতে প্রবেশ করানোর জন্য মুমিনগণ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেন।

০৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর কারণে মানুষ ইসলামের হুকুম আহকাম পালন করতে পারে না। তাই জালেম শাসকগোষ্ঠীকে যে কোনো মূল্যে সরিয়ে দিতে হবে।

মদীনায় সংবাদ

মদীনায় ধীরে ধীরে সংবাদ আসতে থাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে রোমানরা এক চরম যুদ্ধ করবে; যেন তাঁদেরকে সমূলে উৎখাত করতে পারে। রোমানদের

৩৩০. সূরা তাওবা: ১২৩

আক্রমণের খবর একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। অপরপক্ষে মুনাফিকদের শঠতার কারণে তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করলো। তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একটি মাসজিদের নামে এমন একটি ঘর বানালো; যাতে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা যায় এবং তা বাস্তবায়নের সুযোগ পায়। তারা চাইছিলো, এর মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে দলাদলি সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে গোপনে তথ্য পরিবেশন করতে। তাদেরকে যেন কেউ সন্দেহ না করে; তাই তারা এখানে নামাজ পড়ার জন্য রাসূল ﷺ কে অনুরোধ জানালো। রাসূল ﷺ যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। তাই যুদ্ধ হতে ফিরেই তিনি একে ধ্বংস করে দেন।

শিক্ষাঃ

> মুনাফিকরা বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুসলিমদের ক্ষতি করতে ওত পেতে থাকে এবং এমনকি মুনাফিকরা ইবাদাতের পন্থায় মুসলিদেরকে ধোঁকা দিতে চায়।

রোমানদের প্রস্তুতি

শাম থেকে আকস্মিকভাবে খবর পাওয়া গেলো রোমানরা ৪০ হাজার সৈনিকের সমন্বয়ে একটি যুদ্ধপ্রিয় বাহিনী গঠন করেছে। তাদের এ বাহিনীতে আরব খ্রিস্টান গোত্রগুলোর মধ্যে লাখম, জুযাম ও অন্যান্য গোত্র যোগ দেয়। তাদের বাহিনীর অগ্রবর্তী দল বালকা নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করে।

তাবূক সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য

যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর সুন্নত হলো, কোন দিকে যুদ্ধ হবে; তা তিনি গোপন রাখতেন। কিন্তু এ যুদ্ধের সময় তিনি তা স্পষ্ট করে মুসলিমদের জানিয়ে দিলেন।[৩৩১] কারণ তখন গ্রীষ্মকাল, আবহাওয়া ছিলো গরম। সফর ছিলো মরুভূমি ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। তখন মদীনার ফলগুলো পাকছিলো

৩৩১. সহীহ বুখারী: ৪/১৬০৩ (৪১৫৬ নং হাদীস)

এবং তা কাটার সময় হয়ে এসেছিলো। ফলে সেগুলোকে ছেড়ে যাওয়া ছিলো কষ্টকর। তাই তখন ধৈর্য ও সংকল্পবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। অপরদিকে শত্রু ছিলো শক্তিশালী ও বৃহৎ সংখ্যক। সকলে যেন সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে; তাই তিনি যুদ্ধের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন।

শিক্ষা:

০১. যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অনুগত এবং অবাধ্যদের মাঝে পার্থক্য করে দেন। আর কঠিন মুহূর্তে যারা আনুগত্য করে তারাই প্রকৃত অনুগত বান্দা।

০২. পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়, আবার কখনো তা একেবারে গোপন রাখা হয়।

দান করার জন্য রাসূল ﷺ এর উৎসাহ প্রদান

রাসূল ﷺ সাহাবাগণকে উত্তমভাবে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি তাদেরকে দান করার জন্য আহ্বান করলেন। যেমন তিনি বলছিলেন– من جهز جيش العسرة فله الجنة "যে ব্যক্তি অভাবযুক্ত বাহিনী তথা তাবূকের বাহিনীকে প্রস্তুত করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।"[৩৩২]

তারপর সাহাবায়ে কেরামগণের মাঝে দানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সে সময় উসমান ইবনে আফফান রাযি. ৩০০ টি উট এবং ২০০ উকিয়া রৌপ্য দান করেন। তারপর ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা এনে রাসূল ﷺ এর কোলের উপর ঢেলে দেন। রাসূল ﷺ তা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে দেখতে বলেন, আজকের পর উসমান যা কিছু করবে; তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।[৩৩৩] এরপরও উসমান রাযি. আরও সদাকা করলেন। তিনি সে সময় নগদ অর্থ ছাড়াও মোট ৯০০ টি উট এবং ১০০ টি ঘোড়া দান করেন।[৩৩৪]

---

৩৩২. সহীহ বুখারী: ৩/১০২১ (২৬২৬ নং হাদীস)

৩৩৩. মুসনাদে আহমাদ: ৫/৬৩; মুসতাদরাকে হাকিম: ৩/১০২

৩৩৪. সুনানে তিরমিযী: উসমান ইবনে আফফানের কৃতিত্ব অধ্যায়।

উমর রাযি. তাঁর সম্পদের অর্ধেক দান করলেন। আবু বকর রাযি. তাঁর সমস্ত সম্পদ এনে রাসূল ﷺ এর সামনে রাখলেন। বাড়ির জন্য কী রেখে এসেছো? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন– الله ورسوله "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে।" স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সকলেই দানের হাত বাড়ালেন। এমনকি আবু আকিল রাযি. অর্ধসা' খেজুর দান করলেন।[৩৩৫]

যেসব সাহাবায়ে কেরামের কাছে কোনো সম্পদ ছিলো না, বাহনের ব্যবস্থা ছিলো না; তাঁরা রাসূল ﷺ এর কাছে অনুরোধ করলেন, যেন তাঁদের জন্য তিনি বাহনের ব্যবস্থা করেন। এতে তাঁরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রাসূল ﷺ তখন তাঁর নিকট সওয়ারি না থাকার কথা বলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

﴿ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾

"আমার কাছে এমন কোনো বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো। তখন তারা ফিরে গেলো; অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো এ দুঃখে যে, তাঁরা এমন কোনো বস্তু পাচ্ছে না, যা ব্যয় করবে।"[৩৩৬]

শিক্ষাঃ

০১. দানের ক্ষেত্রে কম-বেশি নয়; বরং ইখলাসই বিবেচ্য।

০২. জিহাদের জন্য জানের পূর্বে মাল ব্যয় করতে হবে। কারণ, মাল ব্যতীত যুদ্ধ অসম্ভব। তাছাড়া এর ফযীলতও অনেক বেশি।

০৩. কল্যাণকর কাজে আমাদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

---

৩৩৫. সহীহ বুখারী: ৪/১৭১৫ (৪৩৯১ নং হাদীস)
৩৩৬. সূরা তাওবা: ৯২

০৪. সত্যিকার মুমিনের অবস্থা তো এমনই হবে, তার কাছে যদি কোনো সম্পদ বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বাহনের ব্যবস্থা না থাকে; তবুও সে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাকুল থাকবে। জিহাদে যেতে না পারায় ক্রন্দনরত হয়ে আফসোস করতে থাকবে।

আলী রাযি. কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তকরণ

রাসূল ﷺ যখন তাবূকের পথে বের হোন, তখন আলী রাযি. কে নিজ পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক করে রেখে যান। আলী রাযি. তখন আরয করলেন, আপনি কি আমাকে মহিলা ও শিশুদের সাথে রেখে যাচ্ছেন? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসা আ. এর সাথে হারুন আ. এর যেরূপ সম্পর্ক ও মর্যাদা ছিলো তাতে? তবে নিশ্চয়ই আমার পরে আর কোনো নবী নেই।[৩৩৭]

তাবূকের পথে

রাসূল ﷺ মদীনার উত্তর দিকে রওয়ানা করলেন সাথে ৩০ হাজার সৈন্য। প্রায় প্রতি ১৮ জনের জন্য একটি উট বরাদ্দ ছিলো। পালাক্রমে তাঁরা উটে আরোহণ করতেন। খাওয়ার জন্য প্রায়ই গাছের পাতা ব্যবহার করতে হতো। তাছাড়া উট যবেহ করে পাকস্থলী থেকে পানি বের করে খেতে হতো। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এ বাহিনীর নাম দেন জাইশে উসরাহ (অভাব-অনটনের বাহিনী)। পথিমধ্যে সামূদ জাতির অঞ্চল পড়ে। রাসূল ﷺ তখন সাহাবাদেরকে বললেন, সালেহ আ. এর উট যে কূপ থেকে পানি পান করেছিলো; তা থেকে পানি উঠাতে। আর সামূদ জাতির কূপ থেকে যে পানি উঠানো হয়; তা পান করতে এবং এর দ্বারা অযু করতে নিষেধ করেছিলেন। সামূদ জাতির আবাসস্থলে প্রবেশ করতেও নিষেধ করেছিলেন। আর সে অঞ্চল দ্রুত গতিতে পার করা হয়।[৩৩৮]

পথিমধ্যে সাহাবাদের পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁরা রাসূল ﷺ এর কাছে পানির জন্য আরয করলেন। রাসূল ﷺ আল্লাহর নিকট দুআ করলেন।

---

৩৩৭. সহীহ বুখারী: ৪/১৬০২ (৪১৫৪নং হাদীস)
৩৩৮. সহীহ বুখারী: ২/৬৩৭

তখন বৃষ্টি শুরু হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. পান করে তৃপ্ত হলেন এবং প্রয়োজন মতো সংরক্ষণ করে নিলেন। তাবূকের একটি ঝর্ণাতে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. অস্বচ্ছ পানি পেয়েছিলেন, রাসূল ﷺ তা থেকে পানি নিয়ে মুখ ও হাত ধৌত করলেন। তারপর ঝর্ণার মধ্যে হাত ডুবালেন। এরপর সেখানে ভালো পানির প্রবাহ সৃষ্টি হলো।[৩৩৯]

শিক্ষাঃ

০১. কঠিন প্রতিকূল সময়ে যাঁরা জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়, তাঁরা প্রকৃত মুমিন। মুনাফিকরা তখন পশ্চাতে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

০২. সব ধরনের বিপদাপদ, কষ্ট-মুসীবতে মুমিনকে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

০৩. কঠিন সময়ে জিহাদের ডাকে সাড়া দানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জাতি যোদ্ধা জাতি। রাসূল ﷺ এর নবুওয়াতের জীবনীর দীর্ঘ একটা সময় জিহাদের মাঝেই কেটেছিলো।

তাবূক প্রান্তরে

রাসূল ﷺ তাবূকে প্রান্তরে পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু সেখানে কোনো কিতাল সংঘটিত হয়নি। না রোমানদের সাথে হয়েছে, না তাদের সাথে আসা আরব গোত্রের সাথে হয়েছে। রাসূল ﷺ সেখানে বিশ দিন অতিবাহিত করে মদীনাতে ফিরে এলেন।[৩৪০]

মূলত, রাসূল ﷺ ও মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে রোমানদের এবং তাদের মিত্র গোত্রসমূহের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। ফলে তারা সামনে অগ্রসর হয়ে মোকাবেলা করার সাহস হারিয়ে ফেলে। বিক্ষিপ্ত হয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। রোমানদের এ পলায়নে মুসলিমদের জন্য রাজনৈতিক সুবিধা বয়ে আনে।

৩৩৯. সহীহ মুসলিম: ২/২৪৬
৩৪০. মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৯৫; বায়হাকী: ৩/১৫৩

এ সময়ে রাসূল ﷺ ৪২০ জন সৈন্যের একটি বাহিনীকে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. এর নেতৃত্বে দুমাতুল জান্দালের দিকে প্রেরণ করেন। খালিদ রাযি. ঐ অঞ্চলের শাসক উকায়দিরকে রাসূল ﷺ এর দরবারে হাজির করেন। রাসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার সাথে সন্ধি করলেন।

যে সকল গোত্র রোমানদের অধীনে ছিলো, তারা এবার নিরাপত্তার স্বার্থে রাসূল ﷺ এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হোন।

মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে শত্রুপক্ষ থেকে আক্রমণের চেষ্টা

মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় একটি গিরিপথে ১২ জন মুনাফিক রাসূল ﷺ এর উপর আক্রমণ করার চেষ্টা চালায়। রাসূল ﷺ এর সাথে তখন আম্মার ও হুযাইফা রাযি. ছিলেন। আম্মার রাযি. উটের লাগাম ধরে রেখেছিলেন আর হুযাইফা রাযি. উটকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন উপত্যকায় তাঁরা চলছিলেন, এমন সময় পেছন থেকে মুনাফিকরা এগিয়ে আসছিলো। তখন তাদের পায়ের শব্দ শোনা যায়। সকলে ছিলো মুখোশ পরা। রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে হুযাইফা রাযি. কে পাঠালেন। তিনি তাদের বাহনের মুখের উপর আঘাত করতে থাকেন। এরপরে তারা ভীত হয়ে পলায়ন করে নিজেদের সাথীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। তারপর রাসূল ﷺ তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেন এবং তাদের নাম বলে দেন।[৩৪১]

শিক্ষা:

মুনাফিকরা সব সময়ই এ সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, কখন কীভাবে নেতৃস্থানীয় লোকদের উপর আক্রমণ করা যায়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

----

৩৪১. মুসনাদে আহমাদ: ৫/৪৫৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৬/১৯৫

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

রাসূল ﷺ রজব মাসে তাবূকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ফিরে আসেন রমজান মাসে। এ সফরে মোট ৫০ দিন অতিবাহিত হয়। ৩০ দিন যাতায়াতে এবং ২০ দিন তাবূক প্রান্তরে।

রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনার ঘরে ঘরে ফিরে আসার সংবাদ পৌঁছে যায়। মহিলা ও শিশুরা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তারা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামগণকে স্বাগতম জানালেন ও সংগীত গাইছিলেন—

طلع البـدر علينا ** من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع

"সানায়াতুল অদা' থেকে আমাদের উপর পূর্নিমার চাঁদ উদিত হলো। আহ্বানকারীগণ যতক্ষণ আল্লাহ কে ডাকবেন, আমাদের উপর দায়িত্ব হলো শুকরিয়া আদায় করা।"
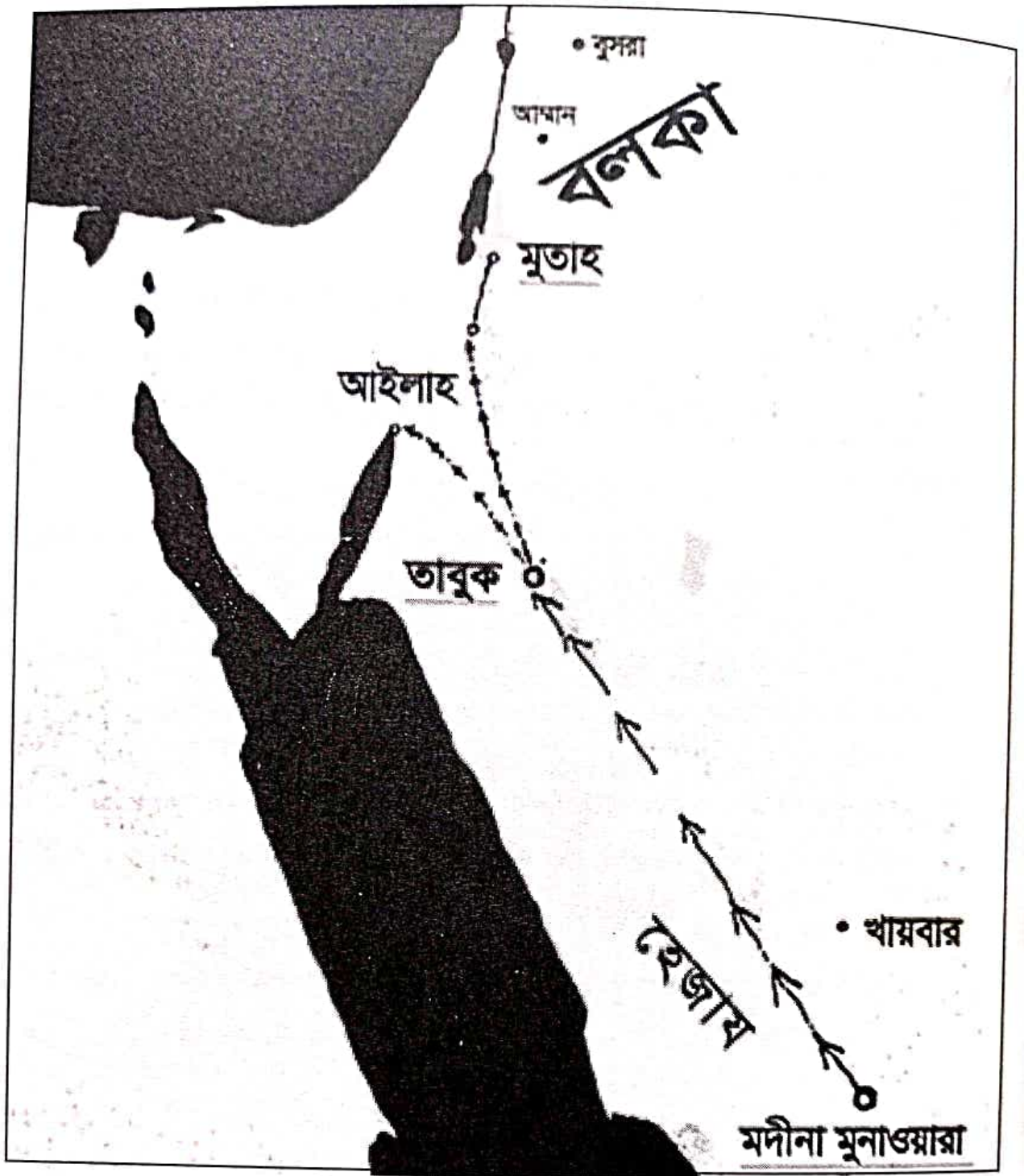
চিত্রঃ তাবূকের পথে

পেছনে থেকে যাওয়া

মুনাফিক ছাড়াও এ যুদ্ধের সময় তিনজন খাঁটি মুমিন পেছনে থেকে যান। কোনো কারণ ছাড়াই তাঁরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন। সহীহ বুখারীতে কা'ব ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ তাবূকের পথে রওয়ানা হলেন, সে সময় আমি আসবাব প্রস্তুত করছিলাম। ধারণা ছিলো, এক-দুদিন পর আসবাব প্রস্তুত হয়ে গেলে তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবো। কিন্তু দেরি হয়ে

গেলো। কাফেলা তখন অনেক দূরে চলে গেছে। মদীনায় তখন শুধু অক্ষম ও মুনাফিকরা ছিলো। এ দৃশ্য যখন আমি দেখতাম, অনেক দুঃখ অনুতাপ হতো। রাসূল ﷺ যখন মদীনায় ফিরে এলেন, মুনাফিকরা মিথ্যা ওযর দিতে লাগলো। রাসূল ﷺ বাহ্যিকভাবে তাদের ওযর গ্রহণ করলেন ও তাদের অন্তরের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত করলেন।

কা'ব ইবনে মালিক বলেন, আমি ঠিক করলাম সত্য ব্যতীত কোনো কিছু বলবো না। আমি রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমার থেকে ফিরে আছেন? আল্লাহর শপথ! আমি কোনো মুনাফিক নই। না আমার মাঝে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। না আমি দ্বীন থেকে ফিরে গেছি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তবে যুদ্ধ থেকে কেন বিরত ছিলে? কা'ব বললেন, মূলত আমার কোনো ওযর নেই। আমি অপরাধী। রাসূল ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি সত্য বলেছে। এখন তুমি যাও, হয়তো তোমার ব্যাপারে কোনো আয়াত নাযিল হবে। এমনিভাবে মুরারাহ ইবনে রাবী' রাযি., হেলাল ইবনে উমাইয়া রাযি. এসে অপরাধ স্বীকার করে নিলেন।

রাসূল ﷺ সে তিনজনের সাথে কথা-বার্তা না বলার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ প্রদান করলেন। ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদেরকে স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য লোক থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে পৃথিবী তাঁদের নিকট ভয়ানক আকার ধারণ করে। যমীন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যখন ৫০ দিন পূর্ণ হয় আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করেন−

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

"এবং অপর তিনজনের অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মূলতবী রাখা হয়েছিলো, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও

তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেলো এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি; যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, খুবই দয়াবান।"[৩৪২]

এ আয়াত নাযিল হলে সাধারণ মুসলিমগণ এবং সে তিনজন সাহাবী অত্যন্ত আনন্দিত হোন। লোকেরা দৌড়ে গিয়ে এ শুভ সংবাদ প্রচার করতে থাকেন। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাদের চেহারায় খুশির ছাপ দেখা যায়। আর তাঁরা দান-সদাকা করতে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষেই এ দিনটি ছিলো কাঙ্খিত পাওয়ার দিন।

শিক্ষা:

০১. জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে বিনা ওযরে তা থেকে পিছিয়ে থাকা জঘন্যতম অপরাধ।

০২. মুমিন আল্লাহকে ভয় করে, তাই কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। বরং নিজের অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে।

মুনাফিকদের কারসাজি

এ যুদ্ধে মুনাফিকরা তাদের আসল রূপ দেখাতে কোনো কসুর করেনি। তারা বিভিন্নভাবে মুসলিমদেরকে যুদ্ধ থেকে বাধা প্রদান করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা করা

মুসলিমগণ যখন দান-সদাকায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তখন মুনাফিকরা তাঁদেরকে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে খোঁচা দিয়ে চলছিলো। যারা কম দান করছিলেন বা কায়িক শ্রম ছাড়া আর কোনো কিছু করার সামর্থ রাখছিলেন না। তাঁদেরকে তারা বিদ্রুপ করে বলছিলো, একটা দুটো খেজুর দিয়ে তারা

৩৪২. সূরা তাওবা: ১১৮

রোমান সাম্রাজ্য জয় করতে চায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন–

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

"সে সমস্ত লোক ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলিমদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে আর তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই, শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। তারা বিদ্রুপ করে তাঁদেরকে। আর আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।"

মাসজিদে যিরার বিধ্বস্তকরণ

মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ষোলকলা পূর্ণ করার জন্য মাসজিদের নামে যে ঘরটি বানিয়েছিলো; তাতে তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ কে দাওয়াত করেছিলো। তাবূক যুদ্ধের ব্যস্ততার কারণে রাসূল ﷺ তাদেরকে তাবূকের পরের সময়টা নির্ধারণ করে দিলেন। কিন্তু ফেরার পথে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন–

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾

"আর যারা নির্মাণ করেছে মাসজিদ জেদের বশে এবং কুফরীর

তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকদের জন্য ঘাঁটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না; তবে যে মাসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই আপনার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক; যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।"[৩৪৩]

....

এরপর রাসূল ﷺ সাহাবাদের একটি জামাত পাঠিয়ে ঘরটি জ্বালিয়ে দেন।[৩৪৪]

শিক্ষা:

মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য কেউ যদি মুসলিমদের মতো ইবাদাতখানাও নির্মাণ করে; তবুও তা ধ্বংস করে দিতে হবে।

নাজ্জাশীর মৃত্যু

নাজ্জাশী তাবূক যুদ্ধের পর নবম হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। রাসূল ﷺ সাহাবাদের নিয়ে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

রাসূল ﷺ এর কন্যার মৃত্যু

রাসূল ﷺ এর কন্যা উম্মে কুলসুম তাবূক যুদ্ধের পরে মৃত্যুবরণ করেন। এতে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। উম্মে কুলসুম উসমান রাযি. এর স্ত্রী ছিলেন। রাসূল ﷺ উসমান রাযি. কে বলতেন, যদি আমার তৃতীয় আরেকটি কন্যা থাকতো; তাকেও আমি তোমার কাছে বিয়ে দিতাম।

---

৩৪৩. সূরা তাওবা: ০৭,০৮

৩৪৪. তাবূক যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ: ইবনে হিশাম: ২/৫১৫-৫৩৭ পৃ.; যাদুল মাআদ: ৩/২-১৩ পৃ.; সহীহ বুখারী: ২/৬৩৩-৬৩৭ পৃ.; ১/২৫২-৪১৪ পৃ.; ইমাম নাববীকৃত শরহে মুসলিম: ২/২৪৬; ফাতহুল বারী: ৮/১১০-১২৬ পৃ.; মুখতাসারুস সীরাহ: ৩৯১-৪০৭ পৃ.

প্রথম হাজ্ব পালন

নবম হিজরীর যুল কা'দাহ মাসে বা যিলহাজ্ব মাসে রাসূল ﷺ হাজ্বের বিধি-বিধান কায়েম করার জন্য আবু বকর রাযি. এর নেতৃত্বে মুসলিমদের একটি জামাত প্রেরণ করেন। এরপর সূরা তাওবা (যার অপর নাম বারাআত) নাযিল হয়। এতে মুশরিকদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য বলা হয়। তাই রাসূল ﷺ আলী রাযি. কে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। যেহেতু তখনকার মানুষদের নিকট চুক্তিকারী বা তার কোনো আত্মীয় চুক্তি রদ করলে; তবেই তা বাতিল হয়। তাই রাসূল ﷺ আলী রাযি. কে পাঠান। পথিমধ্যে আবু বকর রাযি. এর সাথে আলী রাযি. সাক্ষাৎ হয়।

আবু বকর রাযি. সকলকে নিয়ে হাজ্ব আদায় করেন। ১০ই যিলহাজ্ব আলী রাযি. জামরার নিকট দাঁড়িয়ে সমবেত লোকজনের নিকট রাসূল ﷺ এর ঘোষণা শুনালেন। এতে সকল মুশরিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। প্রত্যেককে চার মাস সময় দেওয়া হয়। যারা পূর্বে ঠিক মতো অঙ্গীকার পালন করেছিলো, তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অঙ্গীকার বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত শোনানো হয়। আবু বকর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ঘোষণা দেন, আগামী বছর থেকে মুশরিকরা কা'বায় হাজ্ব করতে পারবে না। উলঙ্গ কোনো ব্যক্তি কা'বা তাওয়াফ করতে পারবে না।[৩৪৫]

শিক্ষা:

০১. মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

০২. মুসলিমদেরকে সর্বদা কাফেরদের চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে থাকতে হবে। আর তারা যদি মুসলিমদের কাছে ঘেঁষতে চায়; তাহলে বুঝতে হবে তাতে খারাপ উদ্দেশ্য আছে।

---

৩৪৫. বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী: ১/২২০ ও ৪৫১; ২/৬২৬ ও ৬৭১ পৃ.; যাদুল মাআদ: ৩/২৫ ও ২৬ পৃ.; ইবনে হিশাম: ২/৫৪৩-৫৩৬ পৃ.; সূরা তাওবার তাফসীর: প্রথম অংশ

তৃতীয় পর্যায়ঃ

বিভিন্ন গোত্রের মদীনায় আগমন ও ইসলাম গ্রহন

রাসূল ﷺ এর নিকট আগত প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ৭০ এরও অধিক। কিন্তু এখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি দলসমূহের আলোচনা তুলে ধরা হলো। এর মধ্যকার কিছু কিছু প্রতিনিধি দল মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মদীনায় আগমন করেছে।

০১. আব্দুল কায়সের প্রতিনিধি দলঃ পঞ্চম হিজরী কিংবা তারও পূর্বে এবং নবম হিজরীতে তারা মদীনায় রাসূল ﷺ এর নিকট আগমন করেন। প্রথমবার ঐ গোত্রের মুনকিজ ইবনে হাইয়ান নামক এক ব্যক্তি বাণিজ্যের জন্য মদীনায় এসে ইসলামের কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার নিজ গোত্রসহ এসে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন ।

০২. দাউস গোত্রের প্রতিনিধি দলঃ সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে এ দলটি মদীনায় আগমন করেন। রাসূল ﷺ তখন খায়বারে ছিলেন। এ গোত্রের নেতা আমর দাউসি পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। অতঃপর তিনি নিজ গোত্রের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেন। তারা নানা ছলচাতুরী করে ইসলাম কবুলে বিলম্ব করছিলো বিধায় তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য বদদুআ করার আবেদন করেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের জন্য হিদায়াতের দুআ করলেন। এর ফলে তাদের ৭০ বা ৮০ টি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে।

০৩. ফারওয়াহ ইবনে আমর জুযামীর সংবাদ বহনঃ ফারওয়াহ ছিলেন রোমক সেনাবাহিনীর একজন আরব সেনাপতি। তাঁকে সীমান্তে আরব অঞ্চলগুলোর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিলো। মুতার যুদ্ধে তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে তাঁদের বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ নিকট তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রেরণ করেন। রোমীয়রা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেরে তাঁকে বন্দী করে। এরপর তাঁকে মৃত্যু অথবা

ইসলাম ত্যাগের জন্য তৈরি হতে বললো। তিনি মৃত্যুকেই বেছে নিলেন। ফিলিস্তিনে আফরা নামক একটি ঝর্ণার শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে তাঁকে শহীদ করা হয়।[৩৪৬]

০৪. সুদা প্রতিনিধি দল: রাসূল ﷺ জিরানা হতে প্রত্যাবর্তনের পর অষ্টম হিজরীতে এ প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়। তাদের উপস্থিত হওয়ার কারণ হলো, রাসূল ﷺ ৪০০ সৈন্যের একটি বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। তাদের মধ্য হতে যিয়াদ ইবনে হারিস তা জানতে পেরে দ্রুত রাসূল ﷺ এর নিকট হাজির হয়ে তার গোত্রের লোকদের জামিন হয়। ফলে রাসূল ﷺ দ্রুত সেনা প্রত্যাহার করেন। অতঃপর তাদের ১৫ জনের একটি দল এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মক্কা বিজয়ের দিন এ গোত্রের ১০০ জন লোক রাসূল ﷺ এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা:

তরবারি হক্ব বুঝতে সহায়তা করে। দম্ভ-অহমিকা ঝেড়ে বিনম্র হতে শেখায়।

---

০৫. কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবী সালমার আগমন: তিনি আরবের অভিজাত বংশের একজন কবি ছিলেন। রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে তিনি মিথ্যা রটাতেন। এদিকে রাসূল ﷺ তায়েফ যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তার নিকট তার ভাই বুযাইর ইবনে যুহাইর এ মর্মে পত্র লেখেন যে, রাসূল মক্কায় কিছু কুৎসা রটনাকারীদেরকে হত্যা করেছেন। অন্যরা যে যেখানে পেরেছে আত্মগোপন করেছে। তাই রক্ষা পেতে হলে রাসূল ﷺ এর দরবারে গিয়ে মাফ চাও। তাওবা করলে তিনি মাফ করে দেবেন। অতঃপর তিনি মদীনায় আগমন করেন এবং ফজরের সালাত আদায় করেন। নামাজ শেষেই তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

০৬. উযরাহ প্রতিনিধি দল: এরা নবম হিজরীতে মদীনায় আগমন করেন। তাঁরা ছিলেন ১২ জন। তাঁদের মাঝে হামযাহ ইবনে নু'মানও ছিলেন। তাঁরা

---

৩৪৬. যাদুল মাআদ: ৩/৪৫

ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কয়েক দিন অবস্থান করে নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যান।

০৭. বালী প্রতিনিধি দল: নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তাঁরা মদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

০৮. সাকীফ প্রতিনিধি দল: তাবূক থেকে রাসূল ﷺ এর প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর রমজান মাসে তারা রাসূলের নিকট আগমন করে। অষ্টম হিজরীর যুল কা'দাহ মাসে রাসূল ﷺ তায়েফ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের নেতা উরওয়াহ ইবনে মাসউদ সাকাফী ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আশা করছিলেন, তার কওমের লোকেরা তাঁকে অনেক সম্মান করে বিধায় ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা সহজেই কবুল করবে। কিন্তু তারা দাওয়াত কবুল না করে উরওয়াহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে হত্যা করে। অতঃপর তারা আশপাশের ইসলাম গ্রহণকারী দলগুলোর শক্তির সাথে টিকতে পারবে না ভেবে মদীনায় প্রতিনিধি দল পাঠায়। এ প্রতিনিধি দল ফিরে এসে জানায়, তারা ব্যভিচার, মদ, সুদ ত্যাগ না করলে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করবে। তারা তিন দিন পর্যন্ত জাহেলী যুগের গোঁ ধরে বসে থাকে। কিন্তু পরে তারা সকলে ইসলাম কবুল করে। রাসূল ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. এর নেতৃত্বে একদল সাহাবী পাঠিয়ে দিলেন। যেন তাদের মূর্তিকে ভেঙে ফেলা হয়।

০৯. ইয়ামান সম্রাটের পত্র: রাসূল ﷺ তাবূক হতে ফেরার পর হিমইয়ার সম্রাটগণের পত্র আসে। তাঁরা পত্রে তাঁদের ইসলাম গ্রহণ এবং শিরক-কুফরী থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের পত্রের জবাবে কিছু সন্ধি-শর্তসহকারে পত্র প্রেরণ করেন। অধিকন্তু রাসূল ﷺ মুআয ইবনে জাবাল রাযি. এর নেতৃত্বে কয়েকজন সাহাবীকে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য ।

১০. হামদান প্রতিনিধি দল: তাবূক থেকে ফিরে আসার পর নবম হিজরীতে রাসূল ﷺ এর খেদমতে এ প্রতিনিধি দল হাজির হয়। প্রথমে তাদের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বাকিদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ খালিদ রাযি. কে পাঠান। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। অতঃপর আলী

রাযি. কে প্রেরণ করার পর তিনি তাদের দাওয়াত দেন। একপর্যায়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আলী রাযি. এর নিকট থেকে তাদের ইসলামের সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ খুশিতে সিজদায় নত হয়ে পড়েন।

১১. বনু ফাযারার প্রতিনিধি দল: তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীতে এ প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো ১০ জন। তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

১২. নাজরানের প্রতিনিধি দল: মক্কা হতে ইয়ামানের দিকে যাওয়ার পথে ৭৩ পল্লীবিশিষ্ট একটি অঞ্চল ছিলো। এ অঞ্চলে এক লক্ষ খ্রিস্টান পুরুষ যোদ্ধা ছিলো। নাজরানের প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করে নবম হিজরীতে। তাদের সদস্য সংখ্যা ছিলো ৬০ জন। এর মধ্যে ২৪ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। যার মধ্যে ৩ জন ছিলো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মদীনায় পৌঁছার পর তারা রাসূল ﷺ কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকে। তারপর তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হলে তারা কবুল না করে ঈসা আ. সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তারা রাসূলের উত্তর মেনে নিতে না পারায় রাসূল ﷺ তাদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করেন। রাসূল ﷺ এর প্রস্তুতি দেখে তারা পরামর্শ করে ঈসা আ. সম্পর্কিত রাসূলের উত্তর মেনে নেয়। তিনি তাদের কাছ থেকে কর আদায়ের অঙ্গীকার নেন। দু'হাজার জোড়া কাপড় প্রদানের সন্ধিও হয় তাদের সাথে। যার এক হাজার জোড়া রজব মাসে ও এক হাজার জোড়া সফর মাসে দেবে। তাছাড়া প্রত্যেক জোড়া কাপড়ের সাথে এক উকিয়া স্বর্ণও দেবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। তাদের থেকে কর আদায়ের জন্য রাসূল ﷺ উম্মতের আমানতদার আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি. কে প্রেরণ করেন।

১৩. বনু হানিফার প্রতিনিধি দল: নবম হিজরীতে তারা মদীনায় আগমন করে। মুসাইলামাতুল কাযযাবসহ এ দলের লোক সংখ্যা ছিলো ১৭ জন।[৩৪৭] এ দলটি এক আনসারী সাহাবীর বাড়িতে আশ্রিত ছিলো। তারা সকলে রাসূলের কাছে এসে ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু মুসাইলামার ব্যাপারে ভিন্ন বর্ণনা আছে যে, সে আত্মঅহমিকার কারণে রাসূল ﷺ এর কাছে আসেনি। রাসূল ﷺ অত্যন্ত নম্র আচরণের মাধ্যমে তার মনোতুষ্টির চেষ্টা করলেন।

---

৩৪৭. ফাতহুল বারী: ৮/৮৭

কিন্তু তার উদ্ভট কথাবার্তা এবং তার ব্যাপারে একটি স্বপ্ন দেখায় রাসূল ﷺ পরে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। অতঃপর সে ইয়ামামায় গিয়ে এই দাবি করে যে, তাকে রাসূল ﷺ এর সাথে নবুওয়াতী কাজে শরীক করা হয়েছে। মুসাইলামাতুল কাযযাব দশম হিজরীতে নবুওয়াতের দাবি করে। আবু বকর রাযি. এর খেলাফত কালে দ্বাদশ হিজরীর রবিউল আওয়ালে তাকে হত্যা করা হয়।

১৪. বনু আমির ইবনে সা'সার প্রতিনিধি দল: এ দলের মধ্যে ছিলো আল্লাহর শত্রু আমির ইবনে তুফাইল, লাবীদের বৈমাত্রেয় ভাই আরবাদ ইবনে কায়স, খালিদ ইবনে জাফর এবং জাব্বার ইবনে আসলাম। আমির ইবনে তুফাইল ছিলো সেই লোক যে বীরে মাউনায় ৭০ জন সাহাবাকে শহীদ করেছিলো। তারা মদীনায় আগমন করে রাসূল ﷺ কে হত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেফাজত করেছেন। রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছেন।

১৫. তুজাইব প্রতিনিধি দল: এ দলের লোক সংখ্যা ছিলো ১৩ জন। তারা কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। তারা রাসূল ﷺ কে কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করে। তিনি সাহাবাদেরকে সেগুলো লিখে দিতে বলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে কিছু উপঢৌকন দান করেন। এরা দশম হিজরীতে বিদায় হাজ্বের সময় দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাত করে।

১৬. ত্বাই প্রতিনিধি দল: এ দলে আরবের প্রসিদ্ধ ঘোড়সওয়ার যায়দুল খাইলও ছিলেন। তাঁরা রাসূল ﷺ এর সাথে কথাবার্তা বলেন। তখন তিনি তাঁদের কাছে ইসলাম পেশ করলে তাঁরা তা গ্রহণ করে অনেক ভালো মুসলমান হয়ে যান। এ সময় রাসূল ﷺ যাইদুল খাইল এর নাম রাখেন যাইদুল খাইর।

এমনিভাবে নবম ও দশম হিজরীতে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করতে থাকে। সর্বশেষ 'নাখ' এর দলটিই একাদশ হিজরীর মুহাররম মাসে এসেছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো ২০০ জন।

ঐসব প্রতিনিধি দলের আগমন ধারা থেকেই বুঝা যায়, সে সময় ইসলামী দাওয়াত কতটা বিস্তার লাভ করেছিলো এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম কতটা

স্বীকৃতি অর্জন করেছিলো।

যতদূর পর্যন্ত মক্কা, মদীনা, সাকীফ, ইয়ামান ও বাহরাইনের অধিকাংশ শহরের অধিবাসীদের সম্পর্ক বিস্তৃত ছিলো; তাদের মধ্যে ইসলাম পূর্ণরূপে পরিপক্কতা লাভ করেছিলো এবং তাঁদের মধ্য হতেই প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এবং নেতৃস্থানীয় মুসলিমগণের আবির্ভাব ঘটেছিলো।

শিক্ষাঃ

০১. জিহাদ ব্যতীত কখনো ইসলামের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করে না।

০২. মুসলিম জাতি যখন জিহাদ করে বিজয়ী বেশে থাকবে; অপর জাতিসমূহ তখন একে একে মুসলিমদের অধীনে এসে সত্যকে মেনে নেবে।

০৩. দুর্বল জাতির আদর্শ কেউ মেনে নিতে চায় না।

০৪. ইসলামের আগমনই হয়েছে, তা অপর সব দ্বীনের উপর গালিব থাকবে; আর জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম সদা-সর্বদা গালিব তথা বিজয়ী থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গযওয়াসমূহ

(অর্থাৎ যেসব যুদ্ধে তিনি স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন)

ক্রমিক নং	গযওয়ার নাম	সংঘটনের সন	সৈন্য সংখ্যা
০১.	গযওয়ায়ে আবওয়া বা অদ্দান	২রা সফর ২য় হিজরী	৭০ জন মুহাজির
০২.	গযওয়ায়ে বুওয়াত্ব	রবিউল আওয়াল ২য় হিজরী	২০০ জন
০৩.	গযওয়ায়ে সাফওয়ান	রবিউল আওয়াল ২য় হিজরী	৭০ জন
০৪.	গযওয়ায়ে যুল উশাইরাহ	জুমাদাল উলা ২য় হিজরী	১৫০/২০০ জন মুহাজির
০৫.	গযওয়ায়ে বদর আল কুবরা	১৭ই রমজান ২য় হিজরী	৩১৩/৩১৪/৩১৭ জন
০৬.	গযওয়ায়ে বনু সুলাইম	শাওয়াল ২য় হিজরী	২০০ জন
০৭.	গযওয়ায়ে বনু কাইনুকা'	শাওয়াল ২য় হিজরী	
০৮.	গযওয়ায়ে সাভীক	যুলহিজ্জাহ ২য় হিজরী	২০০ জন
০৯.	গযওয়ায়ে যু-আমর	মুহাররম ৩য় হিজরী	৪০০ জন
১০.	গযওয়ায়ে বুহরান (নাজরান)	রবিউল আখের ৩য় হিজরী	৩০০ জন
১১.	গযওয়ায়ে উহুদ	১১ই শাওয়াল ৩য় হিজরী	৭০০ জন

১২.	গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ	১৬ই শাওয়াল ৩য় হিজরী	উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাগণ
১৩.	গযওয়ায়ে বনু নাযীর	রবিউল আউয়াল ৪র্থ হিজরী	
১৪.	গযওয়ায়ে যাতুর রিকা' (নাজদ যুদ্ধ)	৪র্থ হিজরী (বুখারীর বর্ণনা মতে ৭ম হিজরী)	৪০০/৭০০ জন
১৫.	গযওয়ায়ে বদর আস-সুগরা	শা'বান ৪র্থ হিজরী	১৫০০ জন
১৬.	গযওয়ায়ে দুমাতুল জান্দাল	রবিউল আউয়াল ৫ম হিজরী	১০০০ জন
১৭.	গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দক)	শাওয়াল ৫ম হিজরী	৩০০০ জন
১৮.	গযওয়ায়ে বনু কুরাইযাহ	যুলকা'দাহ ৫ম হিজরী	প্রায় ৩০০০ জন
১৯.	গযওয়ায়ে বনু লাহ্ইয়ান	রবিউল আউয়াল/ জুমাদাল উলা ৬ষ্ঠ হিজরী	২০০ জন
২০.	গযওয়ায়ে বনু মুসতালিক বা মুরাইসী	শা'বান ৫ম/৬ষ্ঠ হিজরী	
২১.	গযওয়ায়ে হুদাইবিয়াহ	যুলকা'দাহ ৬ষ্ঠ হিজরী	১৪০০/১৫০০ জন
২২.	গযওয়ায়ে যু-কারাদ বা গাবাহ	৬ষ্ঠ হিজরীর মাঝামাঝি/৭ম হিজরীর শুরু	৫০০ জন

২৩.	গযওয়ায়ে খায়বার	মুহাররম ৭ম হিজরী	১৪০০ জন
২৪.	গাযওয়ায়ে মুতা[১]	জুমাদাল উলা ৮ম হিজরী	৩০০০ জন
২৫.	গযওয়ায়ে ফাতহে মক্কা	রমজান ৮ম হিজরী	১০ হাজার
২৬.	গযওয়ায়ে হুনাইন	শাওয়াল ৮ম হিজরী	১২ হাজার
২৭.	গযওয়ায়ে তায়েফ	শাওয়াল ৮ম হিজরী	প্রায় ১২ হাজার
২৮.	গযওয়ায়ে তাবূক	রজব ৯ম হিজরী	৩০ হাজার

১. যদিও এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন না; তবুও এ যুদ্ধকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম গযওয়া হিসেবে গণনা করেন। এর উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুতা'র যুদ্ধের অবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সরাসরি দেখিয়েছেন। আর তিনি তা মদীনায় বসে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণের সামনে বর্ণনা করেছিলেন। পরিস্থিতি এমনই মনে হচ্ছিলো, যেন তিনি স্বয়ং এ যুদ্ধে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত সারিয়্যাহসমূহ

(যেসব যুদ্ধে/অভিযানে তিনি স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেননি। বরং সাহাবায়ে কেরামদের প্রেরণ করেছেন)

ক্রমিক সংখ্যা	সারিয়্যাহগুলোর নাম	সংঘটনের সময়	সৈন্য সংখ্যা
০১.	সারিয়ায়ে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি. (সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী)	রমজান ১ম হিজরী	৩০ জন
০২.	সারিয়ায়ে উবাইদা ইবনে হারিস রাযি. (সারিয়ায়ে রাবিগ)	শাওয়াল ১ম হিজরী	৬০ জন
০৩.	সারিয়ায়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. (সারিয়ায়ে খাররার)	যুলকা'দাহ ১ম হিজরী	২০ জন
০৪.	সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযি.	জুমাদাল উখরা ২য় হিজরী	১০০ জন
০৫.	সারিয়ায়ে উমায়ের ইবনে আদী রাযি.	২৪ শে রমজান ২য় হিজরী	১ জন
০৬.	সারিয়ায়ে সালেম ইবনে ওমায়ের রাযি.	শাওয়াল ২য় হিজরী	১ জন
০৭.	সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি.	১৪ই রবিউল আওয়াল ৩য় হিজরী	৫ জন
০৮.	সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি.	জুমাদাল উখরা ৩য় হিজরী	১০০ জন

০৯.	সারিয়ায়ে আবু সালামাহ রাযি.	মুহাররম ৪র্থ হিজরী	১৫০ জন
১০.	সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি.	মুহাররম ৪র্থ হিজরী	১ জন
১১.	সারিয়ায়ে আসেম ইবনে সাবেত রাযি. (রাযী'র ঘটনা)	সফর ৪র্থ হিজরী	১০ জন
১২.	সারিয়ায়ে মুনযির ইবনে আমর আস-সাঈদী রাযি. (বীরে মাউনার ঘটনা)	সফর ৪র্থ হিজরী	৭০ জন
১৩.	সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসা রাযি.	রমজান ৪র্থ হিজরী	
১৪.	সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ রাযি.	শাওয়াল ৪র্থ হিজরী	৩০ জন
১৫.	সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাযি.	যুলকা'দাহ/ যুলহিজ্জাহ ৫ম হিজরী	০৫ জন
১৬.	সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি.	১০ই মুহাররম ৬ষ্ঠ হিজরী	৩০ জন
১৭.	সারিয়ায়ে উক্কাশা মিহসান রাযি. (গাম্রের অভিযান)	রবিউল আওয়াল/ আখের ৬ষ্ঠ হিজরী	৪০ জন
১৮.	সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি. (যুল-কাস্সাহ'র ১ম অভিযান)	রবিউল আওয়াল ৬ষ্ঠ হিজরী	১০ জন

১৯.	সারিয়ায়ে আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাযি. (যুল-কাস্‌সাহ'র ২য় অভিযান)	রবিউল আখের ৬ষ্ঠ হিজরী	৪০ জন
২০.	সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. (জামূম অভিযান)	রবিউল আখের ৬ষ্ঠ হিজরী	
২১.	সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. (ঈস অভিযান)	জুমাদাল উলা ৬ষ্ঠ হিজরী	১৭০ জন
২২.	সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. (ওয়াদিল কুরা অভিযান)	রজব ৬ষ্ঠ হিজরী	১২ জন
২৩.	সারিয়ায়ে আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি. (খাবাত অভিযান)	(হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে) ৬ষ্ঠ হিজরী	৩০০ জন
২৪.	সারিয়ায়ে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. (দিয়ারে বনু কালব অভিযান)	শা'বান ৬ষ্ঠ হিজরী	৭০০ জন
২৫.	সারিয়ায়ে আলী রাযি. (ফাদাক অভিযান)	শা'বান ৬ষ্ঠ হিজরী	২০০ জন
২৬.	সারিয়ায়ে আবু বকর রাযি./যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাযি. (ওয়াদিল কুরা অভিযান)	রমজান ৬ষ্ঠ হিজরী	

২৭.	সারিয়ায়ে কুরয্ ইবনে জাবির ফিহরী রাযি. (উরানিয়্যীন অভিযান)	শাওয়াল ৬ষ্ঠ হিজরী	২০ জন
২৮.	সারিয়ায়ে আমর ইবনে ওমায়ের যামরী রাযি.	৬ষ্ঠ হিজরী	
২৯.	সারিয়ায়ে আবান ইবনে সাঈদ রাযি.	সফর ৭ম হিজরী	
৩০.	সারিয়ায়ে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. (তুরাবাহ অভিযান)	শা'বান ৭ম হিজরী	৩০ জন
৩১.	সারিয়ায়ে আবু বকর সিদ্দীক রাযি.	শা'বান ৭ম হিজরী	
৩২.	সারিয়ায়ে বাশীর ইবনে সা'দ রাযি. (ফাদাক অভিযান)	শা'বান ৭ম হিজরী	৩০ জন
৩৩.	সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ লাইসী রাযি. (মাইফাআহ অভিযান)	রমজান ৭ম হিজরী	১৩০ জন
৩৪.	সারিয়ায়ে বশীর ইবনে সা'দ রাযি. (ইয়ামান ও জাবার অভিযান)	শাওয়াল ৭ম হিজরী	৩০০ জন
৩৫.	সারিয়ায়ে আখরাম সুলামী রাযি.	যুলহিজ্জাহ ৭ম হিজরী	৫০ জন

৩৬.	সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ আস-লাইসী রাযি.	৮ম হিজরী	১৫ জন
৩৭.	সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ আস-লাইসী রাযি.	সফর ৮ম হিজরী	২০০ জন
৩৮.	সারিয়ায়ে শুজা' ইবনে ওহাব রাযি.	রবিউল আওয়াল ৮ম হিজরী	২৪ জন
৩৯.	সারিয়ায়ে কা'ব ইবনে উমায়ের রাযি.	রবিউল আওয়াল ৮ম হিজরী	১৫ জন
৪০.	সারিয়ায়ে কা'ব ইবনে উমায়ের রাযি.[২]	রবিউল আওয়াল ৮ম হিজরী	১৫ জন
৪১.	সারিয়ায়ে আমর ইবনুল আস রাযি. (যাতুস সালাসিল অভিযান)	জুমাদাল উখরা ৮ম হিজরী	৩০০ জন
৪২.	সারিয়ায়ে আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহ রাযি.	রজব ৮ম হিজরী	৩০ জন
৪৩.	সারিয়ায়ে আমর ইবনে মুর্‌রা আল জুহানী রাযি.	রজব ৮ম হিজরী	
৪৪.	সারিয়ায়ে আবু কাতাদাহ রাযি. (খাযিরাহ অভিযান)	শা'বান ৮ম হিজরী	১৫ জন
৪৫.	সারিয়ায়ে আবু কাতাদাহ রাযি.	শা'বান ৮ম হিজরী	৮ জন
৪৬.	সারিয়ায়ে উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.	রমজান ৮ম হিজরী	

২. ৩৯ ও ৪০ নং-এ বর্ণিত সারিয়্যাহদ্বয় পৃথকভাবে সংঘটিত দু'টি সারিয়্যাহ

৪৭.	সারিয়ায়ে সা'দ ইবনে যায়েদ আল আশহালী রাযি.	রমজান ৮ম হিজরী	২০ জন
৪৮.	সারিয়ায়ে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি.	রমজান ৮ম হিজরী	৩০ জন
৪৯.	সারিয়ায়ে আমর ইবনে আস রাযি.	রমজান ৮ম হিজরী	
৫০.	সারিয়ায়ে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি.	রমজান/শাওয়াল ৮ম হিজরী	৩৫০ জন
৫১.	সারিয়ায়ে আবু আমের উবায়েদ আল আশহারী রাযি.	শাওয়াল ৮ম হিজরী	
৫২.	সারিয়ায়ে তুফাইল ইবনে উমর ওয়াহেলী রাযি.	শাওয়াল ৮ম হিজরী	
৫৩.	সারিয়ায়ে কায়স ইবনে সা'দ রাযি.	যুলকা'দাহ ৮ম হিজরী	৪০০ জন
৫৪.	সারিয়ায়ে খালীদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি.	যুলকা'দাহ ৮ম হিজরী	
৫৫.	সারিয়ায়ে উয়াইনা ইবনে হিস্ন ফাযারী রাযি.	মুহার্‌রম ৯ম হিজরী	৫০ জন
৫৬.	সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আউসাজাহ রাযি.	সফর ৯ম হিজরী	
৫৭.	সারিয়ায়ে কুতবা ইবনে আমের আনসারী রাযি.	সফর ৯ম হিজরী	২০ জন
৫৮.	সারিয়ায়ে যাহ্‌হাক ইবনে সুফয়ান ক্বিলাবী রাযি.	সফর ৯ম হিজরী	

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র

রাসূল ﷺ এর ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধাস্ত্রের নামঃ

তরবারিঃ ০১. মাছুর, ০২. আল আযব, ০৩. যুলফিকার, ০৪. আল কালঈ, ০৫. আল বাত্তার, ০৬. আল হাতফ, ০৭. আল মিখযাম, ০৮. আর-রাসূব, ০৯. আল কাযীব, ১০. আস-সমসমা, ১১. আল-লাহীফ।

লৌহবর্মঃ ০১. যাতুল ফুযুল, ০২. যাতুল বিশাহ, ০৩. যাতুল হাওয়াশী, ০৪. আস-সাদিয়া, ০৫. ফিদ্দাহ, ০৬. আল বাতরা, ০৭. আল খারীক।

কামান বা ধনুকসমূহের নামঃ ০১. আয-যাউরা, ০২. আর-রাউহা, ০৩. আস-সাফরা, ০৪. শাউহাত্ব, ০৫. আল-কাতুম, ০৬. আস-সাদাদ।

তুনীরঃ আল কাফূর ও আল জাম্উ।

ঢালসমূহের নামঃ ০১. আয-যালুক, ০২. আল ফুতাক, ০৩. আল মূজিয, ০৪. আয-যাকান।

বর্শাসমূহের নামঃ ০১. আল মুছবী, ০২. আল মুছনী, ০৩. আল বাইদা, ০৪. আল আনযাহ, ০৫. আস্-সাগা।

শিরস্ত্রানের নামঃ ০১. যাস্সাবূগ, ০২. আল মূশাহ।

বিদায় হাজ্ব

দশম হিজরীতে রাসূল ﷺ হাজ্বে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং বললেন, যে তাঁর সফরের সঙ্গী হতে চায়, সে যেন আগমন করে। ফলে আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে শুরু করেন। রাসূল ﷺ যুল কা'দাহ মাসের চারদিন বাকি থাকতে শনিবার দিন মক্কার দিকে রওয়ানা করেন। যোহরের পরে রওয়ানা করে আসরের পূর্বে যুল-হুলাইফাতে পৌঁছেন। সেখানে সারা রাত অবস্থান করে পরদিন যোহরের পূর্বে ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করেন। আয়েশা রাযি. তাঁর শরীর ও মাথায় সুগন্ধি মেখে দেন। তিনি তা না ধুয়ে রেখে দিলেন। তারপর যোহরের নামাজ আদায় করেন। নামাজের স্থান থেকে তিনি উমরাহ ও হাজ্বের নিয়তে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেন। বাহিরে এসে উটের উপর উঠার সময় দ্বিতীয়বার তালবিয়া পাঠ করেন। তারপর মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন।

যুলহিজ্জাহ মাসের চার তারিখ রবিবার তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। মধ্যম গতিতে পথ চলায় পথে আট রাত কেটে যায়। মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করেন। তারপর সাফ-মারওয়া সাঈ করে উমরাহ সম্পন্ন করলেন। তবে তিনি হাজ্বে কেরানের নিয়ত করায় ইহরাম ভঙ্গ করেননি। তাই ঘোষণা দেন, যে সকল সাহাবী সাথে হাদয়ী (কুরবানীর পশু) আনেনি, তারা যেন উমরাহ করে হালাল হয়ে যায়। কিন্তু সাহাবীগণ ইতস্তত করতে থাকলে তিনি বললেন, হাদয়ী না থাকলে আমি নিজেই হালাল হয়ে যেতাম। এ কথা শ্রবণের পর সাহাবীগণ হালাল হয়ে গেলেন।

যুলহিজ্জাহ মাসের আট তারিখে তালবিয়ার দিন রাসূল ﷺ মিনায় গমন করেন। সেখানে নয় তারিখ সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। এবং যোহর থেকে পরদিন ফজরের নামাজ পর্যন্ত আদায় করেন। তারপর সূর্যোদয়ের পর আরাফার দিকে রওয়ানা করেন। সূর্য ঢলে পড়ার পর তিনি বাতনে ওয়াদীতে একটি ভাষণ প্রদান করেন। তখন সেখানে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন–

হে সমবেত মানুষ! আমার কথা শোনো, জানি না এ বছরের পরে তোমাদের সাথে এ স্থানে একত্রিত হবো কিনা?[৩৪৮] আজকের দিন, এই মাস, এই শহর

---

৩৪৮. ইবনে হিশাম: ২/৬০৩

যেরকম পবিত্র তেমনি তোমাদের একের সম্পদ অন্যের জন্য হারাম। শুনে রাখো! জাহেলী যুগের প্রত্যেক কুসংস্কার আমার পদতলে পিষ্ট। জাহেলী যুগের শোনিত খেসারতের আজ সমাপ্তি হলো। আমাদের রক্তের মধ্যে আমি প্রথমে রবীআহ ইবনে হারিসের ছেলের রক্তকে নিঃশেষ করছি। সে বনু সা'দ গোত্রে দুধ পান করেছিলো; তখন তাকে হুযাইল গোত্র হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদ প্রথার আজ থেকে অবসান হলো। আর সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ শেষ করছি। এখন থেকে সুদের সকল কাজ-কারবার বন্ধ।

মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আল্লাহর দেওয়া কালেমার মাধ্যমে তোমরা তাদের হালাল করেছো। তাদের কাছে তোমাদের প্রাপ্য হলো, তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় কোনো ব্যক্তিকে (তোমাদের ছেড়ে অন্য কাউকে) বিছানায় আনবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হলো, তোমরা তাদেরকে সঠিকভাবে ভরণপোষণ দেবে।

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে, ততদিন পর্যন্ত কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হচ্ছে– আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"

হে মানুষ সকল! তোমরা আমার কথা শুনে নাও, বুঝে নাও। তোমরা জেনে রেখো, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাই কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল তাই, যা তার ভাই সন্তুষ্টচিত্তে তাকে দেবে; অন্যথা তা হালাল নয়। তাই তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করো না। হে আল্লাহ! আমি কি আপনার বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি।

সমবেত কণ্ঠস্বরে উপস্থিত লোকজন তখন বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।[৩৪৯]

---

৩৪৯. সহীহ মুসলিম: ২/৮৮৬ (১২১৮ নং হাদীস)

রাসূল ﷺ এর বানীসমূহ রাবীআহ ইবনে উমাইয়া ইবনে খালাফ রাযি. উচ্চস্বরে লোকজনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন।[৩৫০] রাসূল ﷺ এর ভাষণের পর আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন–

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[৩৫১]

এরপর রাসূল ﷺ সকলকে নিয়ে যোহর ও আসরের নামাজ আদায় করলেন। সেখান থেকে রাসূল ﷺ মুযদালিফায় গমন করেন। সেখানে মাগরিব ও ইশার নামাজ একত্রে আদায় করলেন। ফজরের নামাজ এখানে আদায় করে মাশআরে হারামে দুআ ও তাকবীর-তাহলীলের মাধ্যমে কাটালেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। এরপর তিনি জামআয়ে কুবরায় গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি কোরবানীর স্থানে এসে নিজ হাতে কোরবানী করলেন ৬৩ টি উট। সাথে আনা বাকি ৩৭ টি উট আলী রাযি. কে যবেহ করতে দিয়ে তাঁকে নিজ কোরবানীর সাথে একত্রিত করলেন।

এরপর মক্কায় গমন করে তাওয়াফে ইফাযা পালন করেন। ১০ তারিখে সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে রাসূল ﷺ একটি ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে পূর্বের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি হয়।[৩৫২]

এরপর রাসূল ১৩ ,১২ ,১১ ﷺই যুলহিজ্জাহ মিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হাজ্বের নিয়ম-কানুন পালন করছিলেন। এবং লোকজনকে শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাছাড়া তিনি ইবরাহীম আ. এর সুনান প্রতিষ্ঠা

৩৫০. ইবনে হিশাম: ২/৬০৫
৩৫১. সূরা মায়েদাহ: ০৩
৩৫২. আবু দাউদ: ১/২৭০

করছিলেন এবং শিরকের নিশানগুলো নিশ্চিহ্ন করছিলেন। রাসূল ﷺ আইয়ামে তাশরীকেও ভাষণ প্রদান করেন।

আইয়ামে তাশরীকের শেষে তিনি মিনা হতে রওয়ানা হোন। ওয়াদীয়ে আবতাহ এর খাইফে বনু কিনানাহতে অবস্থান করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় ও রাতে ইশার নামাজ আদায় করে কিছুক্ষণ ঘুমান। তারপর সাওয়ারিতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহতে গমন করে তাওয়াফে বিদা আদায় করেন। সকল মানুষ যখন হাজ্ব আদায় করেন, তখন তিনি নিজ সওয়ারিকে মদীনার অভিমুখী করে রওয়ানা করেন।[৩৫৩]

শিক্ষাঃ

০১. কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরলে পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া এ পথের নির্দেশনাগুলোই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

০২. সমস্ত মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। তাই কেউ কারো উপর জুলুম করতে পারে না।

সর্বশেষ সামরিক অভিযান

রোমান সম্রাটদের শাসনাধীনে কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জান-মাল সবকিছু বিপদাপন্ন হয়। যেমন, মাআনের রোমান শাসনাধীন শাসক ফারওয়াহ ইবনে আমর জুযামীর এর সঙ্গে যেমনটি আচরণ করেন। রাসূল ﷺ একাদশ হিজরীর সফর মাসে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. এর নেতৃত্বে তাঁদেরকে বালকা এবং দারুমের ফিলিস্তিন আবাসভূমিতে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিলো, রোমানদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করা এবং এ অঞ্চলে বসবাসরত আরব গোত্রসমূহের স্থিতি অবস্থা যেন বহাল থাকে।

৩৫৩. সহীহ বুখারী: বিদায় হাজ্বের বিস্তারিত বিবরণ, মানাসিক অধ্যায়ঃ ১ম খণ্ড ও ২/৬৩১; সহীহ মুসলিম: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাজ্ব অধ্যায়। ফাতহুল বারী: ৩/মানাসিক পর্ব: ৮/১০৩-১১০ পৃ.; ইবনে হিশামঃ ২/৬০১-৬০৫ পৃ.; যাদুল মাআদঃ ১/১৯৬ এবং ২১৮-২৪০ পৃ.

সাহাবাগণ উসামা রাযি. এর নেতৃত্বে রওয়ানা করে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে জুরফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ এর অসুস্থতার খবর শুনে তাঁরা দুশ্চিন্তার কারণে সামনে অগ্রসর হলেন না। তারপর এ বাহিনী আবু বকর রাযি. এর খিলাফতের সময় সামনে অগ্রসর হোন।[৩৫৪]

শিক্ষাঃ

০১. জিহাদ কোনো নেতার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই নেতা যদি মৃত্যুবরণও করেন; তবুও জিহাদ অব্যাহত থাকে।

০২. পৃথিবীর কোনো প্রান্তে একজন মুসলিমও যদি নির্যাতনের শিকার হয়, তখন তাঁকে উদ্ধার করা মুসলিমদের উপর ফরয হয়ে যায়।

----

৩৫৪. সহীহ বুখারীঃ ২/৬১২; ইবনে হিশামঃ ২/৬০৬

বিদায়ের লক্ষণসমূহঃ

রাসূল ﷺ এর অতিবাহিত শেষ রমজান

সাধারণভাবে রমজান মাসের শেষ দশ দিন রাসূল ﷺ ইতেকাফ করতেন। কিন্তু দশম হিজরীতে তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেন। তাছাড়া জিবরাঈল আ. এর সাথে তিনি এ বছর দু'বার কুরআন পুনঃপাঠ করেন।

বিদায় হাজ্বের সময় ইঙ্গিত প্রদান

রাসূল ﷺ বিদায় হাজ্বের সময় সামনের বছর তাঁর না থাকার ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন–

إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً

"নিশ্চয়ই জানি না- সামনের বছর কি তোমাদের সাথে এ স্থানে মিলিত হতে পারবো কিনা?"

জামরায়ে আকাবার নিকট বলেছিলেন–

خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد عامي هذا

"আমার নিকট থেকে হাজ্বের নিয়ম কানুন শিখে নাও; কারণ হতে পারে এ বছরের পর আমার পক্ষে আর হাজ্ব করা সম্ভব হবে না।"

উহুদ প্রান্তে ও জান্নাতুল বাকীতে দুআ

একাদশ হিজরীর সফর মাসের প্রথমদিকে তিনি উহুদ প্রান্তে গিয়ে আল্লাহ তাআলা'র নিকট শহীদদের জন্য দুআ করেন। তখন তিনি এমনভাবে দুআ করেন; যেন তিনি জীবিত ও মৃত সকলের নিকট থেকেই বিদায় গ্রহণ

করছেন।[৩৫৫] আরেকবার তিনি জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কবরবাসীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। দুআ করার শেষে তিনি বলেন– إنا بكم للاحقون "তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমরাও আসছি।"

ওফাতের পূর্বে অসুস্থতার সূচনা

একাদশ হিজরীর ২৯ শে সফর সোমবার রাসূল ﷺ একটি জানাযার উদ্দেশ্যে জান্নাতুল বাকীতে গমন করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয় এবং এরপর তার উত্তাপ এতই বেড়ে যায় যে, মাথার উপর বাঁধা পট্টিও গরম হতে থাকে এবং এর উপরিভাগ থেকেও তাপ অনুভূত হয়। এ অসুস্থতাই তাঁর মৃত্যুকালীন রোগের সূচনা। এ অবস্থায় তিনি এগারো দিন পর্যন্ত নামাজে ইমামতি করেন।

শেষ সপ্তাহ

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামীকাল আমি কার কাছে থাকবো? আগামীকাল আমি কার কাছে থাকবো? এ জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝতে পেরে স্ত্রীগণ বললেন, আপনি যেখানেই চান। রাসূল ﷺ তখন আয়েশা রাযি. এর ঘরে গমন করেন। জীবনের শেষ সপ্তাহটি তিনি সেখানে কাটান। আয়েশা রাযি. সূরা নাস, ফালাক ও রাসূল ﷺ এর শেখানো দুআ পড়ে তাঁর গায়ে ফুঁক দিতে থাকলেন। বরকতের আশায় তাঁর হাতকে নিজ পবিত্র শরীরে বুলিয়ে দিতেন।

ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে

ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিন দেহের উত্তাপ আরও বেশি বেড়ে যায়। তিনি বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, আমাকে একাধিক কূপের সাত মশক পানি দিয়ে গোসল করাও। যেন আমি লোকজনকে উপদেশ দিতে পারি। তারপর তাঁর উপর এত বেশি পরিমাণে পানি ঢালা হলো যে, তিনি নিজেই বললেন– ক্ষান্ত হও। ক্ষান্ত হও।

---

৩৫৫. সহীহ বুখারী: ২/৫৮৫

উপদেশ প্রদান

তারপর রাসূল ﷺ মাসজিদে আসেন। অতঃপর মিম্বারে বসে সাহাবাগণকে উপদেশ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি বলেন–

কবর পূজা থেকে সাবধান

মিম্বারে উঠে তিনি বলেন–

لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا

"ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।"

তারপর বললেন– لا تتخذوا قبري وثناً يعبد "তোমরা আমার কবরকে পূজা করার উদ্দেশ্যে মূর্তি বানিও না।"

শিক্ষাঃ

কবর পূজা করা শিরক; যার গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না।

পাওনা পরিশোধের আহ্বান

রাসূল ﷺ বলেন, আমি যদি কারো পিঠে অন্যায়ভাবে কোড়া মেরে থাকি; তাহলে সে যেন আমার এ পিঠে কোড়া মেরে নেয়। যদি আমি অন্যায়ভাবে কারো ইজ্জতের উপর কটাক্ষ করে থাকি; তবে আমি এখানে আছি, সে যেন তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তারপর তিনি যোহরের নামাজ আদায় করে আবার মিম্বারের উপর বসে আগের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। সে সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তিন দিরহাম পাওনার কথা বললে রাসূল ﷺ ফযল ইবনে আব্বাস রাযি. কে তা পরিশোধ করতে বলেন।

আনসারদের সম্পর্কে নসীহত

রাসূল ﷺ বলেন, আমি তোমাদের কে আনসারদের সম্পর্কে নসীহত প্রদান করছি। কারণ তাঁরা আমার হৃদয় ও কলিজা। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব আদায়

করেছে; কিন্তু তাঁদের প্রাপ্য বাকি আছে। তাই তাঁদের ভালো লোকদের থেকে গ্রহণ করো আর তাঁদের দোষগুলো ক্ষমা করে দাও।

রাসূল ﷺ আরও বলেন, মানুষ বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু আনসার কমে যাবে। এমনকি তারা এমন হবে যে খাবারের মধ্যে লবন যেমন। তাই তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ ক্ষতি বা লাভ পৌঁছানোর দায়িত্বে থাকে; তবে সে যেন ভালো ব্যক্তিদের থেকে গ্রহণ করে আর খারাপ ব্যক্তিদের মাফ করে দেয়।[৩৫৬]

শিক্ষা:

> সর্বযুগে আনসারদের ফযীলত অনেক বেশি। তাই যাদের পক্ষে আনসার হওয়া সম্ভব, তাদের এ সুযোগ হাত ছাড়া করা উচিত নয়।

শেষ সফরের প্রতি ইঙ্গিত

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ এরপর বলেন, এক ব্যক্তিকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও আল্লাহর কাছে যা আছে তা বেছে নিতে বললে সে বান্দা তখন আল্লাহর কাছে যা আছে তাই পছন্দ করলেন। এ কথা শুনে আবু বকর রাযি. কাঁদতে থাকেন। তিনি বললেন, আমরা ও আমাদের মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ। আবু সাঈদ রাযি. বলেন, আমরা তাঁর এ আচরণে আশ্চর্য হলাম। লোকেরা বললো, এ বুড়োকে দেখো! রাসূল ﷺ তো একজন বান্দা সম্পর্কে বলছেন মাত্র। কিন্তু কয়েকদিনের ব্যবধানে বুঝলাম, যে বান্দাকে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে, তিনি স্বয়ং রাসূল ﷺ। আবু বকর রাযি. ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ।[৩৫৭]

এরপর রাসূল ﷺ বলেন, সাহচর্য ও দানের দিক হতে আমার নিকট সর্বোচ্চে আবু বকর। আল্লাহ ছাড়া কাউকে যদি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম; তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে তাঁর সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা আছে। মাসজিদের কোনো দরজাই অবশিষ্ট রাখা হবে না, বরং তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। শুধু সেই দরজাই অবশিষ্ট থাকবে যা একমাত্র আবু বকরের দরজা।[৩৫৮]

---

৩৫৬. সহীহ বুখারী: ১/৫৩৬

৩৫৭. সহীহ বুখারী: ১/৫১৬; মিশকাত: ২/৫৪৯ ও ৫৫৪ পৃ.

শিক্ষা:

কঠিন সময়ে যে যত বেশি দান করবে, সে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে।

ওফাতের চার দিন পূর্বে

সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। রাসূল ﷺ কাগজ-কলম আনতে বললেন, যেন লিখে দেওয়া যায় মানুষ পথভ্রষ্ট না হয়। কিন্তু উপস্থিতদের মধ্য থেকে উমর রাযি. বললেন, আপনার রোগের কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্য তো কুরআনই যথেষ্ট। কেউ কেউ বললেন, কাগজ-কলম আনা হোক। এরপর কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। রাসূল ﷺ আদেশ দিলেন সবাই যেন সেখান থেকে বের হয়ে যায়।[৩৫৯] তারপর সেদিন রাসূল ﷺ উপদেশ দিলেন–

০১.ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের আরব থেকে বের করে দেবে।

০২. প্রতিনিধি দলকে সেভাবেই আপ্যায়ন করবে, যেভাবে পূর্বে করা হতো।

০৩. এ উপদেশ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কুরআন-সুন্নাহ কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার কথা অথবা উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. এর বাহিনীর কার্যক্রম বাস্তবায়ন। কিংবা সালাত ও দাস-দাসীর প্রতি সদয় থাকার উপদেশ। ঐদিন মাগরিবের নামাজেও তিনি ইমামতি করেন।[৩৬০]

ইশার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ কি নামাজ পড়েছে? বলা হলো, না। তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর তিনি বড় পাত্রে পানি আনতে বললেন। সে পানি দিয়ে তিনি গোসল করলেন। তারপর দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি পুনরায় আগের প্রশ্নটি করলেন। এভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয়বারও তিনি একই রূপ

৩৫৮. সহীহ বুখারী: ১/৫১৬; মিশকাত: ২/৫৪৬, ৫৫৪, ৬৫৫ পৃ.
৩৫৯. সহীহ বুখারী: ১/২২, ৪২৯, ৪৪৯ পৃ.; ২/৬৩৮
৩৬০. সহীহ বুখারী: ২/৬৩৭

গোসল করলেন। কিন্তু দাঁড়াতে চাইলে তা পারলেন না। এরপর আবু বকর রাযি. কে নামাজ পড়াতে বললেন।[৩৬১] রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় আবু বকর রাযি. মোট সতেরো রাকাত নামাজ পড়িয়েছেন।

আয়েশা রাযি. তাঁর পিতার পরিবর্তে অপর কেউ নামাজ পড়াক তা চাইছিলেন। এজন্য তিনি তিন থেকে চারবার পর্যন্ত অনুরোধ করেন। হাফসা রাযি. কে দিয়েও একবার বলালেন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা সকলে ইউসুফ আ. এর সাথীদের মতো। আবু বকরকে নামাজে ইমামতি করতে বলো।[৩৬২]

শিক্ষা:

০১. কাফের-মুশরিকদের সাথে পরিপূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

০২. আমীরের আদেশ সর্বাবস্থায় মানতে হবে।

ওফাতের তিন দিন পূর্বে

রাসূল ﷺ এদিন উপদেশ দিলেন, তোমরা কেউ আল্লাহর প্রতি সুধারণা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না।

ওফাতের একদিন বা দু'দিন পূর্বে

রাসূল ﷺ শনিবার কিংবা রবিবার দিন কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেন। তাই দু'জন সাহাবীর সাহায্যে যোহরের নামাজের সময় মাসজিদে আসেন। আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলে রাসূল ﷺ ইশারায় নিষেধ করলেন ও সাহায্যকারী সাহাবী দু'জনকে তাঁর ডান পাশে বসিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় আবু বকর রাযি. রাসূল ﷺ এর নামাজের অনুকরণ করছিলেন ও সাহাবাদের তাকবীর শুনাচ্ছিলেন।[৩৬৩]

ওফাতের একদিন পূর্বে

শেষ সফরের আগের দিন রবিবার রাসূল ﷺ তাঁর দাসগুলোকে মুক্ত করে

---

৩৬১. সহীহ বুখারী-মুসলিমের বর্ণনা। মিশকাত: ১/১০২

৩৬২. সহীহ বুখারী: ১/৯৯

৩৬৩. সহীহ বুখারী: ১/৯৮-৯৯ পৃ.

দেন। যে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিলো তা দান করে দেন। অস্ত্রগুলো হেবা করে দেন। রাসূল ﷺ এর একটি বর্ম ত্রিশ সা' যবের পরিবর্তে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক ছিলো। রাতের বেলা বাতি জ্বালানোর জন্য ঘরে তেল ছিলো না। আয়েশা রাযি. প্রতিবেশীর ঘর থেকে তেল ধার করে আনেন।

শিক্ষাঃ

দ্বীনের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করাই রাসূল ﷺ এর আদর্শ।

পবিত্র জীবনের শেষ দিন

আশার শেষ ফোয়ারা

সোমবার দিন ফজরের সময় আবু বকর রাযি. ইমামতি করছিলেন। এমন সময় রাসূল ﷺ আয়েশা রাযি. এর ঘরের পর্দা সরিয়ে সাহাবাগণের দিকে তাকালেন। তারপর মৃদু হাসলেন। আবু বকর রাযি. আশা করছিলেন, রাসূল ﷺ নামাজে আসার ইচ্ছা করেছেন। তাই তিনি পেছন দিকে সরে এসে কাতারে শামিল হলেন। রাসূল ﷺ হঠাৎ সামনে আসায় সাহাবাগণ এতই আনন্দিত হয়েছেন যে, সালাতের মধ্যেই তাঁরা তাঁর কুশলাদি করার মনস্থ করেন। কিন্তু রাসূল ﷺ হাতের ইশারায় নামাজ সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিলেন ও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে দিলেন।[৩৬৪]

ফাতেমা রাযি. এর আনন্দ উজ্জ্বল চেহারা

এরপর রাসূল ﷺ আর কোনো ওয়াক্ত নামাজে আসতে পারেননি। চাশতের সময় তিনি ফাতেমা রাযি. কে ডেকে এনে তাঁর কানে কানে কথা বললেন। ফলে তিনি কেঁদে উঠলেন। এরপর আবার তিনি তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। এবার তিনি হাসতে লাগলেন। আয়েশা রাযি. বলেন, পরে আমাদের অনুরোধে ফাতেমা রাযি. এর কারণ বললেন, প্রথমবার রাসূল ﷺ বলেছিলেন, এ অসুখেই তাঁর মৃত্যু হবে, তাই আমি কেঁদে উঠি। এরপর তিনি বললেন, পরিবারের মধ্যে আমি সবার আগে তাঁর অনুসরণ করবো। এ কারণে আমি হাসলাম।[৩৬৫] রাসূল ﷺ এ সুসংবাদ দেন যে, তিনিই হবেন মহিলা জাতির নেত্রী।[৩৬৬] সে সময় রাসূল ﷺ এর কষ্ট দেখে ফাতেমা রাযি. কেঁদে উঠে বললেন, হায় আমার আব্বার কষ্ট! রাসূল ﷺ বললেন, আজকের পরে তোমার আব্বার কষ্ট নেই।[৩৬৭] এরপর তিনি হাসান ও হুসাইন রাযি. কে ডেকে নিয়ে চুমু খেলেন। তাঁদের সম্পর্কে উপদেশ দিলেন।

---

৩৬৪. সহীহ বুখারী: ২/২৪০
৩৬৫. সহীহ বুখারী: ২/৬৩৮
৩৬৬. রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/২৮২
৩৬৭. সহীহ বুখারী: ২/৬৪১

এদিকে প্রতি মুহূর্তে রাসূল ﷺ এর যন্ত্রণা বাড়ছিলো। রাসূল ﷺ বললেন, আয়েশা! খায়বারে আমাকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছিলো, তার যন্ত্রণা আমি এখন উপলব্ধি করছি। যেন আমার সকল শিরা-উপশিরার জীবন কর্তিত হচ্ছে।[৩৬৮] তারপর তাঁর চেহারার উপর চাদর দিয়ে দেওয়া হলো। যখন তাঁর পেরেশানী দূর হলো, তখন চেহারা থেকে তা সরিয়ে নেওয়া হলো। তারপর তিনি বললেন, এরূপই হয়। সর্বশেষ তিনি মানুষের জন্য উপদেশ দিলেন, আল্লাহর অভিশাপ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে। তারা যা তৈরি করেছে লোকেরা যেন তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে। আরবভূমিতে আর দু'টি ধর্ম স্থান পাবে না। তারপর তিনি বললেন– নামাজ, নামাজ। আর তোমাদের অধীনস্থগণ। এ শব্দগুলো তিনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন।[৩৬৯]

---

৩৬৮. সহীহ বুখারী: ২/৬৩৭
৩৬৯. প্রাগুক্ত

মৃত্যুযন্ত্রণা

তারপর শুরু হলো মৃত্যুযন্ত্রণা। আয়েশা রাযি. বলেন, তখন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. সেখানে আসলেন। তার হাতে ছিলো একটি মিসওয়াক। রাসূল ﷺ তখন আমার শরীরে হেলান দেওয়া অবস্থায় ভর করে আছেন। তিনি মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য কি মিসওয়াক নেবো? তিনি মাথা নেড়ে নেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর আমি মিসওয়াক নিয়ে তাঁর জন্য নরম করে দিলাম। তিনি খুব সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন। সামনে রাখা পানির পাত্রে তিনি হাত ডুবিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নিশ্চয় মৃত্যু যন্ত্রণা একটি কঠিন ব্যাপার।[৩৭০]

মিসওয়াক করা শেষ করে রাসূল ﷺ হাত উঠিয়ে ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর দুই ঠোঁট নড়ে উঠলো। তিনি বলছিলেন– لا إله إلا الله، إن للموت سكرات... "আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা কঠিন ব্যাপার।" মিসওয়াক করার তিনি দুআ করছিলেন– "হে আল্লাহ! নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিগণ; যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছো। আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করো। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ'লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! তুমি রফীকে আ'লা।[৩৭১]

একাদশ হিজরী ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সূর্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। সে সময় রাসূল ﷺ এর বয়স ছিলো তেষট্টি বছর চার দিন। তিনি পরম সত্য মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেন।

দুঃখ বেদনার অতল সাগরে ডুবে পড়লেন সাহাবায়ে কেরাম রাযি.

হৃদয়কে বিদীর্ণকারী এ খবর সাথে সাথে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মদীনাবাসীগণ দুঃখের অতল সাগরে তলিয়ে যান। আনাস রাযি. বলেন, যেদিন রাসূল ﷺ আমাদের নিকট আগমন করেন, সেদিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো

---

৩৭০. সহীহ বুখারী: ২/৬৪০

৩৭১. সহীহ বুখারী: ২/৬৩৮-৬৪১ পৃ.

দেখিনি এবং যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সেদিনের মতো শোক ও অন্ধকার দিন আর দেখিনি। ফাতেমা রাযি. দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, "হায় আব্বাজান! আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! যার ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস। হায় আব্বাজান! জিবরাঈল আ. কে আপনার মৃত্যু সংবাদ জানাই।"

উমর রাযি. এর অবস্থান

উমর রাযি. যখন শুনলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন তাঁর হুশ লোপ পায়। তিনি বলতে থাকেন, কিছু মুনাফিক বলে রাসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। আসলে তারা মুনাফিক। মূলত রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুর নিকট গিয়েছেন, যেমনি মূসা আ. গিয়েছিলেন। তার সম্প্রদায় তখন বলেছিলো তিনি মারা গেছেন। অথচ তিনি ৪০ রাত্রি পূরণ করে ঠিকই এসেছিলেন। আল্লাহর কসম! রাসূল ﷺও ফিরে আসবেন। তারপরও যারা মনে করে রাসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের হাত-পা কেটে ফেলবো।[৩৭২]

আবু বকর রাযি. এর অবস্থান

আবু বকর রাযি. সানাহতে অবস্থিত নিজ বাড়ি হতে ফিরে মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করেন। তারপর সরাসরি আয়েশা রাযি. এর ঘরে চলে গেলেন। রাসূল ﷺ এর দেহ মোবারক তখন জরীদার ইয়ামানী চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিলো। আবু বকর রাযি. রাসূল ﷺ এর মোবারক চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে তাতে চুমু খেলেন এবং তারপর কাঁদতে থাকলেন। তারপর বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক! আল্লাহ আপনাকে দু'বার মৃত্যু দেবেন না। এরপর তিনি সেখান থেকে বাহিরে এলেন। সে সময় উমর রাযি. লোকজনদের সাথে কথা বলছিলেন। আবু বকর রাযি. তাঁকে বসাবার চেষ্টা করলে তিনি বসতে অস্বীকার করলেন। লোকেরা এবার আবু বকর রাযি. এর দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসার পর বললেন, যারা মুহাম্মাদ ﷺ এর পূজা করতো, তারা জেনে রাখুক যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সর্বদা জীবিত, কখনো তাঁর মৃত্যু হবে না। আল্লাহ বলেছেন–

---

৩৭২. ইবনে হিশাম: ২/৬৫৫

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾

"আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ অন্য কিছু নন! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হোন; তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যাঁরা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাঁদের সাওয়াব দান করবেন।"[৩৭৩]

সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর রাযি. এর কথা শুনে নিশ্চিত হলেন, সত্যিই রাসূল ﷺ এর ওফাত ঘটেছে। ব্যাপারটি এমন হলো যে, লোকজন যেন সে আয়াত সম্পর্কে জানতোই না। যখন আবু বকর রাযি. তাঁদেরকে তা শুনালেন, যেন এ প্রথমবার শুনছিলেন। তারপর সকলকেই এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে দেখা গেলো।

শিক্ষাঃ

নেতা সরে গেলে অনুসারীও সরে পড়বে, এমন আনুগত্য ইসলাম বহির্ভূত; বরং আল্লাহর জন্যই আনুগত্য করতে হবে।

---

৩৭৩. সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৪

কাফন-দাফন

রাসূল ﷺ এর দাফনের আগে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, তা নিয়ে সাকীফা বনু সায়িদার মধ্যে মুহাজির ও আনসারগণের আলোচনা চলতে থাকে। দলীল প্রমাণ পেশ ও প্রশ্নোত্তর চলছিলো। অবশেষে সকলে আবু বকর রাযি. এর নেতৃত্বের ব্যাপারে একমত হলেন। এ সকল আনুষঙ্গিক কাজের ফলে সোমবার দিবাগত রাত অতিবাহিত হয়ে মঙ্গলবার সকাল হয়ে যায়। এ সময় পর্যন্ত রাসূল ﷺ এর দেহ মোবারক একটি জরীদার ইয়ামানী চাদর দিয়ে আবৃত করে রাখা হয়।

রাসূল ﷺ কে গোসল দেওয়া হয় মঙ্গলবার দিন। এ কাজে অংশগ্রহণ করলেন আব্বাস, আলী, ফযল ইবনে আব্বাস, কুসাম ইবনে আব্বাস, রাসূল ﷺ এর আযাদকৃত দাস শুকরান, উসামা ইবনে যায়েদ, আওস ইবনে খাওলী রাযি.। আব্বাস, ফযল ও কুসাম রাযি. রাসূল ﷺ এর পাশ পরিবর্তন করছিলেন। উসামা ও শুকরান রাযি. পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আলী রাযি. ধৌত করছিলেন আর আওস রাযি. রাসূল ﷺ এর দেহ মোবারককে আপন বক্ষের উপর ভর করে রাখছিলেন। রাসূল ﷺ কে তিনবার কুল পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দেওয়া হয়। কুবায় অবস্থিত সা'দ ইবনে খায়সামাহ গারস নামক কূপের পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ এ কূপের পানি পান করতেন। গোসলের পর কুরসুফ থেকে তৈরি তিনটি সাদা ইয়ামানী সাহুলিয়্যাহ চাদর দিয়ে রাসূল ﷺ এর কাফনের ব্যবস্থা করা হয়।[৩৭৪]

আবু বকর রাযি. বলেন, নবীগণ যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন তাঁদেরকে সেখানেই দাফন করতে হয়। তাই আয়েশা রাযি. এর ঘরেই যে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন তা উঠিয়ে তার নিচে বগলী কবর করা হয়। এরপর সাহাবাগণ পালাক্রমে দশ দশজন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযা আদায় করেন। নির্ধারিত কোনো ইমামের ব্যবস্থা ছিলো না। সবার আগে রাসূল ﷺ এর পরিবার বনু হাশিমের লোকজন সালাত আদায় করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে মুহাজির, আনসার, অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ। জানাযার নামাজের মাধ্যমেই পুরো মঙ্গলবার দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। বুধবার রাতে রাসূল ﷺ এর দেহ মোবারক সমাহিত করা হয়।[৩৭৫]

---

৩৭৪. সহীহ বুখারী: ১/১৬৯; সহীহ মুসলিম: ১/৩০৬

৩৭৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য সহীহ বুখারী: নবী ﷺ এর অসুস্থতা অধ্যায় ও এর পরের কয়েকটি

সাল অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে রাসূল ﷺ এর জীবনীর উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনাবলী

৫৭০ খ্রিস্টাব্দ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্ম। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবার।

৫৭২ খ্রিস্টাব্দ: দু'বছর পর তিনি দুগ্ধ পান বন্ধ করেন। দুধমা হালিমার ঘরে অবস্থান।

৫৭৪-৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ: ৪/৫ বছর বয়সে তাঁর বক্ষ বিদারণ হয়।

৫৭৫-৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ: ৫/৬ বছর বয়সকালে মা আমিনার কোলে প্রত্যাবর্তন।

৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ: ৬ বছর বয়সে মায়ের সাথে মদীনায় গমন এবং ফেরার পথে বাবার কবর যিয়ারত করার পর আবওয়া নামক স্থানে মা আমিনার মৃত্যুবরণ।

৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ: ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল। মৃত্যুর পূর্বে দাদা আব্দুল মুত্তালিব আবু তালিবের উপর তাঁর প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত করেন।

৫৮০ খ্রিস্টাব্দ: ১০ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার তাঁর বক্ষ বিদারণ হয়।

৫৮২ খ্রিস্টাব্দ: ১২ বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া গমন এবং খ্রিস্টান পাদ্রি বাহীরা কর্তৃক প্রতিশ্রুত শেষ নবী হিসেবে চিহ্নিত।

৫৯০ খ্রিস্টাব্দ: ২০ বছর বয়সে ওকাযে ভয়াবহ ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের চার মাস পর ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি আরবের সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে হিলফুল ফুযূল-এ অংশগ্রহণ করেন।

৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ: খাদিজা রাযি. এর বাণিজ্য প্রতিনিধিরূপে সিরিয়া গমন। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা রাযি. এর সাথে বিবাহ।

৬০৫ খ্রিস্টাব্দ: ৩৫ বছর বয়সে হাজারে আসওয়াদ সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা।

অধ্যায়। মুসলিম: নবী ﷺ এর মৃত্যু অধ্যায়। ইবনে হিশাম: ২/৬৪৯-৬৬৫ পৃ.; তালকীহুল ফুহুম আলা আহলিল আসার: ৩৮-৩৯ পৃ.; রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/২৭৭-২৮৬ পৃ.

৬১০ খ্রিস্টাব্দ: হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা। ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ; রমজান মাসের ২১ তারিখ সোমবার দিবাগত রাত, খ্রিস্টীয় হিসাব অনুযায়ী ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগস্ট। জিবরাঈল আ. কর্তৃক তাঁকে ওযু শিক্ষা দান।

৬১০-৬১৩ খ্রিস্টাব্দ: নবুওয়াতের প্রথম ৩ বছর গোপনে ইসলাম প্রচার। সর্বপ্রথম খাদীজা, যায়েদ, আলী ও আবু বকর রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ। এর পর উসমান, যুবায়ের রাযি.সহ ৪০ জনের ইসলাম গ্রহণ।

৬১৪ খ্রিস্টাব্দ: আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ প্রদান। মহানবী ﷺ এর প্রতি আবু লাহাবের বিরূপ আচরণের কারণে সূরা লাহাব অবতীর্ণ।

৬১৫ খ্রিস্টাব্দ: নবুওয়াতের ৫ম বর্ষের রজব মাসে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা সাহাবীর আবিসিনিয়া (হাবশা) হিজরত। উমর ও হামযা রাযি. এর ইসলাম গ্রহণ। কতক সাহাবী মক্কায় ফিরে এলেন। এরপর মুসলমানগণ আবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এবার ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮জন মহিলা হিজরত করেন। এ সময় কুরাইশগণ তাদের দু'জনকে মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য আবিসিনিয়াতে প্রেরণ করে। আবু জাহেল রাসূল ﷺ কে সিজদারত অবস্থায় হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

৬১৬-৬১৯ খ্রিস্টাব্দ: ৩ বছর শিআবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ জীবনযাপন।

৬২০ খ্রিস্টাব্দ: রজব মাসে চাচা আবু তালিব ও রমজান মাসে বিবি খাদিজা রাযি. এর ইন্তেকাল। এরপর স্বশরীরে রাসূল ﷺ এর মেরাজে গমন। শাওয়াল মাসে তিনি তায়েফ গমন করেন। সাওদাহ রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ। বিভিন্ন গোত্রকে দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে সহযোগিতা কামনা। ইয়াসরিবের ছয় জন লোকের ইসলাম গ্রহণ।

৬২১ খ্রিস্টাব্দ: আকাবার প্রথম শপথ। মদীনায় ইসলাম প্রচারক ও প্রশিক্ষক প্রেরণ।

৬২২ খ্রিস্টাব্দ: আকাবার দ্বিতীয় শপথে মদীনার আনসারগণ কর্তৃক রাসূল ﷺ কে সহায়তার প্রতিশ্রুতি। মদীনায় হিজরতের জন্য সাহাবীগণের প্রতি নির্দেশ প্রদান ও ৮ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রাসূল ﷺ এর হিজরত।

১ম হিজরী: মাসজিদে নাববী নির্মাণ, আযান, ওযু-নামাজের নিয়ম ও জুমুআর নামাজ চালুকরণ। ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তি। সারিয়্যার মধ্যে সারিয়ায়ে সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী, সারিয়ায়ে রাবিগ বা রাবিগ অভিযান, সারিয়ায়ে খার্‌রার।

২য় হিজরী : বদরের যুদ্ধ, যাকাত, রোজা, ঈদুল ফিতর। এছাড়াও বদর যুদ্ধের আগে গযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদ্দান, গাযওয়ায়ে বুওয়াত্ব, গাযওয়ায়ে সাফওয়ান, গাযওয়ায়ে যুল উশাইরাহ, নাখলার অভিযান সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধের পর গাযওয়ায়ে বনু সুলাইম, সফওয়ানের প্ররোচনায় রাসূল ﷺ কে হত্যার ষড়যন্ত্র, গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা' ও গাযওয়ায়ে সাভীক সংঘটিত হয়।

৩য় হিজরী : উহুদ যুদ্ধের আগে সংঘটিত অভিযানসমূহ: গাযওয়ায়ে যু-আমর, কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা অভিযান, গাযওয়ায়ে বুহরান, সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসাহ। উহুদ যুদ্ধের পর হামরাউল আসাদ অভিযান সংঘটিত হয়।

৪র্থ হিজরী: আবু সালামাহ'র অভিযান, আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি. অভিযান, রাযী'র ঘটনা, বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা, বনু নাযীর যুদ্ধ, নাজদ যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৫ম হিজরী : গযওয়ায়ে দুমাতুল জান্দাল, গাযওয়ায়ে আহযাব (খন্দক যুদ্ধ), বনু কুরাইযার যুদ্ধ, আবু রাফে' সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইকের হত্যা, পর্দার বিধান প্রবর্তিত হয়।

৬ষ্ঠ হিজরী: মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ'র অভিযান, গাযওয়ায়ে বনু লাহ্ইয়ান, গাম্‌রের অভিযান, যুল-কাস্‌সাহতে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ'র প্রথম অভিযান, যুল-কাস্‌সাহতে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি. এর দ্বিতীয় অভিযান, জামূম অভিযান, ঈস অভিযান, তারিফ বা তারিক অভিযান, ওয়াদিল কুরা অভিযান, খাবাত অভিযান, গাযওয়ায়ে বনু মুসতালিক, আয়েশা রাযি. এর উপর অপবাদ, দিয়ারে বনু কালব অভিযান, ফাদাক অঞ্চলে অভিযান, ওয়াদিল কুরা অভিযান, উরানিয়্যীন অভিযান, যুলকা'দাহ মাসে হুদায়বিয়াহ'র সন্ধি।

৭ম হিজরী : ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে বা সপ্তম হিজরীর প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের নিকট দূত প্রেরণ করা হয়, খায়বার বিজয়, খায়বার

বিজয়ের পর ফাদাক, ওয়াদিল কুরা, তাইমা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যাতুর রিকা' যুদ্ধ, কুদাইদ অভিযান, হিস্‌মা অভিযান, তুরাবাহ অভিযান, ফাদাক অঞ্চল অভিমুখে অভিযান, মাইফাআহ অভিযান, খায়বার অভিযান, ইয়ামান ও জাবার অভিযান, গাবাহ অভিযান, কাযা উমরাহ, মায়মুনাহ রাযি. কে বিবাহ, মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা।

৮ম হিজরী : সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি., সারিয়ায়ে কা'ব ইবনে উমায়ের রাযি., সারিয়ায়ে আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহ রাযি., মুতার যুদ্ধ, যাতুস সালাসিল অভিযান, খাযিরাহ অভিযান, মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধে ও তায়েফে ইসলামের বিজয়।

৯ম হিজরী : রজব মাসে তাবূক অভিযান সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের পরে উম্মে কুলসুম রাযি. ইন্তেকাল করেন, যুলকা'দাহ মাসে আবু বকর রাযি. এর নেতৃত্বে হাজ্ব কাফেলা প্রেরণ করা হয়। এ সময় রাসূল ﷺ এর নিকট প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে।

১০ম হিজরী : ১ লাখেরও বেশি সাহাবীসহ রাসূল ﷺ এর বিদায় হাজ্বে আরাফাতের ময়দানে মানব জাতির জন্য দিক নির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণ দান।

১১শ হিজরী/৬৩২ খ্রিস্টাব্দ: রাসূল ﷺ এর মাথা ব্যাথা ও জ্বরের সূচনা। ৬৩ বছর ৪ দিন বয়সে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার রাসূল ﷺ এর ওফাত হয়। বুধবার ১৪ই রবিউল আউয়াল ভোর রাতে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

শারীরিক গঠন ও অনুপম আখলাক

আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শারীরিক গঠন ও অনুপম গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বেমানান দীর্ঘ বা খাটো আকৃতির কোনোটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ দু'য়ের মাঝামাঝি অত্যন্ত মানানসই মধ্যম দেহবিশিষ্ট পুরুষ। তাঁর চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিলো না, আবার একেবারে সোজা খাড়াও ছিলো না; বরং তা ছিলো এ উভয়ের সমন্বয়ে খুবই সুন্দর রূপবিশিষ্ট। তাঁর গণ্ডদেশে অতিরিক্ত মাংস ছিলো না। চিবুক খর্ব ও কপাল নীচু গড়নের ছিলো না। তাঁর মুখমণ্ডল ছিলো গোলাকার এবং দেহের রঙ ছিলো গোলাপি ও বাদামি রঙে সংমিশ্রিত। চোখের পাতা লম্বাটে গড়নের, সন্ধিসমূহ এবং কাঁধের হাড্ডিগুলো ছিলো বড় আকারের। বুকের উপরিভাগ থেকে নাভী পর্যন্ত ছিলো স্বল্প পশমবিশিষ্ট একটি হালকা বক্ষরেখা, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিলো কেশমুক্ত। হস্ত ও পদদ্বয় ছিলো মাংসল। পথ চলার সময় তিনি সম্মুখভাগে একটু ঝুঁকে পা উঠাতেন এবং এমনভাবে চলতেন যে, তাঁকে দেখে মনে হতো– তিনি যেন কোনো ঢালু পথ অতিক্রম করছেন। তিনি যখন কারো প্রতি লক্ষ্য করতেন, তখন তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোযোগী হতেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশে উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে ছিলো মোহরে নবুওয়াত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ নবী। দানশীলতা, সাহসিকতা এবং সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। তিনি ছিলেন সর্বাধিক আমানতের হেফাজতকারী এবং অঙ্গীকার পূর্ণকারী। সাথীদের মাঝে তিনি ছিলেন সবচেয়ে কোমল স্বভাবের এবং সবার চেয়ে বিশ্বস্ত সহচর ও আস্থাভাজন সঙ্গী। সহসা কেউ তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হলে ভয়ে সে ব্যক্তির অন্তর কম্পিত হতো। আর কেউ তাঁর সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারলে খুবই আন্তরিকতার সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতো।"[৩৭৬]

জাবির ইবনে সামুরাহ রাযি. বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখমণ্ডল ছিলো প্রশস্ত, চক্ষুদ্বয় ছিলো হালকা লাল বর্ণের এবং পায়ের গোড়ালি ছিলো পাতলা।"[৩৭৭]

---

৩৭৬. ইবনে হিশাম: ১/৪০১-৪০২ পৃ.; সুনানে তিরমিযী (তুহফাতুল আহওয়ায়ীসহ): ৪/৩০৩
৩৭৭. সহীহ মুসলিম: ২/২৫৮

বারা রাযি. বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দৈহিক গঠন ছিলো মধ্যম ধরনের। উভয় কাঁধের মাঝে দূরত্ব ছিলো এবং কেশরাশি ছিলো দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সৌন্দর্যমণ্ডিত পোশাকাদি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দর কোনো কিছু আমি দেখিনি।"[৩৭৮]

রাসূল ﷺ অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় কথা বলতেন। কথা বলার সময় পরিচ্ছন্ন বাক্য বিন্যাসের ব্যবহার ছিলো তাঁর এক অসাধারণ গুণ। তিনি উঠাবসায় সর্বদা আল্লাহর জিকির করতেন। তিনি ছিলেন কুমারী নারীর চেয়েও অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল। তিনি যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তা তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেতো। তিনি দৃষ্টি অবনত করে রাখতেন। তাঁর আচার-আচরণে অহংকারের লেশমাত্রও ছিলো না। তিনি খুব সাদাসিধে এবং সাধারণভাবেই জীবনযাপন করতেন। নিজেই নিজের জুতো সেলাই করতেন। সংসারের কাজকর্ম নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। নিজেই কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতেন। নিজের সেবকদের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে "উহ" শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন না; বরং তাদের কাজে সাহায্য করতেন। যখন দু'টি বিষয়ে তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হতো বা দু'টি কাজের সুযোগ তাঁর সামনে আসতো; তিনি সহজতর কাজটি গ্রহণ করতেন। অন্যায় কাজ হলে সবার আগে তিনিই তা থেকে বিরত থাকতেন।

এককথায় মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্রের যত গুণাবলী থাকতে পারে, সকল গুণই তাঁর মাঝে ছিলো; যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আয়েশা রাযি. কে রাসূল ﷺ এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন–

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

"পবিত্র কুরআনই হচ্ছে তাঁর আখলাক।"

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ যা কিছুই আদেশ করেছেন, রাসূল ﷺ'ই ছিলেন এর উপর সর্বোত্তম আমালকারী। আর মহান আল্লাহ যা কিছু নিষেধ করেছেন, একমাত্র রাসূল ﷺ'ই পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সেসব কাজ থেকে বিরত

৩৭৮. সহীহ বুখারী: ১/৫০২

রেখেছিলেন। তাঁর সর্বোত্তম আদর্শের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।"[৩৭৯]

বাস্তবিকই আমাদের জন্য রাসূল ﷺ এর জীবনচরিতের মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾

"বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ– এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।"[৩৮০]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল ﷺ এর উত্তম আদর্শের অনুসরণ করে জীবন চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষাঃ

রাসূল ﷺ এর পুরো জীবনীর মাঝে রয়েছে আমাদের জন্য অসংখ্য-অগণিত শিক্ষা। সুতরাং আমরা যদি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে যথাযথ ভাবে আঁকড়ে ধরি; তবেই তাঁর যথার্থ অনুসরণ সম্ভব হবে।

সমাপ্ত

---

৩৭৯. সূরা কলামঃ ৪

৩৮০. সূরা আহযাবঃ ২১

তথ্যপঞ্জি

ক্রমিক নং	গ্রন্থের নাম	লেখক
০১	আল-কুরআনুল কারীম	
০২	তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন	সাইয়েদ কুতুব রহ.
০৩	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল--বুখারী রহ.
০৪	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ রহ.
০৫	সুনানে তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তির-মিযী রহ
০৬	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী রহ..
০৭	সহীহ ইবনে হিব্বান	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান রহ.
০৮	মুসতাদরাকে হাকিম	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকিম রহ.
০৯	মুসনাদে আহমাদ	ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.
১০	তাবারানী কাবীর ও সগীর	ইমাম সুলাইমান ইবনে আহমাদ রহ.
১১	আস-সুনানুল কুবরা	ইমাম আবু বকর আহমাদ আল-বায়হাকী রহ.
১২	সুনানে দারাকুতনী	ইমাম আলী ইবনে উমর দারাকুতনী রহ.
১৩	কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী রহ.
১৪	মাজমাউয যাওয়ায়েদ	আল্লামা নুরুদ্দীন হাইসামী রহ.
১৫	মিশকাতুল মাসাবীহ	মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত-তিবরিযী রহ.
১৬	ফাতহুল বারী	হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

১৭	শরহে মুসলিম	আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নাববী রহ.
১৮	আওনুল মা'বূদ শরহে আবু দাউদ	আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী রহ.
১৯	আল-কামিল	আল্লামা ইবনুল আসীর রহ.
২০	আল-ইসাবাহ	হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.
২১	আর-রাহীকুল মাখতূম	শাইখ আল্লামা সফিউর রহমান মুবারক-পুরী রহ.
২২	ইসতিয়াব আব্দুল বার	আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ.
২৩	উসুদুল গাবাহ	আল্লামা ইবনুল আসীর রহ.
২৪	তারীখে তাবারী	ইমাম তাবারী রহ.
২৫	তারীখে উমর ইবনে খাত্তাব	ইবনে জাওযী রহ.
২৬	তাদরীবুর রাবী	আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.
২৭	তারীখে খুযরী	মাহমুদ পাশা রহ.
২৮	তালকীহুল ফুহুম	আবুল ফারজ আব্দুর রহমান জাওযী রহ.
২৯	তালকীহুল ফুহুম	হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম রহ.
৩০	তুহফাতুল আহওয়াযী	আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ.
৩১	ফিকহুস সীরাহ	আল্লামা ইবনুল আসীর রহ.
৩২	ফিকহুস সীরাহ	মুহাম্মাদ আল-গাযালী রহ.
৩৩	মুখতাসারুস সীরাহ	শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ.
৩৪	মুখতাসারুস সীরাহ	শাইখ আব্দুল্লাহ রহ.
৩৫	মুহাযারাত	আল্লামা খুযরী রহ.
৩৬	মোঘল তাঈ	হাফেজ মোঘল তাঈ রহ.
৩৭	যাদুল মাআদ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযী রহ.

৩৮	যুরকানী	আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী রহ.
৩৯	রহমাতুল্লিল আলামীন	মুহাম্মাদ সুলাইমান মানসূরপুরী রহ.
৪০	সীরাতুন নবী	আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ.
৪১	সীরাতে ইবনে হিশাম	আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম রহ.
৪২	সীরাতে হালাবিয়্যাহ	ইবনে বুরহানুদ্দীন রহ.
৪৩	সীরাতুন নাববী ফী দওয়িল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ	মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ রহ.

সংকলকের কথা

সুখপাঠ্য বইগুলোর মাঝে সীরাত সংক্রান্ত বই-ই আমাকে সবচে বেশী টানে। কারণ, জীবনীটা যে সর্বশ্রেষ্ঠ এক মহামানবের, যাঁর পরশ ছোয়ায় বদলে গেছে পৃথিবীর গতিপথ, অন্ধকার সভ্যতা পেয়েছে দীপ্তিময় আলো আর দিকহারা পথিক পেয়েছে তার হারানো পথের দিশা। আজ আমরা তাঁর জীবনী ভুলে তাঁর আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বিজাতীয় নেতা ও তারকাদের অনুসরণ করে চলছি। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যাঁরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। (আহযাবঃ ২১) তাই মুসলিম উম্মাহর কাণ্ডারী, পথপ্রদর্শক ও জীবনের সার্বিক অঙ্গনে একমাত্র আইডল হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.। তাঁর আদর্শ থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়ার একমাত্র কারণ হলো সীরাত সম্পর্কে অজ্ঞতা। যারাও বা একটু আধটু পড়েন তারাও গতানুগতিক ধারায় সাধারণ বইয়ের মতো পাঠ শেষ করে আলমারিতে স্বযত্নে তুলে রাখেন। অথচ এটা শুধু পড়ার জিনিস নয়; বরং অনুধাবন, চর্চা ও বারবার অনুশীলনীর মাধ্যমে বাস্তবজীবনে তা প্রতিষ্ঠা করাই এর মূল লক্ষ্য। সীরাতের এ লক্ষ্য অর্জনে, তার মূল বিষয় পাঠকের গভীরে প্রোথিত করার উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম উম্মাহর জীবনধারায় সার্বিক উৎকর্ষ সাধনে "রুহামা পাবলিকেশন" এর এবারের পরিবেশনা ভিন্নধারার এক সীরাতগ্রন্থ "উসওয়াতুন হাসানাহ"। আগ্রহী পাঠকদের জন্য এতে রয়েছে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো হৃদয়গ্রাহী আলোচনা ও তথ্যসমৃদ্ধ ভিন্ন আঙ্গিকের উপাদান। আশা করি বইটি আপনাকে ভিন্ন কিছু উপহার দিবে, নতুন করে ভাবতে শেখাবে এবং বাস্তবজীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে সাহায্য করবে- ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

- মুফতি তারেকুজ্জামান

‘উসওয়াতুন হাসানাহ’

হে পথিক!
এ পথ'ই আলোকিত, সত্য-সঠিক।
এ পথেই রয়েছে অনাবিল সুখ-শান্তি
সফলতা-চিরকল্যাণ, মহাবিজয়।
এ পথ'ই উদ্ভাসিত, সহজ-সরল।
এ পথে নেই মরীচিকা, ভুল-ভ্রান্তি।
নেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, সন্দেহ-সংশয়।
হে পথিক!
এ পথেই লাখো লাখো মহাবীর।
গড়েছেন বন্ধন সীসাঢালা প্রাচীর।
এ পথ'ই দেখিয়েছেন মানবতার দূত
মুক্তির দিশারি মহামানব মহানবী
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]।
এ পথেই শুধু মিলে মহান রবের সন্তুষ্টি।
এসো! মুক্তির তরে এ পথে সম্মুখ চলি।

“বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ...”
-সূরা আহযাব: ২১